বিপিনের সংসার

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২৭ক কর্ণওয়া[illegible] ট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র সোম
কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা

ভাদ্র, ১৩৪৮

প্রিণ্টার—শ্রী[illegible]মানন্দ সিংহ রায়
শ্রী[illegible] প্রেস
[illegible] সীতারাম [illegible]ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চা৲চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে

উৎসর্গীকৃত হইল

৪পুর
াবণ. ১৩৮ } শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ সব কথা বিপিনের তেমন ভাল লাগিতেছিল না। স্পষ্ট কথা কাহারও ভাল লাগে না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে যাক কাকা, আমায় একটা শসার চারা দিতে পারেন? আছে বাড়িতে?

এই সময় বিপিনের বিধবা বোন বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দাদা, মা ডাকছে, একবার রান্নাঘরের দিকে শুনে যাও।

ইহার অর্থ সে বোঝে। সংসারে হেন নাই, তেন নাই— লম্বা ফর্দ্দ শুনিতে হইবে—মা নয়, স্ত্রীর নিকট হইতে। কৃষ্ণলাল বসিয়া থাকার দরুন মায়ের নাম দিয়া ডাক আসিতেছে।

বিপিন বলিল, বসুন কাকা, আসছি।

কৃষ্ণলাল উঠিয়া পড়িলেন, সকালবেলা বসিয়া থাকিলে তাঁর চলিবে না, অনেক কাজ তাঁর।

মনোরমা দালানের দোরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কেষ্টকাকার সঙ্গে বসে গল্প করলে চলবে তোমার?

—ঘুরিয়ে না ব'লে সোজা ভাবেই কথাটা বল না কেন? কি নেই?

—কিচ্ছু নেই। এক দানা চাল নেই, তেল নেই, ডাল নেই, একটি আলু নেই। হাঁড়ি চড়বে না এ বেলা।

বিপিন ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, না চড়ে না চড়ুক, রোজ রোজ পারি নে। এক বেলা উপোস ক'রে সব প'ড়ে থাক।

মনোরমা কড়াস্বুরে জবাব দিল, লজ্জা করে না এ কথা বলতে? আমি আমার নিজের জন্যে বলি নি। মা কাল

একাদশীর উপোস ক'রে রয়েছেন, উনিও কি আজও উপোস ক'রে প'ড়ে থাকবেন ? সব কি আমার জন্যে সংসারে আসে ? ওই বীণারও গিয়েছে কাল একাদশী—ও ছেলেমানুষ, কপালই না হয় পুড়েছে, খিদেতেষ্টা তো পালায় নি তা ব'লে ?

মনোরমার যুক্তি নিষ্ঠুর···অকাট্য।

বিপিন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তেমাথার মোড়ের বড় তেঁতুলতলায় ছায়ায় একখানা যে কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে, তাহারই উপর আসিয়া বসিল।

চাল নাই, ডাল নাই, এ নাই, ও নাই —সে তো চুরি করিতে পারে না ? একটি পয়সা নাই হাতে। বাজারের কোন দোকানে ধার দিবে না। বহু জায়গায় দেনা। উপায় কি এখন ?

না, পলাশপুরেই যাওয়া স্থির। বাড়ির এ নরকযন্ত্রণার চেয়ে সে ভাল, দিন রাত মনোরমার মধুর বাক্য আর কেবল 'নাই নাই' বুলি তো শুনিতে হইবে না ? প্রজা ঠেঙানোর অনিচ্ছা ইত্যাদি বাজে ওজর, ও কিছু না, সে বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে, প্রজা ঠেঙাইতে পিছপাও না ; কিন্তু আর একটা কথাও আছে তাহার সেখানে যাইবার অনিচ্ছার মূলে।

ধোপাখালি কাছারির তহবিল হইতে সে জমিদারদের না জানাইয়া চল্লিশটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহা আর শোধ দেওয়া হয় নাই। বিপিনের ভয় আছে, হয়তো এই ব্যাপারটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সেই জন্যই জমিদারের এত ঘন ঘন তাগাদা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য।

বিপিনের ছোট ভাই বলাই আজ চার পাঁচ মাস অসুস্থ। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যই টাকা কয়টির নিতান্ত দরকার ছিল। বলাইকে রাণাঘাটে লইয়া গিয়া বড় ডাক্তারকে দেখানো হইয়াছে এবং এখন আগের চেয়ে সে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছেন। বলাই বর্ত্তমানে রাণাঘাটেই মিশনারি হাসপাতালে আছে।

২

পরদিন পলাশপুরে যাওয়ার পথে বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে গেল। স্টেশন থেকে হাসপাতাল প্রায় মাইল খানেক দূরে। বেশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বলাই দাদাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—দাদা, আমায় এখানে এরা না খেতে দিয়ে মেরে ফেললে, আমায় বাড়ি নিয়ে যাবে কবে? আমি তো সেরে গেছি, না খেয়ে মলাম; তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বাড়ি কবে নিয়ে যাবে বল।

—খেতে দেয় না তোর অসুখ ব'লেই তো। আচ্ছা, আচ্ছা, পলাশপুর থেকে ফিরবার পথে তোকে নিয়ে যাব ঠিক। কি খেতে ইচ্ছে হয়?

—মাংস খাই নি কতদিন। মাংস খেতে ইচ্ছে হয়—বৌদিদির হাতে রান্না মাংস—

—আচ্ছা হবে হবে। এই মাসেই নিয়ে যাব।

বিপিন আড়ালে নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাই মাংস খেতে চাইছে—একটু আধটু—

নার্স এদেশী খ্রীষ্টান, পূর্বে কৈবর্ত্ত ছিল, গোলগাল, দোহারা, বেশি বয়েস নয়—ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, মাংস খেয়ে মরবে যে! নেফ্রাইটিসের রুগী, অত্যন্ত ধরপাকড়ের মধ্যে না রাখলে যা একটু সেরে আসছে, তাও যাবে। মাংস!

বৈকালের দিকে পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বিপিনের বাবা ৺বিনোদ চাটুজ্জে এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বিপিনের জমিদার বাড়ির সর্ব্বত্র অবাধগতি। সে অন্দরে ঢুকিতেই জমিদার-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, আরে এস এস বিপিন, কখন এলে? তারপর তোমার ভাই এখনও সেই হাসপাতালেই রয়েছে? কেমন আছে আজকাল?

জমিদার অনাদি চৌধুরী বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া দোতলা হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, ও কে? বিপিন না? এলে এতদিন পরে? দশ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে করলে ছমাস। এ রকম ক'রে কাজ চলবে? দাঁড়াও, আমি আসছি—

বিপিন জমিদার-গৃহিণীকে প্রণাম করিল। গৃহিণীর বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে, রং ফর্সা, মোটাসোটা চেহারা, পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, হাতে দুই গাছা সোনার বালা ছাড়া

অন্য কোন গহনা নাই। তিনি বলিলেন, এস এস, বেঁচে থাক। তোমাকে ডাকার আরও বিশেষ দরকার, খুকীকে নিয়ে জামাই আসছেন বুধবারে। ঘরে একটা পয়সা নেই। ধোপাখালির কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। তাগাদাপত্র না করলে জামাই এলে একেবারে মুস্কিলে প'ড়ে যেতে হবে। সেই জন্যে কর্ত্তা তোমার ওখানে কাল লোক পাঠিয়েছিলেন তোমায় নিয়ে আসতে।

অনাদি চৌধুরী ইতিমধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর বয়স ষাটের উপর, বর্ত্তমান গৃহিণী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ। বাতের রোগী বলিয়া খুব বেশি নড়াচড়া করিতে পারেন না, যদিও শরীর এখনও বেশ বলিষ্ঠ। এক সময়ে দুর্দ্দান্ত জমিদার বলিয়া ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অনাদি চৌধুরী বলিলেন, খুকী আসছে বুধবারে। এদিকে ধোপাখালি কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। একটি পয়সা আদায়-তশিল নেই। তোমার কাণ্ডজ্ঞানটা যে কি, তাও তো বুঝি নে! তোমার বাবার আমলে এই মহল থেকে তিনশো টাকা ফি মাসে আদায় ছিল আর এখন সেই জায়গায় পঞ্চাশ ষাট টাকা আদায় হয় না। তুমি কাল সকালেই চ'লে যাও কাছারিতে। মঙ্গলবার রাতের মধ্যে আমার চল্লিশটা টাকা চাইই, নইলে মান যাবে, জামাই আসছে এতকাল পরে, কি মনে করবে? আদর যত্ন করব কি দিয়ে?

জমিদার-গৃহিণী বলিলেন, আর আসবার সময় কিছু কুমড়ো,

বেগুন, থোড় কিংবা মোচা আর যদি পার ভাল মাছ একটা রঘুদের পুকুর থেকে, আর কিছু শাকশব্জি আনবে। ঘানি-ভাঙানো সর্ষে তেল এন আড়াই সের, আর এক ভাঁড় আখের গুড় যদি পাও—

বিপিন মনে মনে হাসিল। জমিদার-গৃহিণী যে এ সমস্ত আনিতে বলিতেছেন, সবই বিনামূল্যে প্রজা টেঙাইয়া। নতুবা পয়সা ফেলিলে জিনিসের অভাব কি? 'যদি পাও' কথার মানেই হইল 'যদি বিনামূল্যে পাও'—এমন ছোট নজর, আর এমন কৃপণ স্বভাব! পরের জিনিস এমনই যোগাইতে পার, খুব খুশি। দায় পড়িয়াছে বিপিনের পরের শাপমন্যি কুড়াইয়া তাঁহাদের জন্যে বেসাতি আনিবার, এমনই তো ছোট ভাইটা হাসপাতালে পড়িয়া শুষিতেছে। এই সব জন্যেই এখানকার চাকুরির অন্ন তাহার গলা দিয়া নামে না।

৩

পলাশপুর হইতে ধোপাখালির কাছারি আট ক্রোশ। নায়েবের জন্য গাড়ি ব্যবস্থা করিবেন তেমন পাত্র নন অনাদি চৌধুরী—সুতরাং সারা পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বিপিন কাছারি পৌঁছিল। কাছারি-ঘরে কানেস্ত্রা-কাটা টিনের দেওয়াল, চাল খড়ের। স্থানীয় জনৈক নাপিতের পুত্র মাসিক বারো আনা

বেতনে কাছারিতে ঝাঁটপাটের কাজকর্ম্ম করে। বিপিন তাহাকে সংবাদ দিয়া আনাইল, সে ঘর খুলিয়া ঝাঁট দিয়া কাছারি-ঘরটাকে রাত্রিবাসের কতকটা উপযোগী করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু বিপিনের ভয় হইতেছিল, মেঝেতে যে রকম বড় বড় চার পাঁচটা ইঁদুরের গর্ত্ত হইয়াছে রাত্রিবেলা সাপখোপ না বাহির হয়!

চাকর ছোকরা একটি কাচভাঙ্গা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মেঝেতে রাখিয়া বলিল, নায়েববাবু, রাত্রে কি খাবা ?

—কিছু খাব না। তুই যা।

—সে কি বাবু! তা কখনও হ'তে পারে? খাবা না কিছু, রাত কাটাবা কেমন ক'রে? একটু দুধ দেখে আসি পাড়ার মধ্যে, আপনি বসেন বাবু।

এই ছোকরা চাকর যে যত্ন করে, দরদ দেখায় বিপিন অনেক আপনার লোকের কাছেও তেমন ব্যবহার পায় নাই, একথা তাহার মনে হইল।

অন্ধকার রাত্রি।

কাছারির সামনে একটু ফাঁকা মাঠ, অন্য সব দিকে ঘন বাঁশবন, এক কোণে একটা বড় বাদাম গাছ। অনাদি চৌধুরীর বাবা ৺হরিনাথ চৌধুরী কাছারি-বাড়িতে এটি সখ করিয়া পুঁতিয়াছিলেন, ফলের জন্য নয়, বাহার ও ছায়ার জন্য। বাঁশবনে অন্ধকার রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে উড়িতেছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে, মশা বিন্ বিন্

করিতেছে কানের কাছে—কাছারির কাছাকাছি লোকজনের বাস নাই—ভারী নির্জ্জন।

বিপিন একা বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কত কথাই মনে আসে! বাড়ি হইতে আসিয়া মন ভাল নয়, হাসপাতালে ছোট ভাইটার রোগশীর্ণ মুখ মনে পড়িল। মনোরমার ঝাঁঝালো টক্ টক্ কথাবার্ত্তা। সংসারের ঘোর অনটন। বাজারে হেনো দোকান নাই, যেখানে দেনা নাই। আজ শনিবার, সামনের বুধবারে মহল হইতে চল্লিশটা টাকা ও একগাদা ফল, তরকারিপত্র, মাছ, দই জমিদার-বাড়ি লইয়া যাইতে হইবে জামাইয়ের অভ্যর্থনা যোগাড় করিতে। তিন দিনের মধ্যে এ গরীব গাঁয়ে চল্লিশ টাকা হওয়া দূরের কথা, দশটি টাকা হয় কিনা সন্দেহ—অথচ জমিদার বা জমিদার-গিন্নী তা বুঝবেন না—দিতে না পারিলেই মুখ ভারী হইবে তাঁদের! কি বিষম মুস্কিলেই সে পড়িয়াছে। অথচ চিরকাল তাহাদের এমন অবস্থা ছিল না। বিপিনের বাবা এই কাছারিতে এক কলমে উনিশ বছর কাটাইয়া গিয়াছেন, এই জমিদারদের কাজে! যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিতেন, বাড়িতে লাঙল রাখিয়া চাষবাস করাইতেন, গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট নামডাক, প্রতিপত্তি ছিল।

বাবা চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল। কতক গেল দেনার দায়ে কতক গেল তাহারই বদ্‌খেয়ালিতে। অল্প বয়সে কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া কুসঙ্গীর দলে ভিড়িয়া স্ফূর্ত্তি করিতে গিয়া টাকা তো উড়িলই, ক্রমে জমিজমা বাঁধা পড়িতে লাগিল।

তারপর বিবাহ। সে এক মজার ব্যাপার।

তখনও পর্য্যন্ত যতটুকু নামডাক ছিল পৈতৃক আমলের, তাহারই ফলে এক অবস্থাপন্ন বড় গৃহস্থের ঘরের মেয়ের সহিত হইল বিবাহ। মেয়ের বাবা নাই, কাকা বড় চাকুরি করেন, শালাশালীরা সব কলেজে-পড়া, বিপিন ইংরাজীতে কোনও রকমে নাম সই করিতে পারে মাত্র। মনোরমা শ্বশুরবাড়ি আসিয়াই বুঝিল বাহির হইতে যত নামডাকই থাকুক, এখানকার ভিতরের অবস্থা অন্তঃসারশূন্য। সে বড় বংশের মেয়ে, মন গেল তার সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া, স্বামীর সহিত সদ্ভাব জমিতে পাইল না যে; ইহাতে বিপিন মনে প্রাণে স্ত্রীকে অপরাধিনী করিতে পারে কই?

—এই যে নায়েববাবু কখন আলেন? দণ্ডবৎ হই।

বিপিনের চমক ভাঙিল, আগন্তুক এই গ্রামেরই একজন বড় প্রজা, নরহরি দাশ.জাতিতে মুচি, শূওরের ব্যবসা করিয়া হাতে দুপয়সা করিয়াছে।

বিপিন বলিল, এস নরহরি, বড় মুস্কিলে পড়েছি, বুধবারের মধ্যে চল্লিশটি টাকার যোগাড় কি ক'রে করি বল তো? বাবুর জামাই মেয়ে আসবেন, টাকার বড্ড দরকার। আমি তো এলাম দুমাস পরে। টাকা যোগাড় না করতে পারলে আমার তো মান থাকে না—কি করি, ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম যে!

নরহরি বলিল, এসব কথা এখন নয় বাবু। খাওয়া দাওয়া করুন, কাল বেন্‌বেলা আমি আসপো কাছারিতে—তখন হবে।

ইতিমধ্যে কাছারির ছোকরা চাকর একটা ঘটিতে কিছু দুধ ও কোঁচড়ে কিছু মুড়ি লইয়া ফিরিল।

নরহরি বলিল, আপনি সেবা করুন নায়েববাবু, আজ আসি। কাল কথাবার্ত্তা হবে। কাছারি-ঘরের দোরটা একটু ভাল ক'রে আগড় বন্ধ ক'রে শোবেন রাতে—বড্ড বাঘের ভয় হয়েছে আজ কড়া দিন।

বিপিন সকালে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিল। তহবিলের টাকার ঘাটতি ইহারা টের পায় নাই। তবুও টাকাটা এবার তহবিলে শোধ করিয়া দিতে হইবে, জমিদার হিসাব তলব করিতে পারেন, এত দিন পরে যখন সে আসিয়াছে। তাহা হইলে অন্ততঃ আশি টাকার আপাততঃ দরকার, এই তিন দিনের মধ্যে।

তিনটি দিন বাকি মোটে। এখন কোন ফসলের সময় নয়, আশি টাকা আদায় হইবে কোথা হইতে? পাইক গিয়া প্রজাপত্র ডাকাইয়া আনিল, সকলের মুখেই এক বুলি, এখন টাকা তারা দেয় কি করিয়া?

নরহরি দাশ পনরটি টাকা দিল। ইহার বেশি তাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও হইবে না। বিপিন নিজে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া আরও দশটি টাকা আদায় করিল দুইদিনে। ইহার বেশি হওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব।

বিপিন একবার কামিনী গোয়ালিনীকে ডকাইল।

এ অঞ্চলে অনেকে জানে যে, বিপিনের বাবা বিনোদ

চাটুজ্জের সঙ্গে কামিনীর নাকি বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন কামিনীর বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন, একহারা, শ্যামবর্ণ—হাতে মোটা সোনার অনন্ত। সে বিপিনকে স্নেহের চক্ষে দেখে, বিপিন যখন দশ বারো বছরের বালক, বাবার সঙ্গে কাছারিতে আসিত তখন হইতেই সে বিপিনকে জানে। বিপিনও তাহাকে সমীহ করিয়া চলে।

কামিনী প্রথমে আসিয়াই বিপিনের ছোট ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বাবা, তারে তুমি কলকেতায় নিয়ে গিয়ে বড় একটা ডাক্তার টাক্তার দেখাও—এখানে বাঁচবে না। রাণাঘাটের হাসপাতালে কি হবে? ছোঁড়াডাকে তোমরা সবাই মেলে মেরে ফেলবা দেখছি।

—করি কি মাসীমা, জান তো অবস্থা। বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারে আগের মত জুত নেই। বাবার দেনা শোধ দিয়ে—

কামিনী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, কর্ত্তার দেনার জন্যে যায় নি —গিয়েছে তোমার উড়ঝুড়ে স্বভাবের জন্যে—আমি জানি নে কিছু? কর্ত্তা যা রেখে গিয়েছিলেন ক'রে, তাতে তোমাদের দুই ভায়ের ভাতের ভাবনা হ'ত না। বিষয়-আশয়, গোলাপালা, তোমার পৈতের সময় হাজার লোক পাত পেড়ে ব'সে খেয়েছিল কম বিষয়ডা ক'রে গিয়েছিলেন কর্ত্তা? তোমরা বাবা সব ঘুচুলে। তাঁর মত লোক তোমরা হ'লে তো!

বিপিন দেখিল সে ভুল করিয়াছে। বাবার কোন ত্রুটীর উল্লেখ ইহার সামনে করা উচিত হয় নাই—সে বরাবর দেখিয়া আসিয়াছে কামিনী মাসী তাহা সহ্য করিতে পারে না। ইহার কাছে কিছু টাকা আদায় করিতে হইবে, রাগাইয়া লাভ নাই। সুর বেশ মোলায়েম করিয়া বলিল, ও কথা যাক মাসীমা, কিছু টাকা দিতে পার, এই গোটা চল্লিশ টাকা। কিস্তির সময় আদায় ক'রে আবার দেব।

কামিনী পূর্ব্ববৎ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, টাকা, টাকা! টাকার গাছ দেখেছ কিনা আমার? সেবার এক কাঁড়ি টাকা যে নিলে আর উপুড় হাত করলে না; আর একবার দিলাম কুড়ি টাকা পূজোর সময়; তোমার কেবল টাকার দরকার হ'লেই—মাসী মাসী। বাতে যে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম কুড়ি পঁচিশ দিন—খোঁজ করেছিলে মাসীমা ব'লে?

বিপিন কামিনী মাসীকে কি করিয়া চালাইতে হয় জানে। তরুণ তরুণীদের কাছে প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়াদের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িতে বেশিক্ষণ লাগে না। তাহারা জানে উহাদের কি করিয়া হাতে রাখিতে হয়। সুতরাং বিপিন হাসিয়া বলিল, খোকার ভাতের সময় তোমায় নিয়ে যাব ব'লে সব ঠিক মাসী, এমন সময় বলাইটা অসুখে পড়ল; তোমার টাকা কড়িও সব তো এতদিন শোধ হয়ে যেত, ওর অসুখটা যদি না হ'ত!

কামিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ জবাব দিল, আচ্ছা, হয়েছে ঢের, আর বলার কাজ নেই

বাপু। বেলা হয়েছে, চললাম আমি। কদিন আছ এখানে ?

—মঙ্গলবার সন্দেবেলা কি বুধবার সকালে যাব। মাসীমা, যা বললাম কথাটা মনে রেখ। টাকাটা যদি যোগাড় ক'রে দিতে পারতে, তবে বড্ড উপকার হ'ত। তোমার কাছে না চাইব তো কার কাছে চাইব, বল !

কামিনী সে কথায় তত কান না দিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, তোমার পাইককে কি ওই নটবরের ছেলেটাকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও, পেঁপে পেকেছে সঙ্গে দেব।

মঙ্গলবার বৈকালে কামিনীর কাছে পাওয়া গেল পঁচিশটি টাকা। ধোপাখালির হাট হইতে জমিদার-গিন্নীর ফরমাসমত জিনিসপত্র কিনিয়া বিপিন বুধবার শেষ রাত্রির দিকে গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হইল এবং বেলা দশটার সময় পলাশপুর আসিয়া পৌঁছিল।

জমিদার-বাড়ি পৌঁছিবার পূর্বে শুনিল, জামাইবাবু কাল রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জমিদারবাবুর অবস্থা এখন তত ভাল নয় বলিয়া তেমন বড় পাত্রে মেয়েকে দিতে পারেন নাই। জামাই আইন পাস করিয়া আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন। কলিকাতায় বাড়ি আছে—পৈতৃক বাড়ি, যদিও দেশ এই পলাশপুরের কাছেই নোনাপাড়া।

তরিতরকারির ধামা গরুর গাড়ি হইতে নামাইতে দেখিয়া

জমিদার-গৃহিণী খুশি হইয়া বলিলেন, ওই দেখ, বিপিন মহল থেকে কত জিনিসপত্র এনেছে! বড় কুমড়োটা কে দিলে বিপিন? কি চমৎকার কুমড়োটি!

বিপিন বলিল, দেবে আবার কে? কাল হাটে কেনা।

—আর এই পটল, ঝিঙে, শাকের ডাঁটা?

—ও সব হাটে কেনা। দেবে কে বলুন, কার দোরেই বা আমি চাইতে যাব?

—ওমা, সব হাটে কেনা! তা এত জিনিস পয়সা খরচ ক'রে না আনলেই হ'ত। মহল থেকে আগে তো দেখেছি কত জিনিসপত্র আসত, তোমার বাবাই আনতেন, আর আজকাল ছাই বলতে রাইও তো কখনও দেখি নে। ওটা কি, মাছ দেখছি যে, বেশ মাছ! ওটাও কেনা নাকি?

—আড়াই সের, সাত আনা দরে, সাড়ে সতেরো আনায় নগদ কেনা। জমিদার-গিন্নী বিরক্ত মুখে বলিলেন, কে বাপু তোমায় বলেছিল নগদ পয়সা ফেলে আড়াই সের মাছ কিনে আনতে? মহলে নেই এক পয়সা আদায়, এর ওপর তরিতরকারি মাছে দু টাকার ওপর খরচ ক'রে ফেলতে কে বলেছিল, জিগ্যেস করি?

বিপিন বলিল, দু টাকার ওপর কি বলছেন? সাড়ে তিন টাকা খরচ হয়েছে। আপনি সেই এক নাগরি আখের গুড় আনতে বলেছিলেন, তাও এনেছি। সাড়ে সাত সের নাগরি, তিন আনা ক'রে সের হিসেবে—

জমিদার-গিন্নী রাগিয়া বলিলেন, থাক, আর হিসেব দেখাতে হবে না। তোমাকে আমি ওসব কিনে আনতে কি বলেছিলাম যে আমার কাছে হিসেব দেখাচ্ছ ?

বিপিন খুশির সহিত ভাবিল, বেশ হয়েছে, মরছেন জ্ব'লে পয়সা খরচ হয়েছে ব'লে। কি কঞ্জুষ আর কি ছোট নজর রে বাবা !

মুখে সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

৪

জামাইটির সঙ্গে তাহার দেখা হইল বিকালের দিকে। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ বছর, একটু হৃষ্টপুষ্ট, চোখে চশমা, গম্ভীর মুখ—বৈঠকখানায় বসিয়া কি ইংরেজী কাগজ পড়িতেছিলেন। বিপিন বার কয়েক বৈঠকখানায় যাওয়া-আসা করিল বটে, কিন্তু জামাইবাবু বোধ করি তাহার অস্তিত্বের প্রতি বিশেষ কিছু মনোযোগ না দিয়াই একমনে খবরের কাগজ পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

বিপিনের রাগ হইল। তখনই সে সংকল্প করিল, সেও দেখাইবে, বড় লোকের জামাইকে সে গ্রাহ্যও করে না। তুমি আছ বড় লোকের জামাই, তা আমার কি ?

বিপিন বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকিয়া ফরাস বিছানো চৌকির এক

পাশে বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ নিঃশব্দে। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, জামাইবাবু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না বা একটা কথাও বলিলেন না।

বিপিন পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল এবং ইচ্ছা করিয়াই ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল এমন ভাবে যাহাতে জামাইয়ের চোখে পড়ে।

জামাইবাবু বোধ হয় এবার ধূম্র হইতে বহ্নিমান পর্ব্বতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া খবরের কাগজ চোখের সম্মুখ হইতে নামাইলেন। বিপিনকে তিনি চেনেন, বিবাহের পর দুই তিন বার দেখিয়াছেন, শ্বশুরের জমিদারির জনৈক কর্ম্মচারী বলিয়া জানেন। তাহাকে এরূপ নির্ব্বিকার ও বেপরোয়া ভাবে তাঁহার সম্মুখে বিড়ি ধরাইয়া খাইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত তো হইলেনই, লোকটার বেয়াদবিতে একটু রাগও হইল।

কিন্তু সে বেয়াদবি সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক করিয়া দিল, যখন সেই লোকটা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, জামাইবাবু, কেমন আছেন? চিনতে পারেন? বিড়ি-টিড়ি খান নাকি? নিন না, আমার কাছে আছে।

কথা শেষ করিয়া লোকটা একটা দেশলাই ও বিড়ি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিতে আসিল। নিতান্ত বেয়াদব ও অসভ্য।

জামাইবাবু বিপিনের দিকে না চাহিয়া গম্ভীর মুখে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, থাক, আছে আমার কাছে।—বলিয়া পকেট

হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেটের কেস বাহির করিয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন। বিপিন ইহাতে অপমানিত মনে করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য পাল্টা অপমানের অন্য কোন ফাঁক খুঁজিয়া না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, জামাইবাবুর ও কি সিগারেট ? একটা এদিকে দিন দিকি !

বাড়ির গোমস্তা জমিদারবাবুর জামাইয়ের নিকট সিগারেট চায়, ইহার অপেক্ষা বেয়াদবি ও অপমান আর কি হইতে পারে ? বিপিন সিগারেটের জন্য গ্রাহ্যও করে না ; কিন্তু লোকটাকে অপমান করিয়াই তাহার সুখ।

জামাইবাবু কিন্তু রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

বিপিন সিগারেট ধরাইয়া বলিল, তারপর জামাইবাবু, কবে এলেন ?

—কাল রাত্রে।

—বাড়ির সব ভাল তো ?

—হুঁ।

—আপনি এখন সেই আলিপুরেই ওকালতি করছেন ?

—হুঁ।

—বেশ বেশ। দিদিমণি আর ছেলেপুলেদের সব এখানে এনেছেন নাকি ?

—হুঁ।

এতগুলি কথার উত্তর দিতে গিয়া জামাইবাবু একবারও তাহার দিকে চাহিলেন না বা খবরের কাগজ সেই যে আবার চোখের সামনে ধরিয়া আছেন তাহা হইতে চোখও নামাইলেন না।

বিপিনের ইচ্ছা হইল, আরও একটু শিক্ষা দেয় এই শশুরে চালবাজ লোকটাকে। অন্য কোনও উপায় না ঠাওরাইতে পারিয়া বলিল, মানীর শরীর বেশ ভাল আছে তো?

মানী জমিদারবাবুর মেয়ে স্বলতার ডাকনাম। ডাকনামে গ্রামের মেয়েকে ডাকা এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, যদি বিপিনের বয়স বেশি হইত। কিন্তু তাহার বয়স জামাইয়ের চেয়ে এমন কিছু বেশি নয়, বা স্বলতাও নিতান্ত বালিকা নয়, কম করিয়া ধরিলেও স্বলতা বাইশ বছরে পড়িয়াছে গত জ্যৈষ্ঠ মাসে।

এইবার প্রত্যাশিত ফল ফলিল বোধ হয়, জামাইবাবু হঠাৎ মুখ হইতে খবরের কাগজ নামাইয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া একটু কড়া গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, মানী কে?

অর্থাৎ মানী কে তিনি ভাল রকমেই জানেন, কিন্তু জমিদার-বাড়ির মেয়েকে 'মানী' বলিয়া সম্বোধন করিবার বেয়াদবি তোমার কি করিয়া হইল—ভাবখানা এইরূপ।

বিপিন বলিল, মানী মানে দিদিমণি—বাবুর মেয়ে, আমরা মানী ব'লেই জানি কিনা। আমাদের চোখের সামনে মানুষ—

ঠিক এই সময়ে চা ও জলযোগের জন্য অন্দর-বাড়ি হইতে জামাইবাবুর ডাক পড়িল।

বিপিন বসিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইল, শশুরে জামাই-বাবুর চালবাজি সে ভাঙিয়া দিয়াছে। বিপিনকে এখনও চেনে নাই! চাকুরির পরোয়া সে করে না, আর কেহ যে তাহার সামনে চাল দেখাইয়া তাহাকে ছোট করিয়া রাখিবে—তাহার ইহা অসহ্য।

ঝি আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, মা-ঠাকরুণ বললেন, আপনি কি এখন জল-টল কিছু খাবেন ?

রাগে বিপিনের গা জ্বলিয়া গেল। এইভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে অতি বড় নির্লজ্জ লোকও কি বলিতে পারে যে সে খাইবে ? ইহাই ইহাদের বলিয়া পাঠাইবার ধরণ। সাধে কি সে এখানে থাকিতে নারাজ !

রাত্রে খাওয়ার সময়েও এই ধরণের ব্যাপার অন্যরূপ লইয়া দেখা দিল।

দালানের একপাশে জামাইবাবু ও তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। জামাইয়ের পাতের চারিদিকে আঠারোটা বাটি, তাহাকে দিবার সময় সব জিনিসই পাতে দিয়া যাইতেছে। তাহার পরে দেখা গেল, জামাইবাবুর পাতে পড়িল পোলাও, তাহার পাতে সাদা ভাত। অথচ বিপিন বিকাল হইতেই খুশির সহিত ভাবিয়াছে, রাত্রে পোলাও খাওয়া যাইবে। পোলাও রান্নার কথা সে জানিত।

কি ভাগ্য, জামাইয়ের পাতে লুচি দেওয়ার সময় জমিদার-গিন্নী তাহার পাতেও খান চার লুচি দিলেন !

বিপিন খাইয়ে লোক, চারখানি লুচি শেষ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া জমিদার-গিন্নী বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব।

ইহা জিজ্ঞাসা নয়, দিব্য পরিস্ফুট স্বগত উক্তি। অর্থাৎ ইহা শুনিয়া যদি বিপিন লুচি আনিতে বারণ করিয়া দেয়। কিন্তু বিপিন তরুণ যুবক, ক্ষুধাও তাহার যথেষ্ট। চক্ষুলজ্জা করিলে তাহার চলে না। সে চুপ করিয়া রহিল। জমিদার-গিন্নী আবার চারখানা গরম লুচি আনিয়া তাহার পাতে দিলেন, বিপিন সে কখানা শেষ করিতে এবার কিছু বিলম্ব করিল, চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া। কারণ, ওদিকে জামাইবাবু হাত গুটাইয়াছেন। জমিদার-গিন্নী ঘরের দোরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ; বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব।

ইহাও জিজ্ঞাসা নয়, পূর্ব্ববৎ স্বগত উক্তি, তবে বিপিনকে শুনাইয়া বটে। বিপিন ভাবিল, ভাল মুস্কিলে পড়া গেল! লুচি দেব, লুচি দেব! দেবার ইচ্ছে হয় দিয়ে ফেললেই তো হয়, মুখে অমন বলার কি দরকার?

জমিদার-গৃহিণী যদি ভাবিয়া থাকেন যে, বিপিন আর লুচি আনিতে বারণ করিবে, তবে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল, বিপিন কোন কথা কহিল না। আবার চারখানা লুচি আসিল।

চারখানি করিয়া ফুলকো লুচিতে বিপিনের কি হইবে? সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, খাইতে পারে, ওরকম এক ধামা লুচি হইলে তবে তাহার কুলায়। কাজেই সে বলিল, না মাসীমা, লুচি

খাওয়া অভ্যেস নেই, ভাত না হ'লে যেন খেয়ে তৃপ্তি হয় না।

জমিদার-গিন্নী ভাত আনিয়া দিলেন, মনে হইল তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। বিপিন মনে মনে হাসিল।

খাওয়া শেষ করিয়া সে বাহিরের ঘরে যাইতেছে, রোয়াকের কোণের ঘরের জানালার কাছ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে কে ডাকিল, ও বিপিনদা!

বিপিন চাহিয়া দেখিল, জানালার গরাদে ধরিয়া ঘরের ভিতরে জমিদারবাবুর মেয়ে মানী দাঁড়াইয়া আছে।

মানী দেখিতে বেশ সুশ্রী, রংও ওর মায়ের মত ফর্সা, এখনও একহারা চেহারা আছে, তবে বয়স হইলে মায়ের মত মোটা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, বেশভূষার প্রতি চিরকালই তাহার সযত্ন দৃষ্টি, এখনও যে ধরণের একখানি রঙিন শাড়ি ও হাফ-হাতা ব্লাউজ পরিয়া আছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা তেমন আটপৌরে সাজ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না, একথা বিপিনের মনে হইল।

বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জে যখন এঁদের ষ্টেটে নায়েব ছিলেন, বিপিন বাপের সঙ্গে বাল্যকালে কত আসিত এঁদের বাড়িতে, মানীর তখন নয় দশ বছর বয়স। মানীর সঙ্গে সে কত খেলা করিয়াছে, মানীর সাহায্যে উপরের ঘরের ভাঁড়ার হইতে আমসত্ত্ব ও কুলের আচার চুরি করিয়া দুইজনে সিঁড়ির ঘরে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া খাইয়াছে, মানীর পড়া বলিয়া দিয়াছে,

বিপিনের পৈতা হইবার পর মানী একবার বিপিনের ভাতের থালায় নিজের পাত হইতে কি একটা তুলিয়া দিয়া বিপিনের খাওয়া নষ্ট করার জন্য মায়ের নিকট হইতে খুব বকুনি খায়। সেই মানী, কত বড় হইয়া গিয়াছে! ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

বিপিন বলিল, মানী, কেমন আছ ?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ বিপিনদা ?

বিপিনের মনে হইল, তাহার সহিত কথা বলিবার জন্যই মানী এই জানালার ধারে অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে।

মানীকে এক সময় বিপিন যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিত, ভালবাসা হয়তো তখনও ঠিক জন্মায় নাই; কিন্তু বিপিনের সন্দেহ হয়, মানী তাহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহাকে শুধু 'স্নেহ' বা 'শ্রদ্ধা' বলিলে ভুল হইবে, তাহা আরও বড়, ভালবাসা ছাড়া তাহার অন্য কোন নাম দেওয়া বোধ হয় চলে না।

মানীর কথা বিপিন অনেকবার ভাবিয়াছে। এক সময়ে মানী ছিল তাহার চোখে নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ। মনোরমাকে বিবাহ করিবার সময় বাসরঘরে মানীর মুখ কতবার মনে আসিয়াছে। তবে সে সব আজ ছয় সাত বছরের কথা, তাহার নিজের বয়সই হইতে চলিল সাতাশ আটাশ।

বিপিন বলিল, খুব ভাল আছি। তুমি যে মাথায় খুব বড় হয়ে গিয়েছ মানী ?

—বিপিনদা, ওরকম ক'রে কথা বলছ কেন ? আমি কি নতুন লোক এলাম ?

বিপিনের মনে পড়িল, মানীকে সে কখনো 'তুমি' বলে নাই, চিরকাল 'তুই' বলিয়া আসিয়াছে ; এখন অনেক দিন পরে দেখা, প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, বলিল, কলকাতার লোক এখন তোরা, তুই কি আর সেই পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট মানীটি আছিস ?

—তুমি কি আমাদের কাছারিতে কাজে ঢুকেছ ?

—হ্যাঁ। না ঢুকে করি কি, সংসার একেবারে অচল। তোর কাছে বলতে কোনও দোষ নেই মানী, যেদিন এখানে এলুম এবার, না হাতে একটি পয়সা, না ঘরে একমুঠো চাল। আর ধর লেখাপড়াই বা কি জানি, কিছুই না।

—কিন্তু তুমি এখানে টিকতে পারবে না বিপিনদা। তুমি ঘোর খামখেয়ালী মানুষ, তোমায় আর আমি চিনি নে ? বিনোদকাকা যে রকম ক'রে কাজ ক'রে টিকে থেকে গিয়েছেন, তুমি কি তেমন পারবে ? আজই কি সব করেছ, তু তিন টাকা খরচ ক'রে দিয়েছ—মা বলছিলেন বাবাকে। বলিয়া মানী হাসিল।

বিপিন বলিল, যদি খরচই ক'রে থাকি, সে তো তোদেরই জন্যে। তুই এসেছিস্ এতকাল পরে, একটু ভাল মাছ না খেতে পেলে তুইই বা কি ভাববি ?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মহল থেকে মাছ আনলে না কেন ?

—কে মাছ দেবে বিনি পয়সায় তোমাদের মহালে ? বাবার আমলের সে ব্যাপার আর আছে নাকি ? এখন লোক হয়ে গিয়েছে চালাক, তাদের চোখ কান ফুটেছে। তোমার মা কি সে খবর রাখেন ?

—তা নয়, বিনোদকাকার মত দাপিটে হুঁদেও তো তুমি নও বিপিনদা। তুমি ভাল মানুষ ধরণের লোক, জমিদারির কাজ করা তোমার দ্বারা হবে না।

শেষ কথাগুলি মানী যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল।

বিপিন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বাঃ তো রে মানী, একেই না বলে জমিদারের মেয়ে! দস্তুরমত জমিদারি চালের কথাবার্ত্তা হচ্ছে যে!

মানী বলিল, কেন হবে না, বল ? আমি জমিদারের মেয়ে তো বটেই, সংস্কৃত তো পড় নি বিপিনদা, সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—সিংহের বাচ্চা জন্মেই হাতীর মুণ্ডু খায় আর—

—থাক্ থাক্, তোর আর সংস্কৃত বিদ্যে দেখাতে হবে না, ও সবের ধার মাড়াই নি কখনও। আচ্ছা, আসি মানী, রাত হয়ে যাচ্ছে।

মানী বলিল, শোন শোন, যেও না, রাত এখন তো ভারী! আচ্ছা বিপিনদা, ভারী দুঃখ হয় আমার, লেখাপড়াটা কেন ভাল ক'রে শিখলে না ? তোমার চেহারা ভাল, লেখাপড়া শিখলে চাকরিতে তোমায় যেচে আদর ক'রে নিত—এ আমি বলতে পারি।

বিপিন বলিল, আচ্ছা মানী, একবার তুই আর আমি ভাঁড়ারঘর থেকে কুলচুর চুরি ক'রে খেয়েছিলাম, মনে পড়ে? সিঁড়ির ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছিলুম?

মানী বলিল, তা আর মনে নেই! সে সব এক দিন গিয়েছে! কিন্তু আমার কথা ওভাবে চাপা দিলে চলবে না। লেখাপড়া শিখলে না কেন, বল?

বিপিন হাসিয়া বলিল, উঃ, কি আমার কৈফিয়ৎ-তলবকারিণী রে?

পরে ঈষৎ গম্ভীরমুখে বলিল, সে অনেক কথা। সে কথা তোর শুনে দরকারও নেই। তবে তোর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। হ'ল কি জানিস? বাবা মারা গেলেন বিস্তর বিষয়সম্পত্তি ও কাঁচা টাকা রেখে। আমি তখন সবে আঠারোতে পা দিয়েছি, মাথার ওপর কেউ নেই। টাকা উড়ুতে আরম্ভ ক'রে দিলাম, পড়াশুনো ছাড়লাম, বিষয়সম্পত্তি নগদ টাকা পেয়ে কম দরে মৌরসী বিলি করতে লাগলুম। বদখেয়ালের পরামর্শ দেবারও লোক জুটে গেল অনেক। কতদূর যে নেমে গেলাম—

মানী একমনে শুনিতেছিল, শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বল কি বিপিনদা!

—তোর কাছে বলতে আমার কোনও সঙ্কোচ নেই, সঙ্কোচ হ'লেও কোনও কথা লুকোব না। আজ এত দুঃখু পাব কেন মানী, এখানে চাকরি করতে আসব কেন? কিন্তু এখন বয়েস হয়ে

বুঝেছি, কি ক'রেই হাতের লক্ষ্মী ইচ্ছে ক'রে বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম তখন!

—তারপর?

—তারপর এই যে বলছিলাম, নানা রকম বদখেয়ালে টাকাগুলো এবং বিষয়-আশয় জলাঞ্জলি দিয়ে শেষে পড়লাম ঘোর দুর্দ্দশায়। খেতে পাই নে—এমন দশায় এসে পৌঁছুলাম।

মানীর মুখ দিয়া এক ধরণের অস্ফুট বিস্ময় ও সহানুভূতির স্বর বাহির হইল, বোধ হয় তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে। বিপিনের বড় ভালো লাগিল মানীর এই দরদ ও তাহার সতেজ সহজ সজীব সহানুভূতি।

—সে সব কথাগুলো তোর কাছে বলব না। মিছে তোর মনে কষ্ট দেওয়া হবে। এই রকমে দেড় বছর কেটে গেল, তারপর তোর বাবার কাছে এলুম চাকরির চেষ্টায়, চাকরি পেয়েও গেলাম। এই হ'ল আমায় ইতিহাস। তবে এ চাকরি পোষাবে না, সত্যি বলছি। এ আমার অদৃষ্টে টিকবে না। দেখি, অন্য কোথাও ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে—

মানী অত্যন্ত একমনে কথাগুলি শুনিতেছিল। গম্ভীর মুখে বলিল, একটা কথা আমার শুনবে?

—কি?

—আমায় না জানিয়ে তুমি এ চাকরি ছাড়বে না, বল?

—সে কথা দেওয়া শক্ত মানী। সত্যি বলছি, তুই

এসেছিস এখানে তাই, নইলে বোধ হয় এবার বাড়ি থেকে আসতাম না। তবে যে কদিন তুই আছিস, সে কদিন আমিও থাকব। তারপর কি হয় বলতে পারছি নে।

—চিরকালটা তোমার একভাবে গেল বিপিনদা। নিজের গোঁ ও বুদ্ধিতে কষ্ট পেলে চিরদিন! আমার কথা একটিবার রাখ বিপিনদা, তেজ দেখানোটা একবারের জন্যে বন্ধ রাখ। আমায় না জানিয়ে চাকরি ছেড়ো না, আমি তোমার ভালোর চেষ্টাই করব।

বিপিন হাস্যমিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে বলিল, উঃ, মানী পরের উপকারে মন দিয়েছে দেখছি! এমন মূর্ত্তিতে তো তোকে কখনও দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না মানী?

মানী রাগতভাবে বলিল, আবার!

—না না, আচ্ছা তোর কথাই শুনব, যা। রাগ করিস নে।

—কথা দিলে?

এই সময় ঘরের মধ্যে মানীর ছোট ভাই সুধীর আসিয়া পড়াতে মানী পিছন ফিরিয়া চাহিল। বিপিন তাড়াতাড়ি বলিল, চলি মানী, শুইগে, রাত হয়েছে। শরীর ক্লান্ত আছে খুব, সারাদিন মহালে ঘুরেছি টো টো ক'রে রদ্দুরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

রাত্রে বিপিনের ভাল ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে! মানী তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা হইলে সে আজও মনে রাখিয়াছে!

—তবে যে বলে, বিয়ে হ'লেই মেয়েরা সব ভুলে যায়!

বিপিনের পৌরুষগর্ব্ব একটু তৃপ্ত হইয়াছে। মানী জমিদারের মেয়ে, সে গরিব, লেখাপড়া এমন কিছু জানে না, দেখিতেও খুব ভাল নয়, তবু তো মানী তাহার সঙ্গেই নির্জ্জনে কথা বলিবার জন্য লুকাইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল!

দুই তিন দিনের মধ্যে মানীর সঙ্গে আর দেখা হইল না। অনাদিবাবু তাহাকে লইয়া হিসাবপত্র দেখিতে বসেন, রোকড় আজ দুই মাস লেখা হয় নাই, খতিয়ান তৈয়ারি নাই, মাসকাবারী হিসাবের তো কাগজই কাটা হয় নাই। খাইবার সময় বাড়ির মধ্যে যায়, খাইয়া আসিয়াই কাছারি-বাড়িতে গিয়া জমিদারবাবুর সামনে বসিয়া কাজ করিতে হয়।

অনাদিবাবু লোক খারাপ নন, তবে গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কথাবার্ত্তা বেশি বলেন না। জমিদারির কাজ খুব ভাল বোঝেন, তিনি আসনে বসিয়া থাকিলে কাজে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

—বিপিন, গত মাসের প্রজাওয়ারী হিসেবটা একবার দেখি !

বিপিন ফাঁপরে পড়িল। সে-খাতায় গত তিন মাসের মধ্যে সে হাতই দেয় নাই।

—ও খাতা এখন তৈরি নেই।

—তৈরি নেই, তৈরি কর। কিস্তির আর দেরি কি? এখনও যদি তোমার সে হিসেব তৈরি না থাকে—

তারপরে আছে নানা ঝঞ্ঝাট। জেলেরা কোমড়-জাল ফেলিয়াছিল পুঁটিখালির বাঁওরে, বিপিনই জাল পিছু পাঁচ টাকা হিসাবে তাহাদের বন্দোবস্ত দিয়াছিল; আজ চার মাস হইয়া গেল, কেহ একটি পয়সা আদায় দেয় নাই। সেজন্যও জমিদারবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ গেল।

আজই অনাদিবাবু বলিলেন, তুমি খেয়ে-দেয়ে বীরু হাড়ীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই একবার ঘোষপুরে যাও, আজ কিছু বেটাদের কাছ থেকে আনতেই হবে। মেয়ে জামাই এখানে রয়েছে, খরচের অন্ত নেই। আজ অন্তত কুড়িটি টাকা নিয়ে এস।

এই রৌদ্রে খাইয়া উঠিয়াই ঘোষপুর ছুটিতে হইবে। নায়েব গোমস্তা প্রজাবাড়ি তাগাদা করিতে দৌড়ায় কোন্ জমিদারিতে? ইহাদের এখানে এমনই ব্যবস্থা। পাইক-পেয়াদার মধ্যে বীরু হাড়ী এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। বাজে পয়সা খরচ ইহারা করিবেন না, সুতরাং আদায়ের অবস্থাও তথৈবচ।

সন্ধ্যার সময় ঘোষপুর হইতে সে ফিরিল।

জেলেদের পাড়ায় আজ তুই তিন মাস হইতে ঘোর ম্যালেরিয়া লাগিয়াছে। কেহ কাজে বাহির হইতে পারে নাই। কোমড়-জাল যেমন তেমনই জলে ফেলা রহিয়াছে। তবুও সে নিজে গিয়াছিল বলিয়া তাহার খাতিরে টাকা চারেক মাত্র আদায় হইয়াছে।

২

রাত্রে অনাদিবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন বাড়ির মধ্যে। গিন্নীও সেখানে ছিলেন।

—কত আদায় করলে বিপিন?

বিপিন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, চার টাকা।

অনাদিবাবু গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন। চার টাকা মোটে! বল কি? এঃ, এর নাম আদায়? তবেই তুমি মহালের কাজ করেছ!

গিন্নী বলিয়া উঠিলেন, জেলেদের মহালে গেলে বাপু, এক আধটা বড় মাছই না হয় নিয়ে এস! মেয়ে জামাই এখানে রয়েছে, তা তোমার কি সে হুঁস-পব্ব আছে? সেদিন বললাম ধোপাখালির হাট থেকে মাছ আনতে, না আড়াই সের এক কাংলা মাছ পয়সা দিয়ে কিনে এনে হাজির!

বিপিনের ভয়ানক রাগ হইল। একবার ভাবিল, সে বলে, বেশ, এমন লোক রাখুন, যে প্রজা ঠেঙিয়ে বিনি পয়সায় মাছ

আপনাদের এনে দিতে পারবে। আমি চললুম, আমার মাইনে যা বাকি পড়েছে আজই চুকিয়ে দিন। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলাইয়া গেল। কেবল বলিল, মাছ কেউ এখন ধরেছে না মাসীমা। সবাই মরছে ম্যালেরিয়ায়, মাছ ধরবার একটা লোকও নেই। বিপিন সামলাইয়া গেল মানীর কথা মনে করিয়া। মানী এখানে থাকিতে তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সে অপ্রীতিকর কিছু করিতে পারিবে না।

জমিদার-গিন্নী বলিলেন, আর বার-বাড়িতে যাচ্ছ কেন, একেবারে খেয়ে যাও।

ইঁহাদের বাড়িতে রাঁধুনি আছে—এক বৃদ্ধা বামুনের মেয়ে। সে রাত্রে চোখে দেখিতে পায় না বলিয়া গিন্নী নিজেই পরিবেশন করেন। জামাইবাবুও একসঙ্গেই বসিয়া খান, তবে তিনি নরলোকের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না। আজও বিপিন দেখিল, একই জায়গায় খাইতে বসিয়া জামাইয়ের পাতে পড়িল মিষ্টি পোলাও, তাহার পাতে দেওয়া হইল সাদা ভাত। তবে একসঙ্গে বসাইবার মানে কি? সেদিনও ঠিক এমন হইয়াছে সে জানে, ইহারা কৃপণের একশেষ, জামাইয়ের জন্য কোনও রকমে ক্ষুদ্র হাঁড়ির এক কোণে দুটি পোলাও রাঁধিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে দিতে গেলে চলিবে কেন? তবু রোজ পোলাওয়ের ব্যবস্থা করিয়া বড়মানুষি দেখানো চাই! খাওয়ার পরে সে চলিয়া আসিতেছে বাহির-বাড়িতে, জানালায় মানী দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল, ও বিপিনদা!

—এই যে মানী, কদিন দেখি নি ?

—তুমি কখন যাও, কখন খাও, তোমার নিজেরই হিসেব আছে ? আজ পোলাও কেমন খেলে ?

—বেশ।

—না, সত্যি বল না ? ভাল হয়েছিল ?

—কেন বল্ তো ?

—আগে বল না, কেমন হয়েছিল ?

—বললুম তো, বেশ হয়েছিল।

—আমি রেঁধেছি। তুমি মিষ্টি পোলাও খেতে ভালবাসতে, মনে আছে ?

—খুব মনে আছে। আচ্ছা, আমি যাই মানী, রাত হয়ে গেল খুব।

মানী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, মা তোমাকে পেট ভ'রে খেতে দিয়েছিল তো পোলাও ? আমি ওখানে যেতাম, কিন্তু—

বিপিন বুঝিতে পারিল, মানীর স্বামীও সেখানে, এ অবস্থায় মায়ের সামনে পল্লীগ্রামের রীতি অনুসারে মানীর যাওয়াটা অশোভন।

—হ্যাঁ, সে সব ঠিক হয়েছিল। আমি যাই।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে। মায়ের ধাত সে খুব ভাল রকমই জানে, জানে বলিয়াই সে এ প্রশ্ন বিপিনকে করিল। কিন্তু বিপিনের উড়ু উড়ু ভাব দেখিয়া সে একটু বিস্মিত না হইয়া পারিল না। বিপিনদা তো কখনও তাহার সঙ্গে কথা বলিবার

সময় এমন যাই যাই করে না! হয়তো ঘুম পাইয়াছে, রাত কম হয় নাই বটে।

ইহার পর দুই দিন সে জমিদারবাবুর হুকুমে জেলেদের খাজনার তাগাদা করিতে ঘোষপুর গিয়া রহিল। ওখানকার মাতব্বর প্রজা রাইচরণ ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ইহার পূর্ব্বেও সে কিস্তির সময় কয়েক দিন ছিল। নিজেই রাঁধিয়া খাইতে হয়, তবে আদর-যত্ন যথেষ্ট। সঙ্গতিপন্ন গোয়ালাবাড়ি, দুধ-দই-ঘিয়ের অভাব নাই। জমিদারের ব্রাহ্মণ নায়েব বাড়িতে অতিথি। বাড়ির সকলে হাতজোড়, তটস্থ।

কিন্তু বিপিন মনে মনে ভাবে, এতে কি জমিদারির মান থাকে? এমন হয়েছেন আমাদের জমিদার, যে একখানা কাছারি-ঘর করবেন না। অথচ এই মহলে সালিয়ানা আড়াই হাজার টাকা আদায়। একখানা দো-চালা ঘর তুলে রাখলেও তো হয়; কিন্তু তাতে যে পয়সা খরচ হয়ে যাবে! ওরে বাবা রে!

তিন দিনের দিন রাত্রে বিপিন জমিদার-বাড়ি ফিরিল। যাহা আদায়-পত্র হইয়াছে অনাদিবাবুকে তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিয়া একটু বেশি রাত্রে বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া ফিরিতেছে, জানালায় দাঁড়াইয়া মানী ডাকিল, বিপিনদা!

—এই যে মানী, কেমন? তোর নাকি মাথা ধরেছিল শুনলুম, মাসীমার মুখে?

মানী সে কথার কোনও উত্তর দিল না। বলিল, দাঁড়াও, একটা কথা বলি।

—কি রে ?

—তুমি সেদিন মিথ্যে কেন ব'লে গেলে আমার কাছে ? তুমি পোলাও খেয়েছিলে সেদিন ?

মেয়ে মানুষ তুচ্ছ কথা এতও মনে করিয়া রাখিতে পারে ! বাসী কাসুন্দি ঘাঁটা ওদের স্বভাব। দুই দিনের আদায়পত্রের ভিড়ের মধ্যে, কাছারির কাজের চাপে তাহার কি মনে আছে, সেদিন কি খাইয়াছিল, না খাইয়াছিল ! মানীর যেমন পাগলামি !

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন ? খাই নি, তাতে কি ?

মানী বিপিনের কথার সুরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ঝাঁঝালো সুরে বলিয়া উঠিল, তাতে কিছু না। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা কেন ব'লে গেলে ? বললেই হ'ত, খাই নি। আমি তোমায় ফাঁসি দিতাম ?

বিপিন পুনরায় মৃদু হাসিমুখে বলিল, সেইটেই কি ভাল হ'ত ? তোর মনে কষ্ট দেওয়া হ'ত না ?

মানী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বিপিন হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, ও মানী, রাগ করবার কি আছে এতে ? শোন না, ও মানী !

কোনও সাড়াশব্দ না পাইয়া বিপিন বাহির-বাড়ির দিকে চলিল। মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, মেয়েমানুষ সব সমান যেমন মনোরমা, তেমনই মানী। আচ্ছা, কি করলাম, বল তো ? দোষটা কি আমার ?

মনে মনে, কি জানি কেন, বিপিন কিন্তু শান্তি পাইল না। মানীটা কেন যে তাহার উপর রাগ করিল? করাই বা যায় কি? মানী তাহার প্রতি এতটা টানে, তাহা বিপিন কি জানিত? জানিয়া মনে মনে যেমন একটু বিস্মিতও হইল, সঙ্গে সঙ্গে খুশি না হইয়াও পারিল না।

৩

পরের দিন সকালে বিপিন বাড়ির মধ্যে খাইতে বসিয়াছে, জমিদার-গিন্নী আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা বিপিন, সেদিন আমি তোমাকে কি পোলাও দিই নি?

বিপিন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, কোন্ দিন?

—সেই যেদিন রাত্রে তুমি আর সুধাংশু একসঙ্গে খেলে?

—কেন বলুন তো?

—মেয়ে তো আমায় খেয়ে ফেলছে কাল থেকে, একসঙ্গে খেতে বসেছিলে দুজনে, তোমায় পোলাও দিই নি কেন, তাই নিয়ে। তোমায় কি পোলাও দিই নি, বল তো বাবা?

—কেন দেবেন না? আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি দু হাতা, আমার ঠিক মনে হচ্ছে না মাসীমা, একমনে খেয়ে যাই, কত কাজ মাথায়, অত শত কি মনে থাকে? কিন্তু আপনি যেন দু হাতা কি তিন হাতা—

জমিদার-গৃহিণী রান্নাঘরের দোরের কাছে সরিয়া গিয়া

ঘরের ভিতর কাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঐ শোন, নিজের কানে শোন। ও খেয়ে তো মিথ্যে কথা বলবে না? কার মুখে কি শুনিস, আর তোর অমনই মহাভারতের মত বিশ্বাস হয়ে গেল। আর এত লাগানি-ভাঙানিও এ বাড়িতে হয়েছে! এ রকম করলে সংসার করি কি ক'রে?

সেদিন রাত্রে খাইবার সময় বিপিন সবিস্ময়ে দেখিল, ভাতের পরিবর্ত্তে মিষ্টি পোলাও পাতে দেওয়া হইয়াছে। ভোজনের আয়োজনও প্রচুর। এবেলা জামাই সঙ্গেই খাইতে বসিয়াছে। বিপিন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহার ইহাও মনে হইল, জমিদার-গৃহিণী যে ওবেলা মানীর রাগের কথা তুলিয়াছিলেন, সে কেবল সেখানে জামাই ছিল না বলিয়াই।

জামাই প্রতিদিনই আগে খাইয়া দোতলায় চলিয়া যায়। বিপিন একটু ধীরে ধীরে খায় বলিয়া রোজই তাহার দেরি হয় খাইতে। বিপিন খাওয়া শেষ করিয়া বহির্বাটিতে যাইবার সময় দেখিল, মানী তাহারই অপেক্ষায় যেন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন হ'ল, বিপিনদা?

—চমৎকার হয়েছে! সত্যি, সুন্দর পোলাও হয়েছিল! খুব খাওয়া গেল! কে রেঁধেছিল, তুই?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, বল না, কে?

—তুই।

—ঠিক ধরেছ। তা হ'লে আজ খুশি তো? মনে কোনও কষ্ট থাকে তো বল।

—খুশি বইকি, সেদিন যে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলুম পোলাও না খেতে পেয়ে! তবে কষ্ট একটা আছে।

—কি, বল না?

—কাল তুই অত রাগ করলি কেন আমার ওপরে হঠাৎ? আমার কি দোষ ছিল?

মানী স্থির দৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, বলব? বলতাম না, কিন্তু যখন বলতে বললে, তখন বলি। আমার কাছে কখনও কোনও কথা গোপন করতে না বিপিনদা, মনে ভেবে দেখ। বাবার হাত-বাক্স থেকে চাকু-ছুরি প'ড়ে গিয়েছিল, তুমি কুড়িয়ে পেয়ে কাউকে বল নি, শুধু আমায় বলেছিলে, মনে আছে?

—উঃ, সে কত কালের কথা! তোর মনে আছে এখনও?

মানী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিয়াই চলিল, সেই তুমি জীবনে এই প্রথম আমার কাছে কথা গোপন করলে! এতে আমায় যে কত কষ্ট দিলে তা বুঝতে পার? তুমি দূরে রেখে চলতে পারলে যেন বাঁচ।

—ভুল কথা মানী। সেজন্যে নয়, কথাটা তোমার মার বিরুদ্ধে বলা হ'ত নয় কি? ছেলেমানুষি ক'র না, অন্য কথা গোপনে আর একথা গোপনে তফাৎ নেই?

মানী হাসিমুখে কৃত্রিম বিদ্রূপের সুরে বলিল, বেশ গো ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, বেশ। এখন যা বলি, তাই শোন।

এই সময়ে ভেতরের রোয়াকে জমিদার-গৃহিণীর সাড়া পাইয়া বিপিন চট করিয়া জানালার ধার হইতে সরিয়া গেল।

8

পরদিনই বিপিনকে ধোপাখালির কাছারিতে ফিরিতে হইল।

আজকাল বেশ লাগে পলাশপুরে জমিদার-বাড়ি থাকিতে, বিশেষত মানীর সঙ্গে পুনরায় আলাপ জমিবার পর হইতে সত্যই বেশ লাগে।

কিন্তু সেখানে বসিয়া থাকিবার জন্য অনাদি চৌধুরী তাহাকে মাহিনা দিয়া নায়েব নিযুক্ত করেন নাই?

সমস্ত দিন মহালের কাজে টো টো করিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যা-বেলা বিপিন কাছারি ফিরিয়া একা বসিয়া থাকে। ভারী নির্জ্জন বোধ হয় এই সময়টা। পৃথিবীতে যেন কেহ কোথাও নাই। কাছারির ভৃত্যটি রান্নার যোগাড় করিতে বাহির হয়, কাঠ কাটে, কখনও বা দোকানে তেল নুন কিনিতে যায়। সুতরাং বিপিনকে থাকিতে হয় একেবারে একা।

এই সময় আজকাল মানীর কথা অত্যন্ত মনে হয়।

সেদিন পোলাও খাওয়ানোর পর হইতেই বিপিন মানীর

কথা ভাবে। এমন একদিন ছিল, যখন মানী ছিল তাহার খেলার সাথী। সে কিন্তু অনেক দিনের কথা। যৌবনের প্রথমে বদখেয়ালের ঝোঁকে অন্ধকার রাত্রে পথের ধারে ঘাসের উপর অর্দ্ধচেতন অবস্থায় শুইয়া মানীর মুখ কতবার মনে পড়িত।

আর একবার মনে পড়িয়াছিল বিবাহের দিন। উঃ, বড় বেশি মনে পড়িয়াছিল। নববধূর মুখ দেখিয়া বিপিন ভাবিয়াছিল, মানীর মুখের কাছে এর মুখ! কিসের সঙ্গে কি!

এ কথা সত্য, মানীরও ষোল বছরের সে লাবণ্যভরা মুখশ্রী আর নাই। এবার অনেক দিন পরে মানীকে দেখিয়া বুঝিল যে, মেয়েদের মুখে পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র আসে, বয়স তাহার বিজয়-অভিযানের দৃপ্ত রথচক্ররেখা যত শীঘ্র আঁকিয়া রাখিয়া যায় মেয়েদের মুখে, পুরুষদের মুখে তত শীঘ্র পারে না।

কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, সেই মানী তো বটে।

বিপিন ভালই জানিত, জমিদারের মেয়ে মানীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না, সে জিনিসটা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তবুও মানীর বিবাহের সংবাদে সে যেন কেমন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, আজও তাহা মনে আছে।

তখন বিপিনের বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। মনিবের মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি গ্রামের গোয়ালাপাড়া হইতে ঘি কিনিয়া টিনে ভর্ত্তি করিতেছিলেন। গাওয়া ঘি বিপিনদের গ্রামে খুব সস্তা, এজন্য অনাদিবাবু নায়েবকে ঘি যোগাড় করিবার ভার

দিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন বৈকালের ট্রেনে বিপিনের বাবা তিন টিন গাওয়া ঘি, তিন টিন ঘানি-ভাঙা সরিষার তৈল, তরিতরকারি, কয়েক হাঁড়ি দই লইয়া জমিদার-বাড়ি রওনা হইলেন। বিপিন কিছুতেই যাইতে চাহিল না দেখিয়া তাহার বাবা ও মা কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিপিন তখন গ্রামের মাইনর স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের পদে সবে ঢুকিয়াছে, মাত্র কুড়ি বছর বয়স।

তারপর সব একরকম চুকিয়া গিয়াছিল। আজ সাত বছর আর মানীর সঙ্গে তাহার দেখাশুনা হয় নাই। তারপর কত কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল তাহার নিজের জীবনে! তাহার বাবা মারা গেলেন, কুসঙ্গে পড়িয়া সে কি বদখেয়ালিটাই না করিল! বাবার সঞ্চিত কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া দিনকতক সে ধরাকে সরা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর তাহার নিজের বিবাহ হইল, বিবাহের বছরখানেক পরে বিপিন হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিল যে, সে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব, না আছে হাতে পয়সা, না আছে তেমন কিছু জমিজমা। সে কি ভয়ানক অভাব-অনটনের দিন আসিল তারপরে!

সচ্ছল গৃহস্থের ছেলে বিপিন, তেমন অভাব কখনও কল্পনা করে নাই। ধাক্কা খাইয়া বিপিন প্রথম বুঝিল যে, সংসারে একটি টাকা খরচ করা যত সহজ, সেই টাকাটি উপার্জ্জন করা তত সহজ নয়। টাকা যেখানে সেখানে পড়িয়া নাই, আয় করিয়া তবে ঘরে আনিতে হয়।

কিছুকাল কষ্টভোগের পর বিপিন প্রতিবেশীদের পরামর্শে আবার পুরানো চাকুরিস্থলে গিয়া উমেদার হইল। অনাদিবাবু বিপিনের বাবাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, এক কথায় বিপিনকে চাকুরি দিলেন।

আজ প্রায় এক বছরের উপর বিপিন এখানে চাকুরি করিতেছে। কিন্তু তাহার এ চাকুরি আদৌ ভাল লাগে না। যত দিন যাইতেছে, ততই বিপিনের বিতৃষ্ণা বাড়িতেছে চাকুরির উপর। ইহার অনেক কারণ আছে,—প্রথম ও প্রধান কারণ, অনাদিবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর টাকার তাগাদায় তাহার রাত্রে ঘুম হয় না। রোজ টাকা আদায় হয় না—ছোট জমিদারি, তেমন কিছু আয়ের সম্পত্তি নয়, অথচ তাঁহাদের প্রতিদিনের বাজার-খরচের জন্যও নায়েবকে টাকা পাঠাইতে হইবে। কেবল টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও,—এই বুলি।

রাত্রে ঘুমাইয়া সুখ হয় না, কাল সকালেই হয়তো অনাদিবাবুর চিরকুট লইয়া বীরু হাড়ী পলাশপুর হইতে আসিয়া হাজির হইবে। খাইয়া ভাত হজম হয় না উদ্বেগে।

আর একটি কারণ, ধোপাখালির এই কাছারিতে একা বারো মাস থাকা তাহার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর।

বিপিন এখনও যুবক, চার পাঁচ বছর আগেও সে বাপের পয়সা হাতে পাইয়া যথেষ্ট স্ফূর্তি করিয়াছে; সে আমোদের রেশ এখনও মন হইতে যায় নাই। বন্ধুবান্ধব লইয়া আড্ডা দেওয়ার সুখ সে ভালই বোঝে, যদিও পয়সার অভাবে আজ

অনেক দিন হইল সে সব বন্ধ আছে, তবুও গল্পগুজব করিতেও তো মন চায়, তাহাতে তো পয়সা লাগে না। বাড়িতে থাকিতে বাড়িতেই দুই বেলা কত লোক আসিত, গল্প করিত। এই দুরবস্থার উপরও বিপিন তাহাদিগকে চা খাওয়ায়, তামাক খাওয়ায়, বন্ধুবান্ধবদের পান খাওয়ানোর জন্য প্রতি হাটে তাহার এক গোছ পান লাগে। অত পান সাজিতে হয় বলিয়া মনোরমা কত বিরক্ত প্রকাশ করে; কিন্তু বিপিন মানুষ-জনের যাতায়াত বড় ভালবাসে, তাহাদের আদর-আপ্যায়ন করিতে ভালবাসে। দুরবস্থায় পড়িলেও তাহার নজর ছোট হয় নাই, জমিদারবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর মত।

ধোপাখালি গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই, যত মুচি গোয়ালা জেলে প্রভৃতি লইয়া কারবার। তাহাদের সঙ্গে যতক্ষণ কাজ থাকে, ততক্ষণই ভাল লাগে। কাজ ফুরাইয়া গেলে তাহাদের সঙ্গ বিপিনের আর এতটুকুও সহ্য হয় না। অথচ একা থাকাও তাহার অভ্যাস নাই। নির্জ্জন কাছারি-ঘরে সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া থাকিতে মন হাঁপাইয়া উঠে। এমন একটা লোক নাই, যাহার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করা যায়। আজকাল এই সময়ে মানীর কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। কাছারির চাকর ছোকরা ফিরিয়া আসে, কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে সামান্য একটু গল্প-গুজব হয়। তারপর সে রান্নার যোগাড় করিয়া দেয়, বিপিন রাঁধিতে বসে। কাছারির বাদাম গাছটার পাতায় বাতাস লাগিয়া কেমন

একটা শব্দ হয়, ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলে, জেলেপাড়ার গদাধর পাড়ুইয়ের বাড়িতে রোজ রাত্রে পাড়ার লোক জুটিয়া হরিনাম করে, তাহাদের খোল-করতালের আওয়াজ পাওয়া যায়, ততক্ষণে রান্নাবাড়া সারিয়া বিপিন খাইতে বসে।

৫

এক একদিন এই সময় হঠাৎ কামিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। হাতে একবাটি দুধ। রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া বলে, খেতে বসলে নাকি বাবা

—এস মাসী, এস। এই সবে বসলাম খেতে।

—এই একটু দুধ আনলাম। ওরে শম্ভু, বাবুকে বাটিটা এগিয়ে দে দিকি। আমি আর রান্নাঘরের ভেতর যাব না।

—না, কেন আসবে না মাসী? এস তুমি। বস এখানে, খেতে খেতে গল্প করি।

কামিনী কিন্তু দরজার চোকাঠ পার হইয়া আর বেশি দূর এগোয় না। সেখান হইতে গলা বাড়াইয়া বিপিনের ভাতের থালার দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলে, কি রাঁধলে আজ এবেলা?

—আলুভাতে, আর ওবেলার মাছ ছিল।

—ওই দিয়ে কি মানুষে খেতে পারে? না খেয়ে-দেয়ে তোমার শরীর ঐরকম রোগাকাঠি। একটু ভাল না খেলে-দেলে শরীর সারবে কেমন ক'রে? তোমার বাবার আমলে

দুধ-ঘিয়ের সোত ব'সে গিয়েছে কাছারিতে। এই বড় বড় মাছ! তরিতরকারির তো কথাই—

বিপিন জানে, কামিনী মাসী বাবার কথা একবার উঠাইবেই কথাবার্ত্তার মাঝখানে। সে কথা না উঠাইয়া বুড়ী যেন পারে না। সময়ের স্রোত বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের পর হইতেই বন্ধ হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কামিনী মাসীর পক্ষে তাহা আর এতটুকু অগ্রসর হয় নাই।

পৃথিবী নবীন ছিল, জীবনে আনন্দ ছিল, আকাশ-বাতাসের রং অন্য রকমই ছিল, দুধ ঘি অপর্য্যাপ্ত ছিল, কাছারির দাপট ছিল, ধোপাখালিতে সত্যযুগ ছিল—৺বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের আমলে।

সেসব দিন আর কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ভোজনের উপকরণের স্বল্পতার জন্য কামিনী মাসীর অনুযোগ এক প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাহা ছাড়া, কামিনী মাসী প্রায়ই দুধটুকু, ঘিটুকু, কোনদিন বা এক-ছড়া পাকা কলা খাইবার সময় লইয়া হাজির হইবেই।

খানিকটা আপন মনে পুরানো আমলের কাহিনীর বর্ণনা করিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া চলিয়া যায়। সে বর্ণনা প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিপিন শুনিয়া আসিতেছে আজ এক বছর। তবুও আবার শুনিতে হয়, তাহারই পরলোকগত পিতার সম্বন্ধে কথা, না শুনিয়া উপায় কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

দিন দশেক পরে বিপিন বাড়ি হইতে স্ত্রীর চিঠি পাইয়া জানিল, তাহার ভাই বলাই রাণাঘাট হাসপাতালে আর থাকিতে চাহিতেছে না। বউদিদিকে অনবরত চিঠি লিখিতেছে, দাদাকে ব'ল বউদিদি, আমায় এখান থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে। আমার অসুখ সেরে গিয়েছে, আর এখানে থাকতে ভাল লাগে না।

স্ত্রীর চিঠি পাইয়া বিপিন খুব খুশি হইল না। ইহাতে শুধু কয়েকটি মাত্র সাংসারিক কাজের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই। এমন কিছু বেশি দিন তাহাদের বিবাহ হয় নাই যে, দুই একটি ভালবাসার কথা চিঠিতে সে স্ত্রীর নিকট হইতে আশা করিতে পারে না।

আজ বলিয়াই বা কেন, মনোরমা কবেই বা চিঠিতে মধু ঢালিয়াছিল? অবশ্য এ কথা খানিকটা সত্য যে, এতদিন সে বাড়িতেই ছিল, মনোরমার কোনও প্রয়োজন ঘটে নাই তাহাকে চিঠি লিখিবার। তবুও তো সে এক বৎসর পলাশপুরে চাকুরি করিতেছে, তাহার এই প্রথম স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে বিদেশে প্রবাসযাপন, অন্য অন্য স্ত্রীরা কি তাহাদের স্বামীদের নিকট এ অবস্থায় এই রকম কাঠখোট্টা চিঠি লেখে?

বিপিন জানে না, এ অবস্থায় স্ত্রীরা স্বামীদের কি

রকম চিঠি লেখে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, বিরহিণী স্ত্রীরা বিরহবেদনায় অস্থির হইয়া প্রবাসী স্বামীদের নিকট কত রকমে তাহাদের মনের ব্যথা জানায়, বার বার মাথার দিব্য দিয়া বাড়ি আসিতে অনুরোধ করে। নাটক-নবেলে সে এইরূপ পড়িয়াছেও বটে। প্রথম কথা, মনোরমা তাহাকে চিঠিই কয়খানা লিখিয়াছে এক বছরের মধ্যে? পাঁচ ছয়খানার বেশি নয়। অবশ্য তাহার একটা কারণ বিপিন জানে, সংসারে পয়সার অনটন। একখানা খামের দাম চার পয়সা, সংসারের খরচ বাঁচাইয়া জোটানো মনোরমার পক্ষে সহজ নয়। সে যাক, কিন্তু সেই চার পাঁচখানা চিঠিতেও কি দুই একটা ভাল কথা লেখা চলিত না? মনোরমার চিঠি আসে, টাকা পাঠাও, চাল নাই, তেল নাই, অমুকের কাপড় নাই, তুমি কেমন আছ, আমরা ভাল আছি। কখনও এ কথা থাকে না, একবার বাড়ি এস, তোমাকে অনেকদিন দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা করে।

বিপিন চিঠি পাইয়া বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, স্ত্রীকে দেখিবার জন্য নয়, বলাইকে হাসপাতাল হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য। ছোট ভাইটিকে সে বড় ভালবাসে। রাণাঘাটের হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছে, বাড়ি যাইতে চায়, ভরসা করিয়া দাদাকে লিখিতে পারে নাই, পাছে দাদা বকে। তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইতেই হইবে। সে পলাশপুর রওনা হইল।

তিন দিনের ছুটি চাহিতেই জমিদারবাবু বলিলেন, এই তো সেদিন এলে হে বাড়ি থেকে, আবার এখুনি বাড়ি কেন ?

বিপিন জমিদারকে সমীহ করিয়া স্ত্রীর চিঠির কথা পূর্ব্বে বলে নাই, এখন বলিল। ভাইকে হাসপাতাল হইতে লইয়া যাইবার কথাও বলিল।

অনাদিবাবু অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, যাও, কিন্তু তুমি বাড়ি গেলে আর আসতে চাও না। জামাই চ'লে গিয়েছেন। মানী এখানে রয়েছে, সামনের শনিবারে আবার জামাই আসবেন। রোজ দু তিন টাকা খরচ। তুমি মহল থেকে চ'লে এলে আদায়-পত্তর হবে না, আমি প'ড়ে যাব বিষম বিপদে ; তিন দিনের বেশি আর এক দিনও যেন না হয়, ব'লে দিলাম।

মানীর সঙ্গে দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বিপিন দেখিল, তাহা একরূপ অসম্ভব। সে থাকে বাড়ির মধ্যে, তাহাকে ডাকিয়া দেখা করিতে গেলে হয়তো মানীর মা সেটা পছন্দ করিবেন না।

যাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কিন্তু বিপিন ইচ্ছাটা কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। একটিমাত্র ছুতা ছিল, বিপিন সেইটাই অবলম্বন করিল। সে যাইবার পূর্ব্বে একবার জমিদার-গৃহিণীর নিকট বিদায় লইতে গেল।

—ও মাসীমা, কোথায় গেলেন, ও মাসীমা ?

ঝি বলিল, মা ওপরে পূজোয় বসেছেন, দেরি হবে নামতে, এই বসলেন।

বিপিন একবার ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, তাই তো! বসবার তো সময় নেই। রাণাঘাটে হাসপাতালে যেতে হবে। একটা কথা ছিল, আচ্ছা, আর কেউ আছে? কথাটা না হয় ব'লে যেতাম।

—দিদিমণিকে ডেকে দোব? দিদিমণি রান্না-বাড়িতে রয়েছে, দেখব?

—তা মন্দ নয়। তাই না হয় দাও, কথাটা ব'লেই যাই।

ঝি বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে মানী বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে বিপিনদা! কখন এলে?

—এসেছি ঘণ্টা দুই হ'ল। কর্ত্তার কাছে কাজ ছিল, আমি তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি।

ঝি তখন রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া মানী বলিল, যা তো হিমি, ওপরে আমার ঘর থেকে কর্পূরের শিশিটা নিয়ে বামুন-ঠাকরুণকে রান্নাঘরে দিয়ে আয়।

ঝি চলিয়া গেল।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, দু'ঘণ্টা এসেছ বাইরে? কই, আমি তো শুনি নি! চা খেয়েছ?

—না।

—তুমি কখন যাবে? কেন, এখন হঠাৎ বাড়ি যাচ্ছ যে?

বিপিন এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, সে কৈফিয়ৎ

তোমার বাবার কাছে দিতে হয়েছে একদফা, তোমার কাছেও আবার দিতে হবে নাকি ?

—নিশ্চয় দিতে হবে। আমিও তো জমিদারের মেয়ে, দেবে না কেন ?

—তবে দিচ্ছি। আমার ভাই বলাইকে তোর মনে আছে ? সে একবার কেবল বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল, তখন সে ছেলেমানুষ। সে রাণাঘাট হাসপাতালে—

তারপর বিপিন সংক্ষেপে বলাইয়ের অসুখের ব্যাপারটা বলিয়া গেল।

মানী বলিল, চা খেয়ে যাও। ব'স, আমি ক'রে আনি।

বিপিন রাজি হইল না। বলিল, থাক মানী, আমায় অনেকটা পথ যেতে হবে এই অবেলায়! একটা কথা জিগ্যেস করি—যদি আমার আসতে দু এক দিন দেরি হয় কর্তাবাবুকে ব'লে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিতে পারবি ?

মানী বরাভয় দানের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া চাপা হাসিমুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সুরে বলিল, নির্ভয়ে চ'লে যাও, বিপিনদা। অভয় দিচ্ছি, তিন দিনের জায়গায় সাত দিন থেকে এস। বাবাকে শান্ত করবার ভার আমার ওপর রইল।

বিপিন হাসিয়া বলিল, বেশ, বাঁচলাম। দেবী যখন অভয় দিলে, তখন আর কাকে ডরাই ? চলি তবে।

—না, একটু দাঁড়াও। কিছু না খেয়ে যেতে পারবে না।

কোন্ সকালে ধোপাখালি থেকে খেয়ে বেরিয়েছ, একটু জল খেয়ে যেতেই হবে। আমি আসছি।

মানী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে একখানা আসন আনিয়া রোয়াকের একপাশে পাতিয়া দিয়া বলিল, এস, ব'স উঠে।—বলিয়াই সে আবার ক্ষিপ্রপদে অদৃশ্য হইল।

মানীর আগ্রহ দেখিয়া বিপিন মনে কেমন এক ধরণের অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। এ অনুভূতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, এমন কি সেদিন পোলাও খাওয়ানোর দিনেও হয় নাই। সেদিন সে সে ব্যাপারটাকে খানিকটা সাধারণ ভদ্রতা, খানিকটা মানীর রাঁধিবার বাহাদুরি দেখানোর আগ্রহের ফল বলিয়া ভাবিয়াছিল। কিন্তু আজ মনে হইল, মানীর এ টান আন্তরিক, মানী তাহার সুখদুঃখ বোঝে। বিপিনের সত্যই ক্ষুধা পাইয়াছে। ভাবিয়াছিল, রাণাঘাটের বাজারে কিছু খাইয়া লইয়া তবে মিশন হাসপাতালে যাইবে। আচ্ছা, মানী কি করিয়া তাহা বুঝিল?

একটা থালায় মানী খাবার আনিয়া বিপিনের সামনে রাখিয়া বলিল, খেয়ে নাও। আমি চায়ের জল বসিয়ে এসেছি, দৌড়ে চা ক'রে আনি।

থালার দিকে চাহিয়া বিপিনের মনে হইল, বাড়িতে এমন কিছু খাবার ছিল না, তেমন কৃপণই বটে জমিদার-গিন্নী! মানী বেচারী হাতের কাছে তাড়াতাড়ি যাহা পাইয়াছে—কিছু মুড়ি,

এক থাবা দুধের সর, খানিকটা গুড়, এরই মধ্যে আবার দুইখানা থিন্ এরারুট বিস্কুট—তাহাই আনিয়া ধরিয়া দিয়াছে।

মানী ইতিমধ্যে একমালা নারিকেল ও একখানা দা হাতে ব্যস্তভাবে আসিয়া হাজির হইল। কোথা হইতে নারিকেল মালাটি খুঁজিয়া টানিয়া বাহির করিয়াছে এইমাত্র।

—নারকোল খাবে বিপিনদা? দাঁড়াও, একটু নারকোল কেটে দিই। কুরুনিখানা খুঁজে পেলাম না। তোমার আবার দেরি হয়ে যাবে, কেটেই দিই, খাও। মুড়ি দিয়ে সর দিয়ে গুড় দিয়ে মাখ না। আস্তে আস্তে ব'সে খাও, আবার কখন খাবে, তার ঠিক নেইকো। চা আনি।

একটু পরে চা হাতে যখন মানী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বিপিন যেন নূতন চোখে মানীকে দেখিল।

মানী যেন তাহার কাছে এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও তৃপ্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। এই আগ্রহভরা আন্তরিকতা, এই যত্ন বিপিন কখনও মনোরমার নিকট হইতে পায় নাই। মনোরমা যে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, ভালবাসে না, তাহা নয়। সে অন্য ধরণের মেয়ে, গোটা সংসারটার দিকে তাহার দৃষ্টি—মা, বীণা, ছেলেমেয়ে, এমন কি বাড়ির কৃষাণের দিকে পর্য্যন্ত। একা বিপিনের সুখদুঃখ দেখিবার অবকাশ তাহার নাই, বিপিন নিজের সংসারে পাঁচজনের মধ্যে একজন হইয়া মনোরমার যৌথ সেবার কিছু অংশ পাইয়া আসিয়াছে এতদিন। তাহাতে এমন তৃপ্তি কোন দিন সে পায় নাই।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন উঠিল। বলিল, খুড়ীমার সাঙ্গে দেখা হ'ল না, বলিস আমার কথা মানী, চললুম।

—এস। কিন্তু বেশি দিন দেরি করলে চাকরির দায়ী আমি নয়, মনে থাকে যেন।

—খানিকটা আগে অভয় দিয়েছ দেবী, মনে আছে?

—তুমাস দেরি করলেও কি অভয় দেওয়া বাহাল রইল? বাঃ রে, আমি বলেছি তিন দিনের জায়গায় সাত দিন, না হয় ধর দশ দিন।

—না হয় ধর এক মাস।

—না হয় ধর তিন মাস? সে সব হবে না, সোজা কথা শোন বিপিনদা। আমার তো বাবার কাছে বলবার মুখ থাকা চাই।

পরে গম্ভীরমুখে বলিল, কথা দিয়ে যাও, কদিনে আসবে। না, সত্যি, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না, আমি কি বলেছিলুম প্রথম দিন, মনে আছে?

বিপিন কৃত্রিম ব্যঙ্গের সুরে বলিল, হ্যাঁ, বলেছিলে, চাকরিতে টিকে থাকলে তুমি আমার ভালর চেষ্টা করবে।

মানী হাসিয়া বলিল, মনে আছে তা হ'লে? বেশ, এখন এস তা হ'লে—বেলা গেল।

পথে উঠিয়াই মানীর কথা মনে করিয়া বিপিনের দুঃখ হইল। বেচারী ছেলেমানুষ, সংসারের কি জানে! জামিদারির যা অবস্থা, মানী কি উন্নতি করিয়া দিবে তাহার! দেনা ইতিমধ্যে প্রায়

পাঁচ ছয় হাজারে দাঁড়াইয়াছে রাণাঘাটের গোবিন্দ পালের গদিতে। সদর খাজনা দিবার সময় প্রতি বৎসর তাহার নিকট হ্যাণ্ড্‌নোট কাটিতে হয়। ইহা অবশ্য বিপিন এখানে চাকরিতে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বের ঘটনা, খাতাপত্র দেখিয়া বিপিন জানিতে পারিয়াছে। গোবিন্দ পাল নালিশ ঠুকিলেই জমিদারি নীলামে চড়িবে।

মানী মেয়েমানুষ, বিষয় সম্পত্তির কি বোঝে! ভাবিতেছে, সে মস্ত জমিদারের মেয়ে, চেষ্টা করিলেই বিপিনদাদার বিশেষ উন্নতি করিয়া দিতে পারিবে। বিপিনের হাসি পাইল, দুঃখও হইল। বেচারী মানী!

২

রাণাঘাট হাসপাতালে বিপিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিল। বলাই তাহাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু বিপিনের মনে হইল, ভাই যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে তাহা নয়, এ অবস্থায় তাহাকে লইয়া যাওয়া কি উচিত হইবে?

বিপিন কৈবর্ত্তের মেয়ে সেই নার্সটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, আমার ভাই বাড়ি যেতে চাইছে কান্না-কাটি করছে, ওকে এখন নিয়ে যেতে পারি?

নার্স বলিল, নিয়ে যাও বাবু, তোমার ভাই আমাকে পর্য্যন্ত জ্বালাতন ক'রে তুলেছে বাড়ি যাব বাড়ি যাব ক'রে।

নেফ্রাইটিসের রুগী, যা সেরেছে, ওর বেশি আর সারবে না। কেন এখানে মিথ্যে রেখে কষ্ট দেবে!

তাহার মনে হইল, নার্স যেন কি চাপিয়া যাইতেছে। সে বলিল, ও কি বাঁচবে না?

নার্স ইতস্তত করিয়া বলিল, না, তা কেন, তবে শক্ত রোগ। বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটু সাবধানে রাখতে হবে। নিয়েই যাও বাড়ি, এখন তো অনেকটা সেরেছে।

বিপিনের মনটা খারাপ হইয়া গেল। সে গিয়া মিশনের বড় ডাক্তার আর্চার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আর্চার সাহেব নিজের বাংলার বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন, দীর্ঘাকৃতি, সবল চেহারা। মাথার সামনে টাক পড়িয়া গিয়াছে। আজ ত্রিশ বৎসর এখানে আছেন, বড় ভাল লোক, এ অঞ্চলের সকলে আর্চার সাহেবকে ভালবাসে।

বিপিন গিয়া বলিল, নমস্কার, ডাক্তার সাহেব।

আর্চার সাহেব বিপিনকে চেনেন না, বলিলেন, এস, আপনি কি বলছেন?

আর্চার সাহেব বাংলা বলেন বটে, তবে একটু ভাবিয়া, একটু ধীরে ধীরে, যেখানে জোর দেওয়া উচিত সেখানে জোর না দিয়া এবং যেখানে জোর দেওয়া উচিত নয় সেখানে জোর দিয়া।

বিপিন বলিল, আমার ভাই বলাই চাটুজ্জে ছ নম্বর

ওয়ার্ডে আছে, নেফ্রাইটিসের অসুখ, তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি ? সে বড় ব্যস্ত হয়েছে বাড়ি যাবার জন্যে।

—হাঁ হাঁ, ওই ওয়ার্ডের ছোক্‌রা রুগী। নিয়ে যান।

—সাহেব, ও কি সেরেছে ?

—সে পূর্ব্বের অপেক্ষা সেরেছে। কঠিন রোগ, একেবারে ভালভাবে সারতে এক বছর লাগবে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যত্ন করবেন, মাংস খেতে দেবেন না।

—তা হ'লে কাল সকালে নিয়ে যাব।

—আপনি রাত্রে কোথায় থাকবেন ? আমার বাড়িতে থাকুন। আমার এখানে ডিনার খাবেন। মুকুন্দ, ও মুকুন্দ !

—আমার এখানে আত্মীয় আছেন সাহেব, তাঁদের বাড়ি ব'লে এসেছি, সেখানেই থাকব। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

বিপিন রাত্রে বাজারের নিকট তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ি থাকিয়া, পরদিন সকালে ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া ভাইকে লইয়া স্টেশনে গেল।

বলাইয়ের বয়স বেশি নয়—কুড়ি একুশ। রোগ হওয়ার পূর্ব্বে তার শরীর খুব ভাল ছিল, বিপিনের সংসারের ক্ষেত-খামারের অনেক কাজ সে একাই করিত।

মধ্যে যখন বিপিনের বদখেয়ালিতে পৈতৃক অর্থ সব উড়িয়া গেল, সংসারের ভয়ানক কষ্ট, সংসার একেবারে অচল, তখন বলাই আঠারো বছরের ছেলে। বলাই দেখিল,

দাদার মতিবুদ্ধি তাহাদের অনাহারের ও দারিদ্র্যের পথে লইয়া চলিয়াছে, যদি বাঁচিতে হয় তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হইবে এবং বুক দিয়া খাটিতে হইবে।

নদীর ধারের কাঁঠাল-বাগান বাঁধা দিয়া সেই টাকায় সে এক জোড়া বলদ কিনিয়া গরুর গাড়ি চালাইতে লাগিল নিজেই। লোকের জিনিসপত্র গাড়ি বোঝাই দিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার ভাড়া খাটিত, স্টেশনে সওয়ারী লইয়া যাইত। অনেকে নিন্দা করিতে লাগিল। একদিন বৃদ্ধ যদু মুস্তফি ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হে বলাই, তুমি নাকি গরুর গাড়ির গাড়োয়ানি কর?

বলাই একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—সেটা কি রকম হ'ল? বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে হয়ে অমন বংশের নাম ডোবাবে তুমি? কাল শুনলাম, বাজারের নিবারণ সাহার বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানে আট দশ গাড়ি বালি বয়েছ নদীর ঘাট থেকে সারাদিন। এতে মান থাকবে?

বলাই একটু ভীতু ধরণের ছেলে। বয়সে বড় ভারিক্কি মুস্তফি মহাশয়কে তাহার বাবা বিনোদ চাটুজ্জে পর্য্যন্ত সমীহ করিয়া চলিতেন। সেখানে সে আঠারো বছরের ছেলে কি তর্ক করিবে! তবুও সে বলিল, জ্যাঠামশাই, এ না করলে যে সংসার চলে না, মা বোন না খেয়ে মরে। দাদা তো ওই কাণ্ড করছে, দাদার ওপর আমি কিছু বলতে তো পারি না, মাঠের জমি, খাস জমি সব দাদা

বিক্রি করছে আর মৌরুসী দিচ্ছে, মার হাতে একটা পয়সা রাখে নি—সব নেশাভাঙে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কি খেয়ে বাঁচব, বলুন তো? এতে তবুও দিন এক টাকা গড়ে আয় হচ্ছে। বালির গাড়ি ছ আনা ক'রে ভাড়া নদীর ঘাট থেকে বাজার পর্য্যন্ত। কাল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এগারো গাড়ি বালি বয়েছি—ছেষট্টি আনা চার টাকা দু আনা একদিনের রোজগার। এ অন্যভাবে আমায় কে দিচ্ছে বলুন?

সে দুর্দ্দিনে বলাই মান-অপমান বিসর্জ্জন দিয়া বুক দিয়া না পড়িলে সংসার অচল হইত। বলাই গরুর গাড়ির গাড়োয়ানি করিয়া লাঙল করিল, জমি চাষ করিয়া ধান বুনিল, আটির মাঠে কুমড়া করিল এবং সেই কুমড়া কলিকাতায় চালান দিয়া সেবার প্রায় ত্রিশ বত্রিশ টাকা লাভ করিল।

বিপিনকে বলিল, দাদা, বাগদী-পাড়ায় নন্দ বাগদীর গোলাটা কিনে আনছি, এবার ধান রাখবার জায়গা চাই, ধান হবে ভাল।

বিপিন বলিল, নন্দ বাগদীর অত বড় গোলা এনে কি করবি, আমাদের তিন বিঘে জমির ধান এমন কি হবে যে, তার অত জন্যে বড় গোলার দরকার। দামও তো বেশি চাইবে।

বলাই বলিয়াছিল, বারণ ক'র না দাদা। বড় গোলাটা

বাড়ি থাকলে লক্ষ্মীশ্রী। আমার ওই গোলা দেখলে কাজে উৎসাহ হবে যে, ওটা পুরিয়ে দিতেই হবে আসছে বছর। ওটাই আনি, কি বল দাদা?

সংসারের জন্য অনিয়মিত খাটিয়া খাটিয়া বলাই পড়িয়া গেল শক্ত অসুখে। কিছুদিন দেশেই রাখিয়া চিকিৎসা চলিল। সে চিকিৎসাও এমন বিশেষ কিছু নয়, গ্রাম্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শরৎ দাঁ দিন পনরো সাদা শিশিতে কি ঔষধ দিতেন, তাহাতে কিছু না হওয়ায় গ্রামের অনেকের পরামর্শে বলাইকে রাণাঘাটের হাসপাতালে আনা হয়।

বলাই এখনও ছেলেমানুষ, তাহার উপর অনেকদিন রোগশয্যায় শুইয়া থাকিবার পরে আজ দাদার সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া যাইবার আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রেলগাড়িতে উঠিয়া একবার এ জানালায় একবার ও জানালায় ছুটাছুটি করিতেছে, কত কাল পরে আবার সে নীরোগ হইয়া মুক্ত স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পাইয়াছে। নার্সের কথামত আর ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে না। হাসপাতালের রান্না কি বিশ্রী! মাছের ঝোল না ছাই! মায়ের হাতের, বউদিদির হাতের রান্না আজ প্রায় চার মাস খায় নাই, বউদিদির হাতের সুক্তুনির তুলনা আছে?

পাঁচিলের পশ্চিম কোণে বড় মানকচুটা সে নিজের হাতে পুঁতিয়াছিল। এখন না জানি কত বড় হইয়াছে। ভগবান যদি দিন দেন এবং তাহাকে খাটিতে দেন, তবে

গাঙের ধারে কদমতলার বাঁকে ভাল জমি খাজনা করিয়া লইবে এবং তাহাতে শসা বরবটি এবং পালংশাক করিবে।

হাসপাতালে থাকিতে নার্সের মুখে শুনিয়াছে পালংশাক ও বরবটি নাকি খুব ভাল তরকারি। কলিকাতায় দামে বিক্রয় হয়।

বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, কাপালীপাড়ায় রাই-চরণের পিসীর কাছে বলা ছিল, ওদের ঝাল হ'লে আমাদের সূর্য্যমুখী ঝালের বীজ দিয়ে যাবে। তুমি দেখ নি সে ঝাল, রাঙা টুকটুক করছে, এক একটা এত বড়—বীজ দিয়ে গিয়েছিল, জান? আমি এবার চাট্টি ঝাল পুঁতে দেব আমড়াতলায় নাবাল জমিটাতে।

দাদার চাকুরি হওয়াতে বলাই খুব খুশি।

তখন সে একা খাটিয়া সংসার চালাইত। আজকাল দাদার মতিবুদ্ধি ফিরিয়াছে, দাদা আবার পুরানো জমিদার-ঘরে বাবার সেই পুরানো চাকুরি করিতেছে, ইহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে!

দুই ভাইয়ে মিলিয়া খাটিলে সংসারের উন্নতি হইতে কত দেরি লাগিবে? সে নিজে বিবাহ করে নাই, করিবেও না। মা, বউদিদি, ভানু, বীণা—এরা সুখী হইলেই তাহার সুখ। গোলা দেখিলে মায়ের চোখ দিয়া জল পড়ে। মা বলে, কর্ত্তার আমলে এর চেয়েও বড় গোলা ছিল বাড়িতে, আজকাল দুটো লক্ষ্মীর চিঁড়ে কোটার ধান পাই না!

মায়ের চোখের জল সে ঘুচাইবে। বাবার গোলা ছিল পনরো হাতের বেড়, সে গোলা বাঁধিবে আঠারো হাতের বেড়।

৩

বেলা এগারোটার সময় বিপিন ও বলাই বাড়ি পৌঁছিল।

ইহাদের আজই বাড়ি আসিবার কোন সংবাদ দেওয়া ছিল না। বিশেষত বলাইকে আসিতে দেখিয়া বিপিনের মা ছুটিয়া গিয়া রুগ্ন ছেলেকে জড়াইয়া ধরিলেন। বীণা, মনোরমা, ভানু, টুনি—সকলেই বাহির হইয়া আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল।

উঃ, সেই রাণাঘাটের হাসপাতাল, আর এই বাড়ির তাহার প্রিয়জন সব—বউদিদি, মা, দিদি, খোকা, খুকী! বলাই আনন্দে কাঁদিয়াই ফেলিল ছেলেমানুষের মত।

ভানু টুনিও খুশিতে আটখানা। কাকাকে তাহারা ভালবাসে। এতদিন পরে কাকাকে ফিরিতে দেখিয়া তাহাদেরও আনন্দের সীমা নাই। কাকার গলা জড়াইয়া পিঠের উপরে পড়িয়া তাহারা তাহাদের পুরাতন কাকাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন পুঁটুলি নামাইয়া রাখিতেছে, মনোরমা আসিয়া হাসিমুখে বলিল, তা হ'লে আমার চিঠি পেয়েছিলে? কই, উত্তর তো দিলে না?

বিপিন বলিল, উত্তর আর কি দোব? এলাম তো চ'লে বলাইকে নিয়ে।

—ভালই করেছ। ঠাকুরপো তোমায় লিখতে সাহস করত না, কেবল আমায় চিঠি লিখত—আমায় বাড়ি নিয়ে যাও, আমায় বাড়ি নিয়ে যাও। আহা, ও কি সেখানে থাকতে পারে! ছেলেমানুষ, তাতে ওর প্রাণ প'ড়ে থাকে সংসারের ওপর। হ্যাঁ গা, ওর অসুখ কেমন? ডাক্তারে কি বললে?

—বললে তো, এখন ভালই। তবে সাবধানে রাখতে হবে। ওকে বেশি খেতে দেবে না। মাকে ব'লে দিও, যেন যা তা ওকে না খেতে দেয়। মাংস খেতে একেবারে বারণ কিন্তু।

—তবেই হয়েছে। যা মাংস খেতে ভালবাসে ঠাকুরপো, ওকে ঠেকিয়ে রাখা ভীষণ কঠিন। আর কি জান, বাড়ি এসেছে, এখন ওর আবদারের জ্বালায় ওকে মাংস না দিয়ে পারা যাবে? তুমি যে কদিন বাড়ি আছ, তারপর ও কি কারও কথা মানবে? নিজেই পাড়া থেকে খাসি কাটিয়ে ভাগাভাগি ক'রে বিলি ক'রে দিয়ে নিজের ভাগে দেড় সের মাংস নিয়ে এসে ফেলবে।

—না না, তা হ'তে দিও না, দিলেই অসুখ বাড়বে। ভয় দেখাবে যে, তোমার দাদাকে চিঠি লিখব, ওসব ছেলেমানুষি চলবে না।—বউদিদিকে দেখছি না?

—দিদি তো এখানে নেই। তাকে উলোর পিসীমা নিয়ে

গেছেন আজ দিন পনরো হ'ল। তিনি এসেছিলেন গঙ্গাস্নান করতে কালীগঞ্জে, আমাদের এখানেও এলেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন যাবার সময়ে।

বিপিন এ সংবাদে খুব খুশি হইল না। বলিল, নিয়ে গেলেন মানে তো তাঁর সংসারে দাসীবৃত্তি করার জন্যে নিয়ে যাওয়া। ওসব আমি পছন্দ করি না।

মনোরমা বলিল, পছন্দ তো কর না, কিন্তু এখানে খায় কি তা তো দেখতে হবে। তুমি চ'লে গেলে পলাশপুরে, আমাদের হাতে তো একটি পয়সা দিয়ে গেলে না। একদিন এমন হ'ল—তুটিখানি পান্তাভাত ছিল, ভানু-টুনিকে দিয়ে আমরা সবাই উপোস ক'রে রইলাম। কাউকে কিছু বলতেও পারি না, জাত যায়। পাড়ায় রোজ রোজ কে ধার চাইতে গেলে দেয় বল দিকি? আমি তো বললুম, উপোস ক'রে মরি সেও ভাল, কারও বাড়ি, কি রায়গিন্নীর কাছে, কি তুলুর মার কাছে, কি লালু চক্কত্তির মার কাছে চাইতে যেতে আমি পারব না।

কথাগুলি ন্যায্য এবং মনোরমা যে মিথ্যা বলিতেছে না, বিপিন তাহা বুঝিল। বুঝিলেও কিন্তু এসব কথা বিপিনের আদৌ ভাল লাগিল না।

যেমনই বাড়িতে পা দিয়াছে, অমনই সতরো গণ্ডা অভাব-অভিযোগের কাহিনী সাজাইয়া মনোরমা বসিয়া আছে। এও তো এক ধরণের তিরস্কার। সে কেন খালি হাতে সকলকে রাখিয়া গিয়াছিল, কেন একশো টাকার থলি মনোরমার হাতে

দিয়া বাড়ির বাহির হয় নাই ? স্ত্রীর মুখে তিক্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতেই তাহার জীবন গেল। স্ত্রী কি একটুও বুঝিবে না ? স্বামীর অক্ষমতার প্রতি কি সে এতটুকু অনুকম্পা দেখাইতে পারে না ?

৪

বৈকালে বিপিন গ্রামের উত্তরে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। মাঠের ওপারেই একটি ছোট মুসলমান গ্রাম, নাম বেল্‌তা। সন্ধ্যার এখনও অনেক দেরি আছে দেখিয়া সে ভাবিল, না হয় এক কাজ করি, আইনদ্দি চাচার বাড়ি ঘুরে যাই। অত বড় গুণী লোকটা, বলাইয়ের অসুখ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ক'রে দেখি, যদি কিছু করতে পারি। অনেক মন্তর-তন্তর জানে কিনা।

আইনদ্দি বাড়ির সামনে বাঁশতলায় বসিয়া মাছ-ধরা ঘুণির বাখারি চাঁচিতেছিল। চোখে সে ভাল দেখে না, বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, আসুন বাবাঠাকুর, আসুন, কবে এলেন বাড়ি ? এইখানা নিয়ে বসুন।—বলিয়া একখানা খেজুরপাতার চেটাই আগাইয়া দিল।

বিপিন বলিল, চাচা, তোমাকে তো কক্ষণও বিনি কাজে থাকতে দেখি না ? চোখে ঠাওর হয় ?

—না বাবাঠাকুর, ভাল আর কনে! হ্যাদে, একখানা

চশমা এনে দিতি পার? চশমা ন'লি আর চকি ভাল ঠাওর পাই নে ঝে!

—বয়েস তোমার তো কম হ'ল না চাচা, চোখের আর দোষ কি বল!

—তা একশো হয়েছে। যেবার মাংলার রেলের পুল হয়, তখন আমি গরু চরাতি পারি। আপনি এখন হিসেব ক'রে দেখ।

এ দেশে সবাই বলে আইনদ্দির বয়স একশো। আইনদ্দি নিজেও তাহাই বলে। আবার কেহ কেহ অবিশ্বাস করে। বলে, মেরে কেটে নব্বই বিরেনব্বুই। একশো! বললেই হ'ল বুঝি।

মাংলার পুল কত সালে হয় বিপিন তাহা জানে না, সুতরাং আইনদ্দির বয়সের হিসাব তাহার দ্বারা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সে অন্য কথা পাড়িল। বলিল, চাচা, তুমি অনেক রকম মন্তর-তন্তর জান, এ কথাটা তো শুনে আসছি বহুদিন।

বিপিন এই একই কথা অন্তত বিশবার আইনদ্দিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে গত দশ বৎসরের মধ্যে। আইনদ্দিও প্রত্যেক বারেই একই উত্তর দেয়, একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া। আজও সে সেই ভাবেই বেশ একটু গর্ব্বের সহিত বলিল, মন্তর? তা বেশি কথা কি বলব, আপনাদের বাপমার আশীর্ব্বাদে মন্তর সব রকম জানা ছেল। সেসব কথা ব'লে কি হবে, এদিগরের কোন্ লোকটা জানে না আমার

নাম ? তবে এই শোন। শন্যভরে যাব, আগুন খাব, কাটামুণ্ডু জোড়া দেব—

বিপিন এ কথা আইনদ্দির মুখে অনেকবার শুনিয়াছে, তবুও বৃদ্ধকে ঘাঁটাইয়া এ সব কথা শুনিতে তাহার ভাল লাগে। বিপিনের হাসি পায় এ কথা শুনিলে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আইনদ্দির উপর শ্রদ্ধা তাহাতে কিন্তু কমে না। বিপিন যুবক, এই শতবর্ষজীবী বৃদ্ধের প্রত্যেক কথা হাবভাব তাহার কাছে এত অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকে! এইজন্যই সে বাড়ি থাকিলে মাঝে মাঝে ইহার নিকট আসিয়া খানিকক্ষণ কাটাইয়া যায়। এ যে জগতের কথা বলে, বিপিনের পক্ষে তাহা অতীত কালের জগৎ। বিপিনের সঙ্গে সে জগতের পরিচয় নাই। নাই বলিয়াই তাহা রহস্যময়।

আইনদ্দি তামাক সাজিয়া হাতখানেক লম্বা এক খণ্ড শোলার নীচের দিকে বাঁশের সরু শলার সাহায্যে একটা ফুটা করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, তামাক সেবা কর বাবাঠাকুর।

বিপিন বলিল, চাচা, তুমি কানসোনার কুঠী দেখেছ?

—খুব। তখন তো আমার অনুরাগ বয়েস। কুঠীর মাঠে নীলের চাষ দেখিছি। এই শোনবা ? আমার সম্বন্ধির ছেলে জহিরদ্দি তখন জন্মায়, তিনি বড় চাকরি করত, এখন কুড়ি টাকা ক'রে পেন্সিল খাচ্ছে। তা ভাব তবে সে কত দিনির কথা।

বিপিন বলিল, কি চাকরি করত ?

—কি চাকরি আমি জানি বাবাঠাকুর ? পেন্সিল খাচ্ছে যখন, তখন বড় চাকরিই হবে।

—চাচা, একটা কবিতা বল তো শুনি ? মনে আছে ?

আইনদ্দি একগাল হাসিয়া বলিল, আ আমার কপাল ! কবিতা শোনবা ? রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ ছিল। এখন আর কি মনে থাকে সব কথা বাবাঠাকুর ? এই শোন—

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

বিপিন বাংলা সাহিত্যের তেমন খবর না রাখিলেও এটুকু বুঝিল যে, ইহা বিদ্যাসুন্দরের কবিতা। বলিল, এ কবিতা তোমার মুখে কখনও শুনিনি তো চাচা ? রামায়ণ-মহাভারতের কবিতাই তো বল। এ কোথায় শিখলে ?

—আমার যখন অনুরাগ বয়েস, তখন বিদ্যেসুন্দরের ভারী দিন ছেল যে ! বিদ্যেসুন্দরের যাত্রা হ'ত, গোপাল উড়ের নাম শুনিছিলে ? সেই গাইত বিদ্যেসুন্দর। আমরা সমবয়সী

কজন পরামর্শ ক'রে বিদ্যেসুন্দরের বই আনালাম। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কবিওয়ালার বই। বড় ভাল লেগে গেল। তারপর আনালাম অন্নদামঙ্গল। বিদ্যেসুন্দর বই ভাল, তবে বড্ড হে-পানা—

—কি পান চাচা?

—বড্ড হে-পানা; আপনাদের কাছে আর বলব? ছেলে-ছোকরা মানুষ তোমরা, আপনাদের কাল হতি দেখলাম, সে আর আপনি শুনে কি করবা? ওই বিদ্যে ব'লে এক রাজকন্যে, তার সঙ্গে সুন্দর ব'লে এক রাজপুত্তুরের আসনাই হয়—এই সব কথা। প'ড়ে দেখো। বিদ্যের রূপ শোনবা কেমন ছেল?

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥
কিছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে॥

কবিবর ভারতচন্দ্র স্বর্গ হইতে যদি দেখিতে পাইতেন, তবে এই বিংশ শতাব্দীতে কত নবীন প্রতিভার প্রভাবের মধ্যেও তাঁহার এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্তের মুখে তাঁহার নিজের

কবিতার উৎসাহপূর্ণ আবৃত্তি শুনিয়া নিশ্চয়ই খুব খুশি হইতেন।

বিপিনের এ কথা অবশ্য মনে হইল না, কারণ সে সাহিত্য-রসিক নয়, বা কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোনও বাংলা কবির সহিতই তাহার পরিচয় নাই। কিন্তু বিদ্যার রূপের বর্ণনা শুনিয়া তাহার কেন যে মানীর কথা মনে হইল হঠাৎ, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বিদ্যা তো নয়—মানী। কবি যেন তাহাকে চক্ষের সামনে রাখিয়াই এ বর্ণনা লিখিয়াছেন। মানী কাছে আসিলে তাহাকে খুব সুন্দরী বলিয়া বিপিনের মনে হয় নাই, কিন্তু দূরে গেলেই মানীকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া মনে হয়। তাহার চোখ যতটা ডাগর, তাহার চেয়েও ডাগর বলিয়া মনে হয়, রঙ যতটা ফর্সা, তাহার চেয়েও অনেক ফর্সা বলিয়া মনে হয়, মুখশ্রী যতটা সুন্দর, তাহার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

আইনদ্দির বাড়ির পশ্চিমে বেল্‌তার মাঠ, অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা, মাঠের ওপারে হরিদাসপুর গ্রামের বাঁশবন। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও এখনও বেলা আছে, মাঠের মধ্যে ফুলে ভরা বাবলা গাছের ডালে ডালে শালিক ও ছাতারে পাখীর দল কলরব করিতেছে। নিকটে চাঁদমারির বিল থাকাতে বৈকালের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা।

বিপিনের মন কেমন উদাস হইয়া গেল।

জীবনে তাহার সুখ নাই, একমাত্র সুখের মুখ সে সম্প্রতি

দেখিতে পাইয়াছে, অকস্মাৎ এক ঝলক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত মানীর গত কয়দিনের কার্য্যকলাপ তাহার অন্ধকার জীবনে আলো আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মানী তাহার কে ?

কেহই নয়. অথচ সেই যেন সব বলিয়া আজ মনে হইতেছে।

অথচ মানী অপরের স্ত্রী—বিপিনের কি অধিকার আছে সেখানে ? ইচ্ছা করিলেই কি তাহার সঙ্গে যখন তখন দেখা করিবার উপায় আছে ?

মানী কেন দুই দিনের যত্ন দেখাইয়া তাহাকে এমন ভাবে বাঁধিল !

আইনদ্দি বলিল, একখানা কুমড়ো খাবে তো চল আমার সঙ্গে। বিলির ধারে জলি ধানের ক্ষ্যাতে আমার নাতি ব'সে পাখী তাড়াচ্চে, সেখানথে দেব এখন। ডাঙার ওপারই কুমড়োর ভুঁই।

চাঁদমারির বিলের ধারে ধারে দীর্ঘ জলজ পাতিঘাসের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ। পড়ন্ত বেলার আধশুকনো ঘাসের রোদপোড়া গন্ধের সঙ্গে বিলের জলের পদ্মফুলের গন্ধ মিশিয়াছে। বিলের এপারে সবটাই জলি ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাঁশের মাচায় বসিয়া লোকে টিনের কানেস্তারা বাজাইয়া বাবুইপাখী তাড়াইতেছে।

আইনদ্দির নাতির নাম মাখন। এ দেশে মুসলমানদের এ

রকম নাম অনেক আছে—এমন কি ভূবন, নিবারণ যজ্ঞেশ্বর পর্য্যন্ত আছে।

মাখনের বয়স চল্লিশের কম নয়, চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার বাবার বয়স প্রায় বাহাত্তর ছিয়াত্তর। মাখন বেশ জোয়ান লোক, শুধু জোয়ান নয়, এ অঞ্চলের মধ্যে একজন ভাল গায়ক বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে।

ঠাকুরদাদাকে আসিতে দেখিয়া মাখন বলিল, মোর জলপান কনে, হ্যাঁ দাদা?

পিছনে বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মাচা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, দাদাবাবু যে! কখন আলেন? আপনি সেই কোথায় নায়েবী করচ শুনেলাম, তাই ইদিকি বড় একটা যাওয়া আসা কর না বুঝি?

আইনদ্দি বলিল, বাবাঠাকুরকে একটা বড় দেখে কুমড়ো এনে দে দিকি। ওই পূবির বেড়ার গায়ে যে কটা বড় কুমড়ো আছে, তা থেকে একটা আন।

—হ্যাদে, দূর দূর, ওই দেখ বাবাঠাকুর, এক ঝাঁক বাবুই এসে জুটল আবার! স্মুন্দির পাখীগুনো তো বড্ড জ্বালালে দেখচি!—বলিয়া আইনদ্দি নিজেই টিনের কানেস্তারা বাজাইতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া রাঙা রোদ কতক জলি ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কতক বিলের বাবলা-বনে পড়িয়াছে, আইনদ্দির নাতি বিলের উপরের ডাঙায় কুমড়ো-ক্ষেত হইতে সুকণ্ঠে গাহিতেছে—

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে ধান কাটি
ও মোর মনে জাগে তার নয়ান দুটি—

বাবুইপাখীর ঝাঁক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে, বৃদ্ধ আইনদ্দি তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না ; সুতরাং তাহারা নির্ব্বিবাদে আবার আসিয়া জুটিতে লাগিল।

আইনদ্দির নাতির গানের কয়টি চরণ শুনিয়াই বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, বিল ও বিলের ধারে ধারে সবুজ জলি ধানের ক্ষেত, উপরে এবং নীচে নাচের ধরণে উড্ডীয়মান বাবুইপাখীর ঝাঁক, বিলের ধারের জলে শোলাগাছের হলদে ফুলের রাশি, হরিদাসপুরের বাঁশবনের মাথায় হেলিয়া-পড়া অস্তমান সূর্য্য, সব মিলিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব্ব ব্যথাভরা অনুভূতির সৃষ্টি করিল।

যেন মনে হইল, মানীকে এ জগতে বুঝিবার ভালবাসিবার লোক নাই। মানী যাহার হাতে পড়িয়াছে, সে মানীর মূল্য বোঝে নাই। মানীর জীবনকে ব্যর্থতার পথ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহার মুখে সত্যকার আনন্দের হাসি ফুটাইতে পারে, তবে সে বিপিন নিজেই। বিস্তীর্ণ সংসারে মানী হয়তো বড় একা, যেমন সে নিজেও আজ একা।

বিপিন কখনও প্রেমে পড়ে নাই জীবনে। প্রেমে পড়িবার অভিজ্ঞতা তাহার কখনও হয় নাই, মানীর সঙ্গে এই কয়দিনের ঘটনাবলীর পূর্ব্বে। এখন সে বুঝিয়াছে, আজ মানী তাহার মনের যতটা কাছে, অতটা কাছে কেহ কখনও আসে নাই!

বিপিন লেখা-পড়া মোটামুটি জানিলেও এমন কিছু বেশী নভেল নাটক বা কবিতা পড়ে নাই, প্রেমের কি লক্ষণ কবি ঔপন্যাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানে না; কিন্তু সে মাত্র এইটুকু অনুভব করিল, মানী ছাড়া জগতে আর কেহ আজ যদি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তাহার মনের এ শূন্যতা পূর্ণ হইবার নয়।

ইহাকেই কি বলে ভালবাসা?

হয়তো হইবে।

যে কোন কথাই সেই একটি মাত্র মানুষের কথা মনে আনিয়া দেয়—বিপিনের জীবনে ইহা একেবারে নূতন।

সে যে ভাইয়ের অসুখের সম্বন্ধে আইনদ্দির সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়াছিল, এ কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়া কুমড়াটি হাতে লইয়া বিপিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

বিপিনের একজন বন্ধু আছে এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে ভাসানপোতা গ্রামে। বন্ধুটির নাম জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে। বয়সে জয়কৃষ্ণ বিপিনের চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়। কিন্তু ভাসানপোতার মাইনর স্কুলে উহারা দুইজনে এক ক্লাসে পড়িয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বর্ত্তমানে উক্ত গ্রামের সেই স্কুলেই

হেড-মাস্টারের কাজ করে। বি. এ. পর্য্যন্ত পড়াশোনা করিয়াছিল।

এমন একজন লোক এখন বিপিনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলা যায়। না বলিলে আর চলে না।—বিপিন মনের মধ্যে এসব আর চাপিয়া রাখিতে পারে না।

তাই পরদিন সে ভাসানপোতায় বন্ধুর বাড়ি গিয়া হাজির হইল। জয়কৃষ্ণ এ গ্রামের বাসিন্দা নয়, তবে বর্ত্তমানে কর্ম্ম উপলক্ষে এই গ্রামের সতীশ কর্ম্মকারের পোড়ো বাড়িতে বাহিরের দুইটি ঘর লইয়া বাস করিতেছে।

স্কুলের ছুটির পর জয়কৃষ্ণ নিজের ঘরে ফিরিয়া উনুন জ্বালাইয়া চা তৈয়ারির জোগাড় করিতেছে, বিপিনকে হঠাৎ এ এ সময়ে দেখিয়া বলিল, আরে বিপ্‌নে যে! আয় আয়, ব'স। কবে এলি রে বাড়িতে?

বিপিন দেখিল, জয়কৃষ্ণ একা নাই—ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ আটত্রিশ, এ গ্রামের স্কুলে আজ প্রায় আট দশ বছর মাস্টারি করিতেছে, থাকে জয়কৃষ্ণের বাসায় অন্য ঘরটিতে, কারণ জয়কৃষ্ণ স্ত্রীপুত্র লইয়া এখানে বাস করে না; বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীই উপরওয়ালা হেড-মাষ্টারের এক রকম পাচক ও ভৃত্য উভয়ের কাজই করে। বিনিময়ে জয়কৃষ্ণ তাহাকে খাইতে দেয়।

এসব কথা বিপিন জানিত, কারণ সে আরও বহুবার ভাসানপোতায় আসিয়াছে জয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে। বলা বাহুল্য, বিপিন ও জয়কৃষ্ণ যখন এই স্কুলের ছাত্র, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী তখন স্কুলের মাস্টার ছিল না, উহারা পাস করিয়া বাহির হইয়া যাইবার অনেক পরে সে আসিয়া চাকুরিতে ঢোকে।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন জয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া মানীর কথা তাহাকে বলিতে লাগিল। বেশ সবিস্তারেই বলিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একটু দূরে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া ইহাদের কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া বিপিন গলার সুর আরও একটু নীচু করিল।

বিশ্বেশ্বর দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা কি শুনতে পাব না কথাটা, ও বিপিনবাবু?

—এ আমাদের একটা প্রাইভেট কথা হচ্ছে।

—প্রাইভেট আর কি। কোন মেয়েমানুষের কথা তো? বলুন না, একটু শুনি। বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি বলিল দেখিয়া বিপিন একটু মজা করিবার জন্য কহিল, আসুন না এদিকে, বলছি।

তারপর সে এক কাল্পনিক মেয়ের সঙ্গে তাহার কাল্পনিক প্রেম-কাহিনী সবিস্তারে সুরু করিল। একবার ট্রেনে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। মেয়েটির নাম

বজলী। তাহার বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে কলিকাতায় মামার বাসায় যাইতেছিল। বিজলী কলিকাতায় মামার বাসার ঠিকানা দিয়া তাহাকে যাইতে বলে। বিপিন অনেকবার সেখানে গিয়াছিল, বিজলী কি আদরযত্ন করিত! বার বার আসিতে বলিত। একদিন বিপিন তাহার বাপ-মাকে বলিয়া বিজলীকে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া যায়। সেখানে বিজলী মুখ ফুটিয়া বলে, বিপিনকে সে ভালবাসে।

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে বলিল, এ কতদিনের কথা?

—তা ধরুন না কেন, বছর ছ সাত আগের ব্যাপার হবে।

—এখন সে মেয়েটি কোথায়?

—এখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি থাকে।

—আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—আলাপ আবার নেই! দেখা হয় মাসে মাসে তার সেই মামার বাসায়, তখন ভারী যত্ন করে।

—কি রকম যত্ন করে?

এই, গল্পগুজব করে, উঠতে দেয় না, বলে, বসুন বসুন। খুব খাওয়ায়। এর নাম যত্ন আর কি। আমায় কত চিঠি লিখেছে লুকিয়ে।

—বলেন কি! চিঠিপত্র লিখেছে!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। মেয়েমানুষ লুকাইয়া যে চিঠি লেখে—সে চিঠি যে পায়, তাহার কি সৌভাগ্য না

জানি! বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, সেসব চিঠিতে কি লেখা আছে জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু নিতান্ত ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলিয়া, বিশেষত যখন বিপিনের সঙ্গে তাহার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নাই, সে কথা বলিতে পারিল না। শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিশ্বেশ্বরবাবু, আপনার জীবনে এ রকম কখন কিছু নিশ্চয় হয়েছে, বলুন না শুনি।

বিশ্বেশ্বর নিতান্ত হতাশ ও দুঃখিত ভাবে খানিকটা আনমনেই বলিল, আমাদের এ রকম কখনও কেউ চিঠি লেখে নি, চিঠি লেখা তো দূরের কথা, কখনও কোন মেয়ে কিছু বলেও নি, সাহস ক'রে কাউকে কখনও কিছু বলতেও পারি নি মাস্টারবাবু, সত্যি বলছি, এই এত বয়েস হ'ল।

—বিয়েও তো করলেন না।

—বিয়ে কি ক'রে করব মাস্টারবাবু, দেখতেই পাচ্ছেন সব। পঁচিশ টাকা মাইনে লিখি স্কুলের খাতায়, পাই পনরো টাকা। ন মাতা ন পিতা, মামার বাড়ি মানুষ হয়েছি দুঃখে কষ্টে। তেমন লেখাপড়াও শিখি নি। মামাদের দোরে তাদের চাকরগিরি ক'রে হাট বাজার ক'রে অতিকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পাস করি।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিয়ে করলে আপনার লোক পেতেন বিশ্বেশ্বরবাবু। এর পরে দেখবেন, একজন মানুষ অভাবে কি কষ্ট হয়!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বলিল, এর পর কেন, এখনই হয়। সত্যি বলছি মাস্টারবাবু, একটা ভাল কথা কখনও কেউ বলে নি, বড় দুঃখে এ কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না, কারও মুখে একটা ভালবাসার কথা, এই উনি যেমন বলছেন, এ তো কখনও শুনিই নি, কাকে বলে জানিও না। তাই এক এক সময় ভাবি, জীবনটা বৃথায় গেল মাস্টারবাবু, কিছুই পেলাম না।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী এমন হতাশ সুরে এ কথা বলিল যে, সে যে অকপটে সত্য কথা বলিতেছে, এ বিষয়ে বিপিনের কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। সে যে কিছুদিন আগেও ভাবিত, তাহার তুল্য অসুখী মানুষ দুনিয়ায় কেহ নাই, ইহার বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপিনের সে ধারণা দূর হইল।

এই ভাগ্যহত দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের উপর তাহার যেন একটা অহেতুক ভালবাসা জন্মিল।

হঠাৎ মনে হইল, জয়কৃষ্ণ তাহার এতদিনের বন্ধু বটে, কিন্তু জয়কৃষ্ণের চেয়েও এই অর্দ্ধ-পরিচিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী যেন তাঁহার অনেক আপন। ইহা দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রের সমবেদনা নয়, দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণা।

কারণ বিপিন এখন ধনী। আজই এইমাত্র বিপিন ভাল করিয়া বুঝিয়াছে যে, সে কত বড় ধনী।

২

বাড়িতে আসিয়া প্রথম দিন পাঁচ ছয় বলাই বেশ ভাল ছিল। বিপিন চাকুরিস্থলে চলিয়া গেলে সে একদিন গ্রামের নবীন রায় মহাশয়ের বাড়িতে বসিয়া আছে! নবীন রায়ের ছেলে বিষ্ণু বলিল, বলাইদা, মাংসের ভাগ নেবে? আমরা উত্তরপাড়া থেকে ভাল খাসি আনিয়েছি, এবেলা কাটা হবে। সাত আনা ক'রে সের পড়তা হচ্ছে।

বলাই অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলেই অসুখ বাধাইয়াছিল। মাংস খাওয়া তাহার বারণ আছে, এবং দাদা বাড়ি থাকার জন্যই সে বিশেষ কিছু বলিতেও সাহস করে নাই। কিন্তু এখন আর সে ভয় নাই।

মনোরমা বারণ করিয়াছিল। বলাই বৌদিদিকে তত আমল দেয় না, ফলে তাহার মাংস খাওয়া কেহ বন্ধ করিতে পারিল না!

দুই তিন দিনের মধ্যে বলাই আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিপিন অসুখের খবর পাইয়াও বাড়ি আসিতে পারিল না, জমিদার অনাদিবাবু কিস্তির সময় ছুটি দিতে চাহিলেন না।

দিন কুড়ি পরে বিপিন বাড়ি আসিয়া দেখিল, বলাই একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। বলাই বাড়ির সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া দাদাকে মাংস খাওয়ার কথা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং বিপিনের কানে সে কথা কেহ তুলিল না।

বিপিন একদিন বাড়ি থাকিয়াই চলিয়া গেল। বলাই আবার কুপথ্য স্বরু করিয়া দিল। কখনও লুকাইয়া, কখনও বা বাড়ির লোকের কাছে কান্নাকাটি করিয়া, আবদার ধরিয়া।

মাস দুই এই ভাবে কাটিবার পরে বিপিন পাঁচ ছয় দিনের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিল। তাহার বাড়ি আসিবার প্রধান কারণ, পৈতৃক আমলের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপটি এবার খড় তুলিয়া ভাল করিয়া ছাইয়া লইবে! এ সময় ভিন্ন খড় কিনিতে পাওয়া যাইবে না পাড়াগাঁয়ে।

বাড়ি আসিয়া প্রথমেই বলাইকে দেখিয়া বিপিনের বাড়ি আসিবার আনন্দ উৎসাহ এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। একি চেহারা হইয়াছে বলাইয়ের! চোখ মুখ ফুলিয়াছে, রঙ হলদে, পায়ের পাতাও যেন ফুলিয়াছে মনে হইল; অথচ নেফ্রাইটিসের রোগী দিব্য মনের আনন্দে নির্ব্বিচারে পথ্য অপথ্য খাইয়া চলিয়াছে।

বিপিন কাহাকেও কিছু বলিল না, তাহার মন ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল ভাইটার অবস্থা দেখিয়া। সেবার কিছু সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিল, কোথায় সে ভাবিতেছে, এবার গিয়া দেখিবে, ভাইটি বেশ সারিয়া সামলাইয়া উঠিয়াছে! সারিয়া ওঠা তো দূরের কথা, রাণাঘাট হাসপাতালে সেবার লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যা চেহারা ছিল, তাহার চেয়েও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দুই দিন পরে বিপিন নদীর ধারে মাছ ধরিতে যাইবে, বলাই বলিল, দাদা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে? বল তো যুগীপাড়া থেকে আর দুখানা ছিপ নিয়ে আসি।

বলাই উঠিয়া হাঁটিয়া খাইয়া-দাইয়া বেড়াইত বলিয়া বাড়ির লোকে হয়তো ভাবে, তবে অসুখ এমন কঠিন আর কি! কারণ পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার এই যে, শয্যাশায়ী এবং উত্থানশক্তি-রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও অসুস্থ বলিয়া ধারণা করিবার মত বুদ্ধি সেখানে খুব কম লোকেরই আছে।

মাছ ধরিতে গিয়া দুইজনে নদীর ওপারে গিয়া বসিল, কারণ এপারে জলে শেওলার দাম বড় বেশি।

চার করিয়া ছিপ ফেলিয়া বিপিন বলিল, বলাই, একটু তামাক সাজ তো কল্কেটায়। আর মাঠ থেকে একটু গোবর কুড়িয়ে নিয়ে আয়, বড্ড চিংড়িমাছে জ্বালাচ্ছে, একটু ছড়িয়ে দিই।

বলাই বলিল, দাদা, গোবর দিলে চিংড়ি মাছ বেশি ক'রে আসবে।

—তুই তো সব জানিস, দে আগে তামাকটা সেজে।

বেলা পড়িতে বেশি দেরি নাই। অনেকক্ষণ বিপিন ছিপ ফেলিয়া একমনে বসিয়া আছে, বলাইও তাহার পাশেই কিছু দূরে ছিপ ফেলিয়াছে। উভয়েরই ছিপের ফাতনা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্তব্ধ। হঠাৎ বিপিন মুখ তুলিয়া ভাইয়ের দিকে চাহিতেই দেখিল, বলাইয়ের চোখ ছিপের ফাতনার দিকে নাই। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একদৃষ্টে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে। চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিতেছে।

কি দেখিতেছে বলাই?

বিপিন কৌতূহলী হইয়া ভাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ওপারের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, ওপারেই চটকাতলার শ্মশান। ওপারের জঙ্গলের বহু গাছপালার মধ্যে বিপিন লক্ষ্যই করে নাই যে, তাহারা শ্মশানতলীর বুড়ো চটকাগাছটার ঠিক এপারে আসিয়া বসিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কোনও কারণও ছিল না এতক্ষণ।

কিন্তু বলাই ওদিকে অমন ভাবে চাহিয়া আছে কেন?

বলাই যেন উদাস, অন্যমনস্ক। দাদা যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এ খেয়ালও তাহার নাই।

বিপিন বলিল, ওদিকে অমন ক'রে কি দেখছিস রে?

বলাই চকিতে ওপারের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, না, কিছু না, এমনই।

বিপিন যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইল, অথচ কেন যে আশ্বস্ত হইল, কি ভয়ই বা করিতেছিল, তাহা তাহার নিজের নিকট খুব যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা নহে। তবুও মনে মনে ভাবিল, কিছু না, এমনই চেয়ে ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ ছিপের ফাতনার দিকে লক্ষ্য রাখিবার পরে ভাইয়ের দিকে একবার চোখ ফেলিতেই সে দেখিল, বলাই আবার পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে ওপারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে!

বিপিন উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি রে ? কি দেখছিস বল তো ?

বলাই বলিল, না, কিছু দেখছি না। এমনিই।—বলিয়াই সে যেন দাদার কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াটা ঢাকিয়া লইবার আগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছিপ তুলিয়া বঁড়শিতে নূতন কেঁচোর টোপ গাঁথিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আবার খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। বেলা একদম পড়িয়া গিয়াছে। ওপারের বড় বড় শিমুল শিরীষ বা তেঁতুল গাছের মগডালে পর্য্যন্ত একটুও রাঙা রোদের আভা নাই। মাঠের যেখানে তাহারা বসিয়াছে, তাহার আশেপাশে চিচ্চিড়ে ফলের বনে সারাদিনের রোদ পাইয়া রোদ-পোড়া ফলের শুঁটিগুলি পিড়িক পিড়িক শব্দ করিয়া ফাটিতেছে। এই সময়টা মাছ খায়, সুতরাং বিপিন ভাবিল, অন্তত আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যাইবে!

হঠাৎ তাহাদের সামনে জলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ নিঃশব্দে ভাসিয়া উঠিয়া চার পা নাড়িয়া সাঁতার দিতে দিতে বলাইয়ের ছিপের দিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন আসিতে লাগিল।

বিপিন বলাইকে কথাটা বলিতে গিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, কচ্ছপটা যে ভাসিয়া উঠিয়াছে বা তাহারই ছিপের দিকে সাঁতরাইয়া আসিতেছে, বলাইয়ের সেদিকে দৃষ্টিই নাই; সে আবার সেই ভাবে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে।

বিপিন ধমক দিয়া বলিল, এই! কি দেখছিস ওদিকে অমন ক'রে? ওদিকে তাকাস নি।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বিপিনের মনে হইল, এ কথা বলাইকে এ ভাবে বলা ভাল হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহটা অমূলক বা অস্পষ্ট ছিল, সেটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিপিনের হাতে পায়ে যেন বল কমিয়া গেল, মন বেজায় দমিয়া গেল। প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় ওপারের চটকাতলার শ্মশানের মড়ার বাঁশ ও ফুটা কলসীগুলা যেন কি ভয়ানক অমঙ্গলের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে! ভাসমান কচ্ছপটাও। সে তাড়াতাড়ি ছিপ গুটাইয়া ভাইকে বলিল, নে, চল, বাড়ি চল। সন্ধ্যে হ'ল। আমি ছিপগুলো বেঁধে নিই। তুই ততক্ষণ বাঁশতলার ঘাটে গিয়ে পারের নৌকো ডাক দে।

অসুস্থ ভাইটাকে শ্মশানের সান্নিধ্য হইতে যত তাড়াতাড়ি হয় সরাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

বিপিনের মন কয়দিন যেমন হাল্কা ছিল, সর্ব্বদা যেমন কি এক ধরণের আনন্দে ভরপুর ছিল, আজ আর তেমন অনুভব করিল না। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল লাগিল না, সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সারিয়া সে নিজের ঘরে ঢুকিল।

পৈতৃক আমলের কুঠুরির মেঝেতে সিমেণ্ট চটিয়া উঠিয়া গিয়াছে বহুকাল, জানালার কবাট আলগা, ছেঁড়া নেকড়া ও কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি দিয়া উত্তরের জানালাটা আটকানো। জানালায় ঠেসানো আছে এক গাদা শাবল, কুড়ুল, গোটা দুই পুরোনো হুঁকো, একটা পুরোনো টিনের তোরঙ্গ, সেজন্য ওদিকের জানালা খোলাই যায় না।

ঘরে খাট নাই, যে কয়খানা খাট ছিল, পূর্ব্ববৎসর দারিদ্র্যের দায়ে বিপিন সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। মায়ের ঘরে একখানা মাত্র জাম কাঠের সেকেলে তক্তাপোষ ছিল, সম্প্রতি বলাইয়ের অসুখ বাড়িবার পর হইতে সেখানা বলাইয়ের জন্য দালানে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বিপিন নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতিয়াই শোয় আজ তিন বৎসর।

এক দিকে মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া বিছানা করা, মনোরমা সেখানে খোকাখুকীকে লইয়া শোয়। ঘরের অন্য দিকে একখানা পুরোনো তুলো-বার-হাওয়া তোষক পাতিয়া বিপিনের জন্য বিছানা করা হইয়াছে। মশারি নাই, এতদিন অর্থাভাবে কেনা যায় নাই, চাকুরি হওয়ার পর হইতেও এমন কিছু বিপিন থোক টাকা কোনদিন হাতে করিয়া বাড়ি আসে নাই, যাহা হইতে সংসার-খরচ চালাইয়া আবার মশারি কেনা যাইতে পারে।

সমস্ত রাত্রি মশায় ছিঁড়িয়া খায় বলিয়া মনোরমা সন্ধ্যাবেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘুঁটের ও তুষের ধোঁয়ার সাঁজাল দেয়, যেমন গোহালে দেওয়া হয় তেমনই। আজও দিয়াছিল, এখনও ঘুঁটের মালসা ঘরের মেঝেতে বসানো, অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

বিপিন সৌখিন মেজাজের লোক, ঘরে ঢুকিয়া ঘুঁটের মালসা দেখিয়াই চটিয়া গেল। অপর বিছানায় ভানু শুইয়া ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

মনোরমা ঘরে ঢুকিতেই বিরক্তির স্বরে বলিল, এত রাত পর্য্যন্ত ঘুঁটের মালসা ঘরে ? বলি এখানে মানুষ শোবে, না এটা গোয়াল ? নিয়ে যাও সরিয়ে।

মনোরমা বলিল, তা কি করব বল। ও দিলে তবুও মশা একটু কমে, নইলে শোয়া যায়! একদিন ধোঁয়া না দিলে মশায় টেনে নিয়ে যায় যে! অন্য কি উপায় আছে, দেখিয়ে দাও না।

স্ত্রীর এই কথার মধ্যে তাহার মশারি কিনিবার অক্ষমতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া বিপিন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, উপায় কি আছে, না আছে, এখন দেখবার সময় নয়। তুমি দয়া ক'রে মালসাটা সরিয়ে নিয়ে যাবে ?

মনোরমা আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিবাদের হেতুভূত দ্রব্যটিকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সে একটা ব্যাপার আজ কয়েকদিন ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। পলাশপুরে চাকরি হইবার পর হইতেই স্বামীর কেমন যেন রুক্ষ মেজাজ, আগে তাহার নানা রকম বদখেয়াল ছিল, নেশাভাঙ করিত ; বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু মনোরমা যখন তিরস্কার করিত, তখন সে শুনিয়া যাইত, মৃদু প্রতিবাদ করিত, দোষক্ষালনের চেষ্টা করিত, কিন্তু রাগিত না, বরং ভয়ে ভয়ে থাকিত।

আজকাল হইয়াছে উল্টা। মনোরমা কিছু করিলেও দোষ। না করিলেও দোষ। বিপিন যেন তাহার সব কিছুতেই দোষ

দেখে। সামান্য ছুতা ধরিয়া যা তা বলে। কেন যে এমন হইল, তাহা মনোরমা ভাবিয়া পায় না।

৩

মনোরমা আর এক বিপদে পড়িয়াছে।

বীণা-ঠাকুরঝি বয়সে তাহার অপেক্ষা দুই বছরের ছোট। বিধবা হওয়ার পরে এই সংসারেই আছে, শ্বশুরবাড়ি যায় না, কারণ শ্বশুরবাড়িতে এমন কেহ আপনার জন নাই যে, তাহাকে লইয়া যায়। উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়, এখন বছর একুশ-বাইশ বয়স। মনোরমার নিজের বয়স চব্বিশ।

সে কথা যাক।

এখন বিপদ হইয়াছে এই, আজ প্রায় ছয় সাত মাস ধরিয়া মনোরমা লক্ষ্য করিতেছে, গ্রামের তারক চাটুজ্জের ছেলে পটল যখন তখন ছুতা-নাতায় এ বাড়িতে যাতায়াত করে এবং বীণার সঙ্গে মেলামেশা করে।

ইহাতে মনোরমা প্রথমে কিছু মনে করে নাই, সে শহর-বাজারের মেয়ে, তাহার বাপের বাড়িতেও বিশেষ গোঁড়ামি নাই ও বিষয়ে। ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে মিশিলেই যে খারাপ হইয়া যাইবে, সে বিশ্বাস তাহার জ্যাঠামশায়ের নাই সে জানে। মনোরমা বাবাকে দেখে নাই, জ্যাঠামশায়ই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন।

কিন্তু এ ঠিক সে রকমের নয়।

সন্দেহ একদিনে হয় নাই। একটু একটু করিয়া বহুদিনে হইয়াছে।

বিবাহ হইবার পরে এ বাড়িতে আসিয়া মনোরমা পটলকে এ বাড়িতে তত আসিতে দেখিত না, যত সে দেখিতেছে আজ প্রায় বছরখানেক। তাহার মধ্যে ছয় সাত মাস বাড়াবাড়ি। বীণা-ঠাকুরঝিও আজকাল যেন পটল আসিলে কি রকম চঞ্চল হইয়া উঠে। রাঁধিতে বসিয়াছে, হয়তো পটলের গলার স্বর শোনা গেল দালানে, শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এদিকে বীণা হয়তো এক ঘণ্টার মধ্যে রান্নাঘর হইতে বাহির হয় নাই, কোনও না কোনও ছুতা খুঁজিয়া সে রান্নাঘর হইতে বাহির হইবেই। দালানে যাইয়া পটলের সঙ্গে খানিকটা কথা কহিয়া আসিবেই। এ মাত্র একটা উদাহরণ, এ রকম অনেক আছে।

ইহাও না হয় মনোরমা না ধরিল।

একদিন সিঁড়ির পাশে অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়াইয়া সে দুইজনকে চুপি চুপি কি কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়াছে। শাশুড়ী সন্ধ্যার পর ভাল চোখে দেখেন না, নিজের ঘরে খিল দিয়া জপ-আহ্নিক করেন ঘণ্টাখানেক কি তাহারও বেশি, সে নিজেও এই সময়টা ছেলেমেয়ের তদারক করিতে, রাত্রের রান্নার যোগাড় করিতে ব্যস্ত থাকে, আর ঠিক কিনা সেই সময়েই আসিবে ওই পোড়ারমুখো পটল চাটুজ্জে!

বীণা-ঠাকুরঝিও যেন লুকাইয়া দেখা করিতে আগ্রহ দেখায়,

ইহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। অথচ পটলের বয়স ত্রিশ বত্রিশ কি তারও বেশি ; পটল বিবাহিত, তার ছেলেমেয়ে চার পাঁচটি। তাহার কেন এত ঘন ঘন যাওয়া-আসা এখানে, একজন অল্প-বয়সী বিধবার সঙ্গে এত কথাবর্ত্তাই বা তাহার কিসের? বিশেষ যখন বাড়িতে কোন পুরুষমানুষ আজকাল থাকে না। বলাই তো এতদিন হাসপাতালেই ছিল, শাশুড়ী চোখে দেখেন না, তাঁহার থাকা না থাকা দুই সমান।

বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে এ কথা কহিয়া কোন লাভ নাই। মেয়েমানুষের মন দিয়া মনোরমা তাহা বুঝিয়াছে ; বীণা কথাটা উড়াইয়া দিবে, অস্বীকার করিবে, পরে রাগ করিবে, ঝগড়া করিবে।

শাশুড়ীকে বলিয়াও কোন লাভ নাই। তিনি অত্যন্ত সরল, বিশ্বাস করিবেন না, বিশেষ করিয়া তিনি নিরেট ভাল-মানুষ, তাঁহার কথা ঠাকুরঝি শুনিবেও না! বরং বউদিদির কথা শুনিলেও শুনিতে পারে, কিন্তু মার কথা সে গায়ে মাখিবে না।

অতিরিক্ত আদর দিয়া শাশুড়ী বীণা-ঠাকুরঝির মাথাটি খাইয়াছেন।

মনোরমার ইচ্ছা ছিল বিপনকে কথাটা বলিবার! কিন্তু স্বামীর মেজাজ আজকাল যেন সর্ব্বদাই চটা, এ কথা বলিলে যদি আরও চটিয়া যায়, মনোরমাকেই গালাগালি করে, এজন্য তাহার ভয় করে কথাটা পাড়িতে!

মনোরমা সংসারী ধরণের মেয়ে। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ সংসারে পড়িয়া থাকে। জ্যাঠামশায় যখন তাহার বিবাহ দেন এ বাড়িতে, তখন ইহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। শ্বশুর চোখ বুজিতেই সব গেল। স্বামীকে বুঝাইয়া বলিবার বয়স তখন হয় নাই মনোরমার। স্বামী বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়া এমন অবস্থা করিল সংসারের যে, অমন দুর্দ্দশার অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মেয়ে মনোরমার। তাহার জ্যাঠামশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, জাঠতুতো ভাইয়েরা কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার। জ্যাঠামশায় যখন বারাসতের মুন্সেফ তখন এখানে তাহার বিবাহ দেন। সে শুধু বিনোদ চাটুজ্জের নামডাকের জোরে। তখন ভাবিয়াছিলেন, পাড়াগাঁয়ের সচ্ছল গৃহস্থের ঘর, ভাইঝি সুখেই থাকিবে। মনোরমার গায়ে গহনা কম দেন নাই জ্যাঠামশায় বিবাহের সময়, তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই, দুইগাছা রুলি ছাড়া। পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া মনোরমা বাপের বাড়ি যাওয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। এত করিয়াও স্বামীর মন পাইবার জো নাই! সবই তাহার অদৃষ্ট।

শাশুড়ীর বাতের বেদনা আছে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে শাশুড়ীর ঘরে তাপ-সেক করিতে লাগিল। বিপিনের মা পুত্রবধূকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মনোরমা যে ভাবে শাশুড়ীর সেবা বরে, বীণার নিকট হইতেও তিনি তাহা পান না; যদিও এ কথা বলা চলে না যে, বীণা মায়ের সম্বন্ধে উদাসীন। বীণা

নিজের ধরণে মায়ের যত্ন করে। সে সংসার তেমন করিয়া কখনও করে নাই, অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, ছেলেপুলে নাই ; মনেপ্রাণে সে যেন এখনও অবিবাহিতা বালিকা। তাহার ধরণধারণ বালিকার মতই, গোছালো-গাছালো সংসারী ধরণের মেয়ে সে কোনও কালেই নয়, হইবেও না। মেয়ের উপর বিপিনের মায়ের অত্যন্ত দরদ—ছোট্ট মেয়ের উপর মায়ের যেমন স্নেহ থাকে তেমনই। বিপিনের মা বোঝেন, বীণার জীবনের শূন্যস্থান তিনি কোন কিছু দিয়াই পুরাইতে পারিবেন না ; এখনও সে ছেলেমানুষ, ঠিকমত হয়তো বোঝে না তাহার কি হইয়াছে, কিন্তু যত বয়স বাড়িবে, মা চলিয়া যাইবে, মুখের দিকে চাহিবার কেহ থাকিবে না, তখন সে নিজের স্বামীপুত্রহীন জীবনের শূন্যতা উপলব্ধি করিবে, তারপর যতদিন বাঁচিবে, সম্মুখে আশাহীন, আনন্দহীন, ধূ ধূ মরুভূমি। তাহার মধ্যবয়সের সে শূন্যতা পুরিবে কিসে ? তবুও যে দুইদিন হতভাগী নিজের অবস্থা বুঝিতে না পারে, সে দুইদিনই ভাল। তা ছাড়া কি সুখের মধ্যেই বা সে এখন আছে ?

মা মধ্যে মধ্যে তাহাও ভাবেন।

বীণা শ্বশুরবাড়ি হইতে আনিয়াছিল খানকতক সোনার গহনা ও নগদ দেড় শো টাকা। বিপিন ব্যবসা করিবে বলিয়া বোনের টাকাগুলি চাহিয়া লইল, অবশ্য তাহার উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু টাকা বাকি পড়িয়া ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকান ডুবিয়া গেল। বীণার টাকাগুলিও ডুবিল সেই সঙ্গে।

ইহার পরও বীণার দুইখানা গহনা বিপিন চাহিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া বলাইকে লাঙল গরু কিনিয়া দিয়াছিল চাষবাসের জন্য। তখন সংসারের ভয়ানক দুরবস্থা যাইতেছিল, সকলে পরামর্শ দিল, জমি এখনও যাহা আছে, নিজেরা লাঙল রাখিয়া চাষ করিলে ভাতের ভাবনা হইবে না। বলাইও ধরিল, দাদা আমাকে লাঙল গরু ক'রে দাও, সংসারের ভার আমি নিচ্ছি।

বিপিন স্ত্রীকে বলিল, ওগো, শোন একটা কথা। বীণাকে বল না ওর হারগাছটা দিতে। আমি এখন বেচে বলাইকে গরু কিনে দিই, তারপর বীণাকে আবার গড়িয়ে দোব।

মনোরমা বলিল, তুমি বেশ মজার মানুষ তো! একবার ওর দেড় শো টাকা নিলে আর উপুর হাত করলে না, আবার চাইছ গলার হার! ওর ওই সামান্য ব্যাঙের আধুলি পুঁজি, শেষে ওকে কি পথে দাঁড় করাবে? আমি ও কথা বলতে পারব না।

অগত্যা বিপিনই গিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—তোর কোনও ভাবনা নেই আমি যতদিন আছি। বলাইকে লাঙল গরু কিনে দিই ওই হারগাছটা বেচে, তারপর তোকে গড়িয়ে দোব এর পরে। তোর আগের টাকাও আস্তে আস্তে শোধ দোব। কিছু ভাবিস নি তুই।

বীণা বলিল, আমার আবার ভাবাভাবি কি, হার দরকার হয় নাও না, তবে ব'লে দিচ্ছি, বাবার আমলে যেমন গোলা

ছিল, অমনই গোলা তুলতে হবে কিন্তু বাইরের উঠোনে। গোলা চ'লে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। আর আমি, বউদি, মা, তুমি, বলাই—সবাই মিলে নৌকা ক'রে একদিন কালীতলায় বেড়াতে যাব। কেমন তো?

দিনকতক চাষবাস চলিয়াছিল ভাল। বলাই নিজে দেখিত শুনিত, গরুর গাড়ি নিজে হাঁকাইত। হঠাৎ বলাইয়ের অসুখ হইয়া সে সব গেল। চিকিৎসার জন্য গরু-জোড়া বিক্রয় করিতে হইল। সুতরাং বীণার হারছড়াটাও গেল।

তারপর এই দুর্দ্দশার সংসারে বীণা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরে, রাত্রে এক মুঠা চালভাজা চিবাইয়া জল খাইয়া সারারাত কাটায়। ছেলেমানুষ একটা সাধ নাই, আহ্লাদ নাই, মা হইয়া তিনি সবই তো দেখিতেছেন।

বীণা টাকা বা গহনার জন্য কখনও দাদাকে কিছু বলে নাই, তেমন মেয়ে সে নয়। এখনও গাছকতক চুড়ি অবশিষ্ট আছে, দাদা চাহিলে সে দিতে আপত্তি করিত না, কিন্তু বিপিন লজ্জায় পড়িয়াই বোধ হয় চাহিতে পারে নাই।

বীণার কি হইবে ভাবিয়া তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। তিনি নিজের ঘরে নিজের বিছানায় বীণাকে বুকে করিয়া শুইয়া থাকেন। বীণা যে এখনও কত ছেলেমানুষ আছে, ইহা তিনি ভিন্ন আর কে বোঝে? স্বামীর ঘর কয়দিন করিয়াছিল সে? তখন তাহার বয়সই বা কত?

এক এক দিন তিনি একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত শুনিতে চান। নিজে চোখে আজকাল তেমন দেখিতে পান না রাত্রে, মনোরমা যদি অবসর পায়, সেই আসিয়া পড়িয়া শোনায়, নয় তো বীণাকে বলেন, বউমা আজ ব্যস্ত আছে, একটুখানি বই পড় তো বীণা।

বীণা একটু অনিচ্ছার সহিত বই লইয়া বসে। সে পড়িতে পারে ভালই, কিন্তু পড়িয়া শুনাইতে তাহার ভাল লাগে না। মনে মনে নিজে পড়িতে ভালবাসে। আধ ঘণ্টাটাক পড়িয়া শুনাইবার পরে বই হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করিয়া বলে, আজ থাক মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।

আজকাল, বিপিনের চাকুরি হওয়া পর্য্যন্ত, রাত্রে এক পোয়া আটার রুটি হয় বীণার জন্য। আগে এমন একদিনও গিয়াছে বীণা কিছু না খাইয়া রাত কাটাইয়াছে, আটা ময়দা কিনিবার পয়সা তো দূরের কথা, বাড়তি এক মুঠো চাল থাকিত না যে ভাজিয়া খায়। আজকাল মনোরমাই এ বন্দোবস্ত করিয়াছে, একসঙ্গে আটা আনিয়া রাখে, বীণার যাহাতে এক সপ্তাহ চলে। শাশুড়ী রাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না, সহ্য হয় না। বীণা রাত্রে না খাইয়া কষ্ট পাইত, মনোরমা তাহা সহ্য করিতে পারিত না। সে অত্যন্ত গোছালো সংসারী মানুষ, তাহার সংসারে কেহ কষ্ট পায়, ইহা সে দেখিতে পারে না। তবে আজকাল আবার বলাইয়ের অসুখ হইয়া মুস্কিল বাধিয়াছে, বীণার জন্য তোলা আটায় তাহাকেও রুটি করিয়া দিতে হয়

রাত্রে। অথচ বেশি করিয়া আনিবার পয়সা নাই। বিপিন যে টাকা পাঠায়, তাহাতে সব দিকে সঙ্কুলান হওয়া দুষ্কর। বেশি পয়সা চাহিলেও বিপিন দিতে পারে না।

মনোরমা যে ভাবে সংসার গুছাইয়া রাখিতে চায়, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সবাই সুখে থাকুক, মনোরমার সে দিকে অত্যন্ত নজর। পটলের সহিত বীণার মেলামেশা ঠিক এই কারণেই তাহার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। কি হইতে কি হইবে, সংসারটি ওলটপালট হইয়া যাইবে মাঝে পড়িয়া, এসব পাড়াগাঁয়ে একটুখানি কোন কথা লোকের কানে গেলে ঢি ঢি পড়িয়া যাইবে, সে তাহা খুব ভালই বোঝে। এখন কি করা যায়, তাহাই হইয়া উঠিয়াছে মনোরমার মস্ত সমস্যা। আজ সাহস করিয়া মনোরমা কথাটা বিপিনের কাছে পাড়িবে ভাবিয়া বলিল, শোন, একটা কথা বলি।

বিপিনের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তির সুরে বলিল, কি কথা?

মনোরমা ভয় পাইল। বিপিনের মেজাজ সে খুব ভালই বোঝে। আজ এইমাত্র সন্ধ্যাবেলা তো আগুনের মালসা লইয়া একপালা হইয়া গিয়াছে, থাকগে, কাল কি পরশু কি আর একদিন—, এত তাড়াতাড়ি কথাটা স্বামীকে শুনাইবার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। আজ অন্তত দরকার নাই।

৪

কিন্তু পরদিনই একটা ঘটনায় মনোরমার সন্দেহ বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পরে তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, ছাদে একখানা কাঁথা রোদে দিয়াছিল, তুলিতে ভুলিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়ে সিঁড়ির পাশের ঘুলঘুলি দিয়া দেখিল, বাড়ির পাশে কাঁঠালতলায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। চোখের ভুল ভাবিয়া সে সরাসরি উপরে উঠিয়া গেল এবং ছাদের আলিসা হইতে কাঁথাখানা লইয়া যখন নীচে নামিতেছে, তখন মনে হইল, চিলে কোঠার আড়ালে যেন কিসের শব্দ হইল। মনোরমা ঘুরিয়া গিয়া দেখিল, চিলে কোঠার আড়ালে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে বীণা, এবং যেন নীচে বাগানের দিকে চাহিয়া আছে। বউদিদির পায়ের শব্দে বীণা চমকিয়া পিছন দিকে চাহিল। মনোরমা বলিল, বীণা-ঠাকুরঝি এখানে দাঁড়িয়ে একলাটি ?

বীণা নীরস স্বরে বলিল, হ্যাঁ, এমনই দাঁড়িয়ে আছি।

—এস নীচে নেমে। অন্ধকার সিঁড়ি, এর পর নামতে পারবে না।

—খুব পারব। তুমি যাও, বড্ড অন্ধকার এখনও হয় নি। যাচ্ছি আমি।

মনোরমা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ঘুলঘুলি দিয়া কি জানি কেন একবার চাহিয়া দেখিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার

চোখে পড়িল, বাড়ির বাহিরের দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কে একজন আসশেওড়ার ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

মনোরমার ভয় হইল। চোর বা কোন বদমাইস লোক নিশ্চয়ই। সে কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া লোকটার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোরমা দেখিল, সে পটল চাটুজ্জে। পটল টের পায় নাই যে মনোরমা ঘুলঘুলি দিয়া চাহিয়া আছে, সে ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া একবার হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, চললাম আজ, সন্ধ্যে হয়ে গেল। কাল যেন দেখা পাই, কথা আছে।

মনোরমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ সব কি কাণ্ড। পটল চাটুজ্জের এ রকম লুকাইয়া দেখা করিবার হেতু কি? সন্ধ্যার অন্ধকারে মশার কামড়ের মধ্যে শেওড়াবনে গুঁড়ি মারিয়া লুকাইয়া বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা বলিবার কোন কারণ নাই, যখন সে সোজা বাড়ির মধ্যে আসিয়া প্রকাশ্যভাবেই বীণার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে, তাহাকে তো কেউ বাড়ি ঢুকিতে নিষেধ করে নাই!

সেই রাত্রেই মনোরমা বিপিনকে কথাটা বলিবে ঠিক করিল। কিন্তু হঠাৎ রাত দশটার সময় বলাইয়ের অসুখ বড় বাড়িল। ঠিক যখন সকলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে যাইবে, সেই সময়। বলাই রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল আর কেবলই বলিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর জ্ব'লে গেল দাদা। সর্ব্বশরীর জ্ব'লে গেল, ও মা! পাড়ার প্রবীণ লোক

গোবর্দ্ধন চাটুজ্জে আসিলেন। পাশের বিপিনদের জ্ঞাতি শ সরিক ধনপতি চাটুজ্জে আসিলেন। পাড়ার ছেলেছোকরা এবং মেয়েরা কেহ কেহ আসিল। প্রকৃত সাহায্য পাওয়া গেল গোবর্দ্ধন চাটুজ্জের কাছে। তিনি পুরনো তেঁতুলের সঙ্গে কি একটা মিশাইয়া বলাইয়ের সারা গায়ে লেপিয়া দিতে বলিলেন। তাহাতেই দেখা গেল, যন্ত্রণার কিছু উপশম ঘটিল। সারারাত বিপিনের মা রোগীর বিছানায় বসিয়া তাহাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন। বীণা রাত একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া রোগীর কাছে বসিয়া ছিল, তাহার মায়ের বারবার অনুরোধে অবশেষে সে শুইতে গেল।

মনোরমা প্রথমটা এ ঘরে বসিয়া ছিল, কিন্তু তাহার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মায়ের কাছছাড়া হইলেই রাত্রে কাঁদে, বিশেষ করিয়া ভানুটা। বিপিনের মা বলিলেন, বউমা, তুমি ছেলেদের নিয়ে শোও গে, তবুও ওরা একটু চুপ ক'রে থাক। সবাই মিলে চেঁচালে বাড়িতে তিষ্ঠুনো যাবে না। তুমি উঠে যাও।

বিপিন একবার করিয়া একটু শোয়, আবার একটু রোগীর কাছে বসে; এই ভাবে রাত কাটিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

দিন দুই পরে বলাই একটু সুস্থ হইলে বিপিন বাড়ি হইতে রওনা হইয়া পলাশপুরে আসিল। জমিদার অনাদিবাবু বেশ বিরক্ত হইয়াছেন মনে হইল; কারণ প্রায় পনরো দিন কামাই হইয়া গিয়াছে বিপিনের। বাহিরের ঘরে বসিয়া তিনি বিপিনকে জমিদারি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রজাদের নিকট হইতে কিস্তিখেলাপী সুদ আদায় কি ভাবে করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। বলিলেন, নালিশ মামলা করতে পিছুলে চলবে না। এবার গিয়ে কয়েক নম্বর মামলা রুজু ক'রে দাও, দেখি টাকা আদায় হয় কি না।

বিপিন বলিল, নালিশ করতে গেলেই তো টাকার দরকার। এখন মহলের যেমন অবস্থা, তাতে আপনাদের খরচের টাকাই দিয়ে উঠতে পারি না, তার ওপর মামলার টাকা—

অনাদিবাবু কাহারও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না। বলিলেন, তা বললে জমিদারির কাজ চলে না। টাকা যেখান থেকে পাবে যোগাড় করবে। তোমাকে তবে গোমস্তা রেখেছি কি মুখ দেখতে? সে সব আমি জানি না। টাকা চাই।

বিপিনও বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে। সে কাহারও কথা শুনিবার পাত্র নয়; বলিল, আজ্ঞে, আপনাকে আগেও বলেছি,

এখনও বলছি, ওভাবে টাকা আদায় আমায় দিয়ে হবে না। এতে যদি আপনার অসুবিধে হয়, তা হ'লে আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ভাবিল, এই সংসারের দুরবস্থায়, বলাইয়ের অসুখের সময়, এ কি কাজ করিল সে? ইহার ফলে এখনই চাকরি যাইবে।

অনাদিবাবু কিন্তু তখনই তেমন কোন কথা বলিলেন না। নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। বিপিন সেখানে বসিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রাগটা কাটিয়া গিয়া তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হইল। অনাদিবাবুর মুখে মুখে অমনতর জবাব দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। চাকুরি গেলে বাড়ি গিয়া খাইবে কি? তবে ইহাও ঠিক, সে সুর নরম করিয়া ছোট হইতে পারিবে না, ইহাতে চাকুরি যায় আর থাকে। এদিকে আর এক মুস্কিল। বেলা এগারোটা বাজে। স্নান-আহারের সময় উপস্থিত। যাহাদের চাকুরি একরূপ ছাড়িয়াই দিল এখনই, তাহাদের বাড়ি আহারাদি করিবেই বা কি করিয়া? না, তাহা আর চলে না। খাওয়ার দরকার নাই। এখনই সে রাণাঘাট হইয়া বাড়ি-চলিয়া যাইবে। বাহিরে বসিয়া থাকিলে অনাদিবাবু ভাবিতে পারেন যে, সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।

নিজের ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া বিপিন বৈঠকখানা-ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল। অল্পদূর গিয়া

পথের মোড় ঘুরিতেই হঠাৎ অনাদিবাবুদের খিড়কি-দোর হইতে যে ছোট পথটা আসিয়া এই পথের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই পথের মাথায় গাবগাছটার তলায় মানীকে তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মানী এখানে আছে তাহা সে ভাবে নাই।

মানীদের খিড়কি-দোর খোলা। এইমাত্র সে যেন দোর খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

বিপিন কিছু বলিবার আগেই মানী বলিল, কোথায় যাচ্ছ বিপিনদা?

তারপর আগাইয়া আসিয়া বিপিনের সামনে দাঁড়াইয়া আদেশের সুরে বলিল, যাও, গিয়ে বৈঠকখানায় ব'স। আমি তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি, বেলা হয়েছে বারোটা। নাওয়া-খাওয়া করতে হবে, না কতক্ষণ হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে লোকে?

প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন পরে মানীর সঙ্গে এই প্রথম দেখা। মানীর কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি যোগাইল না তাহার। সে কোনও কথাই বলিতে পারিল না, শুধু চুপ করিয়া মানীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মানী বলিল, আবার দাঁড়িয়ে কেন, বেলা হয় নি?

এতক্ষণে বিপিন বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল। অপ্রতিভের সুরে আমতা আমতা করিয়া বলিল, কিন্তু—আমি গিয়ে—বাড়ি যাচ্ছি যে।

মানী পূর্ব্ববৎ সুরেই বলিল, তোমার পায়ে আমি মাথা

খুঁড়ে খুনোখুনি হব এই দুপুরবেলা বিপিনদা? জ্ঞান বুদ্ধি আর কবে হবে তোমার? যাও ফিরে বৈঠকখানায়।

বিপিন অবাক হইল মানীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া। কতটা টান থাকিলে মেয়েরা এমন জোরের সঙ্গে কথা বলিতে পারে, বিপিনের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সে দেখিল, খিড়কি-দোরের দিকের প্রকাশ্য পথের উপর দাঁড়াইয়া মানীর সঙ্গে বেশি কিছু কথা-বার্তা বলা উচিত হইবে না এই সব পল্লীগ্রাম জায়গায়। দ্বিরুক্তি না করিয়া সে ব্যাগ হাতে আবার আসিয়া অনাদিবাবুদের বৈঠকখানায় উঠিল।

বৈঠকখানায় কেহই নাই। অনাদিবাবু সম্ভবত বাড়ির মধ্যে স্নান করিতেছেন। সে যে বৈঠকখানা হইতে ব্যাগ হাতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, ইহা মানী কি করিয়া জানিল বিপিন ভাবিয়া পাইল না!

একটু পরে চাকর এক বাটি তেল ও একখানা গামছা আনিয়া বলিল, নায়েববাবু, নেয়ে নিন, মা ব'লে দিলেন।

বিপিন বলিল, কে তোকে তেল আনতে বললে?

—মা বললেন, নায়েববাবুর জন্যে তেল দিয়ে আয় বাইরে। দিদিমণি গিয়ে রান্নাঘরে মাকে বললেন, আপনি বাইরে ব'সে আছেন, তেল পাঠিয়ে দিতে। আমি মাছ কুটছেলাম, আমায় বললেন, দিয়ে আয়। আপনি যে কখন এয়েলেন, তা দেখি নি কিনা তাই জানি নে, নইলে আমি নিজেই তেল দিয়ে

যাতাম। নায়েববাবু কি আজ আলেন? ভাল তো সব বাড়ির?

এই একমাত্র চাকর জমিদার-বাড়ির, সে তো তাহার যাতায়াতের কোন খবরই রাখে না, তবে মানী কি করিয়া জানিল, সে ব্যাগ হাতে চলিয়া যাইতেছে এবং রাগ করিয়াই যাইতেছে?

খাইবার সময় মানীর আঁচলের ডগাও দেখা গেল না কোন দিকে, কারণ রান্নাঘরের বারান্দায় অনাদিবাবুর সঙ্গেই তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। অনাদিবাবু উপস্থিত থাকিলে মানী বিপিনের সামনে বড় একটা বাহির হয়না!

অনাদিবাবু খাইতে বসিয়া এমন ভাব দেখাইলেন যে, বিপিনের সঙ্গে তাঁহার যেন কোনও অপ্রীতিকর কথাবার্ত্তা হয় নাই। জমিদারি সংক্রান্ত কোন কথাই উঠাইলেন না।—বিপিনের দেশে মাছের দর আজকাল কি, ম্যালেরিয়া কমিয়াছে না বাড়িয়াছে, রাণাঘাটের বাজারে কাহার একখানা দোকান আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠাইয়া তাহাদের আলোচনার মধ্যেই আহার শেষ করিলেন।

রাণাঘাট হইতে হাঁটিয়া আসিয়া বিপিনের শরীর ক্লান্ত ছিল। অনাদিবাবু বেলা তিনটার আগে বৈঠকখানায় আসিবেন না, মধ্যাহ্নে উপরের ঘরে খানিকক্ষণ নিদ্রা যাওয়া তাঁর অভ্যাস, বিপিন জানে; সুতরাং সে নিজেও এই অবসরে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে। চাকরকে ডাকিয়া বলিল,

শ্যামহরি, ও শ্যামহরি, বাবু নামবার আগে আমায় ডেকে দিস যদি ঘুমিয়ে পড়ি, বুঝলি? আর একটু তামাক সেজে নিয়ে আয়।

২

একটু পরে মানীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বাহিরের ঘরে মানীকে সে আসিতে দেখে নাই কখনও।

মানী বলিল, বিপিনদা, রাগ পড়েছে?

বিপিন মানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, তুই কি ক'রে জানলি আমি চ'লে যাচ্ছি। কেউ তো জানে না। শ্যামহরি চাকরকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, আমি কখন এসেছি তা পর্য্যন্ত সে খবর রাখে না।

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার টনক আছে মাথায় বিপিনদা, আমি জানতে পারি।

—কি ক'রে বল না মানী, সত্যি, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তোকে দেখে।

মানী তবুও হাসিতে লাগিল। কৌতুক পাইলে সে সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়, বিপিন তাহা ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে, এবং ইহাও একটা কারণ যে জন্য মানীকে তাহার বড় ভাল লাগে।

—আচ্ছা, হাসি এখন একটু বন্ধ থাকগে। কথার উত্তর দে।

মানী দোরের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, দরজার শিকলটা দুই হাতে ধরিয়া তাহার হাসিবার ভঙ্গি দেখিয়া বিপিনের মনে হইতেছিল, মানী এখনও যেন তেমনই ছেলেমানুষ আছে, শিকল ছাড়িয়া মানী দরজার পাশে একখানা চেয়ারে বসিল। গম্ভীর মুখে বলিল, আচ্ছা, তুমি কি রকম মানুষ বিপিনদা! এসেছ কখন, তা জানি না! একবার দেখা পর্য্যন্ত করলে না! তারপর বাবা বুড়ো মানুষ কি বলেছেন না বলেছেন, তুমি অমনই চ'টে গেলে, আর এই ঠিক দুপুরবেলা, খাওয়া না দাওয়া না, কাউকে কিছু না ব'লে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পুঁটুলি হাতে!

—তুই জানলি কি ক'রে?

—আমি জানব কি ক'রে? বাবা রান্নাঘরে গিয়ে মার কাছে বললেন যে, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে কি নিয়ে। মাকে বললেন, শ্যামহরিকে দিয়ে তোমার নাইবার তেল পাঠিয়ে দিতে। বাবার মুখে তাই শুনে আমার ভয় হ'ল, আমি তো তোমায় চিনি। তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এসে দেখি, তুমি ওই বাতাবিনেবুতলা পর্য্যন্ত চ'লে গিয়েছ। চেঁচিয়ে ডাকতে পারি নে তো আর। তখনই ছুটে খিড়কি-দোরে গেলুম, রাস্তার বাঁকে তোমায় আসতেই হবে। বাপ রে, কি রাগ!

—রাগ নয়, মনের দুঃখু তো হতে পারে।

কি দুঃখু ? তুমিও বলেছ বাবাকে যে, না পোষায় আপনি অন্য লোক রাখুন। বাবা তোমাকে তো কিছুই বলেন নি।

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। এ কথার জবাব দিতে গেলে অনাদিবাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে হয়, তাহা সে মানীকে বলিতে চায় না।

মানী বলিল, বিপিনদা, আমার কাছে তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে ?

—কি কথা ?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলে ? বলেছিলে না, আমায় না জিজ্ঞেস ক'রে চাকরি ছাড়বে না ? কথা দিয়েছিলে, মনে আছে ?

—মনে ছিল না, এখন মনে পড়ছে বটে।

—তা নয়, রাগের সময় তোমার জ্ঞান ছিল না, এই হ'ল আসল কথা। উঃ, কি জোরে বেরিয়ে যাওয়া হ'ল ! দেখতে না দেখতে একেবারে বাতাবিনেবুর গাছের কাছে। ভাগ্যিস আমি ছুটে গেলুম খিড়কির দোরে ? নইলে এতক্ষণ রাণাঘাটের অর্দ্ধেক রাস্তা—

—কিন্তু এতক্ষণ পরে একটা কথা বলি মানী, তুই যে এসেছিস বা এখানে আছিস এ কথা আমি কিন্তু কিচ্ছু জানি না। আমি তোকে খিড়কি-দোরের পথে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—বাবা কিছু বলেন নি ?

—উনি তোর কথা আমার কাছে কি বলবেন? কখনও বলেন, না আমিই জিজ্ঞেস করি?

—তা নয়। আমি থাকলেই তো খরচ বাড়ে, খরচ বাড়লেই জমিদারির তাগাদা জোর ক'রে করবার ভার পড়ে তোমার ওপর। আমি ভেবেছিলুম, বাবা সে কথা তুলেছেন বুঝি; আমি আছি সুতরাং টাকা চাই, এমন কথা যদি ব'লে থাকেন।

—না, সে কথা ওঠে নি। তুই চ'লে যাবি শিগগির এ তো জেনেই গিয়েছিলুম, আবার এর মধ্যে আসবি তা ভাবি নি।

—তা ভাববে কেন? দেখতে পেলে বুঝি গা জ্বালা করে? দূরে রাখলেই বাঁচ বুঝি?

—বলেছি কোন দিন?

মানী ঘাড় দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমায় রাগাচ্ছি বিপিনদা, রাগাচ্ছি। সেই সব তোমার ছেলেবেলার মত এখনও আছে, কিছু বদলায় নি। আচ্ছা, একটা কবিতা বলব শুনবে?

বিপিন হাত নাড়িয়া যেন মশা তাড়াইবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, রক্ষে কর। ওসব ভাল লাগে না আমার, বুঝি-সুঝি না। বাদ দাও, জান তো আমার বিদ্যে।

মানী গম্ভীর হইয়া বলিল, বিপিনদা, আমার আর একটা কথা রাখতে হবে। তোমায় পড়াশুনা করতে হবে। তোমায় কতকগুলো ভাল বই দোব সেগুলো কাছারিতে গিয়ে পড়বে,

প'ড়ে ফেরত দেবে, আমি আবার দোব। বইয়ের আমার অভাব নেই, যত চাও দোব।

বিপিন তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, বই আমি অনেক পড়েছি, তুই যা। বুড়ো বয়েসে আবার বই পড়তে যাই, আর উনি আমার মাস্টারনী হয়ে এসেছেন!

মানী রাগিয়া বলিল, এসেছিই তো মাস্টারনী হয়ে। পড়তে হবে তোমায়। বই দিচ্ছি, নিয়ে যাও যদি ভাল চাও। এঃ, একেবারে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছেন আর কি! পড়াশুনো শিকেয় তুলেছেন!

বিপিন হাসিতে লাগিল।

মানী বলিল, সত্যি বলছি বিপিনদা, নিজের জীবনটা তুমি ইচ্ছে ক'রে গোল্লায় দিলে। নইলে আজ আমার বাবার বাড়ি চাকরি করতে আসবে কেন তুমি? লেখাপড়া শিখলে কাঁকুড়, তোমায় ভাল চাকরি দেবে কে বল তো? আবার তেজ ক'রে চ'লে যাওয়া হয়! যাও, বই দিচ্ছি, নিয়ে পড়গে, আর একখানা ডাক্তারি বই দিচ্ছি, সেখানা যদি ভাল ক'রে পড়তে পার, তবে আর চাকরি করতে হবে না।

ডাক্তারি বইয়ের কথায় বিপিন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। নতুবা এতক্ষণ মানীর গুরুমহাশয়-গিরিতে তাহার হাসি আর থামিতেছিল না। বলিল, বেশ, ভালই তো। কি বই পড়তে হবে এনে দিও, দেখি চেষ্টা ক'রে।

—মানুষ হও বিপিনদা, আমার বড্ড ইচ্ছে। তোমার

বুদ্ধি আছে, কিছু কাজে লাগালে না তাকে। ডাক্তারি যদি শিখতে পার, ভেবে দেখ, কারও চাকরি তোমায় করতে হবে না। আমার এক দেওর ডাক্তারি পাস করেছে, বীজপুরে ডাক্তারখানা খুলে বসেছে, দেড়শো টাকার কম কোনও মাসে পায় না।

—সেসব পাস-করা ডাক্তারের কথা ছেড়ে দে। আচ্ছা, বাংলা বই প'ড়ে ডাক্তার হওয়া যায়?

—কেন হওয়া যাবে না? খু-উ-ব যায়। তোমায় বই আমি আরও দোব। তারপর আমার সেই দেওরকে ব'লে দোব, তার কাছে ছ মাস থেকে শিখলে তুমি পাকা ডাক্তার হয়ে যাবে। সে কথা পরে হবে, এখন তোমায় বই এনে দিই। সেগুলো নিয়ে কাছারি যেও, আর রোজ প'ড়। কবে যাবে সেখানে?

—কাল সকালেই যেতে হবে, দেরি আর করা চলবে না।

—আচ্ছা, ব'স, আমি বই বেছে বেছে নিয়ে আসি।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া কেমন একপ্রকার হাসিয়া চলিয়া গেল। মানীর এ হাসি বিপিনের পরিচিত। ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে।

মনে মনে ভাবিল, মানীটা বড় ভাল মেয়ে। এতটুকু ঠ্যাকার নেই, বেশ মনটি। তবে মাথায় একটু ছিট আছে, নইলে আমায় এ বয়েসে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে!

মানী একরাশ বই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বিপিনের সামনে বইয়ের বোঝা নামাইয়া বলিল, দেখে ভয় হচ্ছে নাকি? কিছু

ভয় নেই। এর মধ্যে দুখানা শরৎবাবুর নভেল আছে, 'শ্রীকান্ত' আর 'দত্তা' প'ড়ে দেখো, কি চমৎকার!

—উঃ, তুই দেখছি আমায় রাতারাতি পণ্ডিত না ক'রে ছাড়বি না মানী!

মানী আর একখানা মোটা বই হাতে লইয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, এইখানা সেই ডাক্তারি বই। এ আমার শ্বশুর-বাড়ির জিনিস। তোমায় দিলাম। এ থেকে তুমি ক'রে খেতে পারবে।

বিপিন পড়িয়া দেখিল, বইখানির নাম 'সরল চিকিৎসা-বিজ্ঞান'। গ্রন্থকারের নাম ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় এল. এম. এস.।

মানীর দিকে চাহিয়া বলিল, বেশ ভাল বই?

মানী ঘাড় নাড়িয়া আশ্বাস দেওয়ার সুরে বলিল, খুব ভাল বই। এতে সব আছে ডাক্তারি ব্যাপারের। বাকিটুকু হয়ে যাবে এখন, আমার সেই দেওরের কাছে থেকে কিছুদিন শিখলে। আমি সব ঠিক ক'রে দোব এখন।

—আর ওগুলো কি বই?

—এখানা শরৎবাবুর 'দত্তা', বললুম যে। চমৎকার বই, প'ড়ে দেখো—উপন্যাস। উপন্যাস পড় নি কখনও?

—আমাদের বাড়িতে ছিল বাবার আমলের 'ভুবনমোহিনী' ব'লে একখানা উপন্যাস। সেখানা পড়েছি।

—ওসব বাজে বই, ভাল বই তুমি কিছুই পড় নি, খোঁজও

রাখ না বিপিনদা। আজকাল মেয়েরা যা জানে, তুমি তাও জান না। দুঃখু হয় তোমার জন্যে।

—শরৎবাবু ভাল লেখক? নাম শুনি নি তো?

—তুমি কার নাম শুনেছ? বঙ্কিমবাবুর নাম জান? রবি ঠাকুরের নাম জান?

—নাম শুনেছি ওই পর্য্যন্ত। পড়ি নি কোনও বই। আছে তাঁদের বই?

—এগুলো আগে প'ড়ে শেষ কর। পরে দোব। শোন, আমি শ্যামহরি চাকরকে ব'লে দিচ্ছি, তোমার পুঁটুলি আর বই দত্তপাড়ায় কাছারিতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। নইলে তুমি নিয়ে যাবে কি ক'রে?

—ওতে দরকার নেই মানী, তোমার বাবা কি মনে করবেন? আমার মোট বইবার জন্যে চাকরকে বলবার কি দরকার?

—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বললে বাবা কিছু বলবেন না। আজই যাবে?

—এখুনি বেরুব। অনাদিবাবু ঘুম থেকে উঠলেই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেই বেরিয়ে পড়ব।

—বাবা ঘুম থেকে উঠলেই আমি চাকরের হাতে চা পাঠিয়ে দোব এখন, চা খেয়ে যেও।

মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়। অনাদিবাবুর এখনও উঠিবার সময় হয় নাই, মানী আরও কিছুক্ষণ থাকুক না!

বিপিন কহিল, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি মানী, নইলে আর কার সঙ্গেই বা করব! বলাইকে নিয়ে বড় বিপদে প'ড়ে গিয়েছি, ওর অসুখ আবার বেড়েছে, এদিকে এই তো অবস্থা, বাড়িতে থাকলে কুপথ্যি করে, কারও কথা শোনে না। কি করি বল তো, এমন দুর্ভাবনা হয়েছে ওর জন্যে! এই যে আসতে দেরি হয়ে গেল বাড়ি থেকে, সে ওরই অসুখ বাড়ল ব'লে। নইলে তোর কাছে যা কথা দিয়ে গিয়েছিলাম, তার আগেই আসতাম।

বলাইয়ের অসুখের ভাবনা বিপিনের মনে যেন পাথরের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়া দিয়াছে সব সময়, মানীর কাছে সে বোঝা কিছুক্ষণের জন্য নামাইয়াও সুখ। মানীকে সে মনে মনে বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়ে বলিয়া শ্রদ্ধা করে, অন্তত সে মানীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা মেয়ে কখনও দেখে নাই, সেইজন্য মানী কি পরামর্শ দেয় শুনিবার নিমিত্ত বিপিন উৎসুক হইল।

মানী বলিল, ওকে তো সেবার হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেলে, হাসপাতালে আবার নিয়ে এস না।

—হাসপাতালের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম, তারা ওকে হাসপাতালে রাখতে চায় না। বলে, ও রুগী হাসপাতালে রেখে উপকার হবে না।

মানী একটু ভাবিয়া বলিল, তা হ'লে কি জান, আমার দেওরকে না হয় একখানা চিঠি লিখি। বীজপুরে রেলের

হাসপাতাল আছে, সেখানে যদি কোন বন্দোবস্ত করা যায়, দেওর তো ওখানে ডাক্তার। কালই চিঠি লিখব।

এই সময় বাড়ির মধ্যে অনাদিবাবুর গলা শোনা গেল।

তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া দোতলার বারান্দায় কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মানী বলিল, ওই বাবা উঠেছেন, আমি আসি, চা এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর বইগুলো পড়তে হবে আর আমাকে বলতে হবে সব কথা, যেন ভুলে যেও না।

বিপিন হাসিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, ওরে আমার মাস্টারনী রে!

—বাজে কথা ব'ল না বিপিনদা, ব'লে দিচ্ছি। আর ডাক্তারি বইখানার কথা যেন খুব ক'রে মনে থাকে। জীবনে উন্নতি করবার চেষ্টা ক'র বিপিনদা, কেন চিরকার পরের দাসত্ব করবে?

মানীর কথায় বিপিনের হাসি পাইল। কি মুরুব্বিই হইয়া উঠিয়াছে মানী এই অল্প বয়সে! কথার খই ফুটিতেছে মুখে! বলিল, দাঁড়া মানী, একটা কথা, তুই ব্রহ্মসমাজের মত বক্তৃতা দিবি নাকি? কলকাতায় গিয়ে দেখছি মানুষ হয়ে গেলি!

—আবার বাজে কথা! চুপ। কি কথা বলছিলে বলবে? এই বাজে কথা, না আর কোন কথা আছে?

—ইয়ে, তুই আর কতদিন আছিস এখানে?

—ঠিক নেই। যতদিন ওরা রাখে—ওদের মর্জ্জি। কেন?

বিপিন একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, এবার এলে তোর সঙ্গে দেখা হবে কি না তাই বলছিলাম।

—খুব দেখা হবে। কতদিনের মধ্যে আসছ? বেশিদিন দেরি নাই বা করলে?

খুব দেরি করা না করা আমার হাত নয়। যদি আদায় হয় চট ক'রে এই হপ্তাতেই আসতে পারি, নয়তো পনরো বিশ দিন দেরিও হতে পারে।

মানী বলিল, আচ্ছা, যাই?

মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়, কিন্তু অনাদিবাবু উঠিয়া হয়তো ওপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন, এ অবস্থায় তাহাকে আর ধরিয়া রাখাও উচিত নয়। সুতরাং সে বলিল, আচ্ছা, এস, তোমার বাবা আসছেন বাইরে।

কিন্তু মানী চলিয়া যাইবামাত্র বিপিনের মনে হইল মানীর শেষ কথাটি—'আচ্ছা, যাই?'

মানী যখন চোখের সামনে থাকে, তখন বিপিন মানীর সব কথা ভাবিয়া দেখিবার, বুঝিবার, উপভোগ করিবার অবকাশ পায় না। এখন বিপিন হঠাৎ দেখিল, মানী এ কথা তাহাকে আর কখনও বলে নাই, অর্থাৎ বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। কি জানি কেন, মানীর এ কথা বিপিনের ভারী ভাল লাগিল।

একটু পরে শ্যামহরি চাকর চা আনিয়া দিল, আর আনিল ছোট একটা রেকাবিতে খানকতক পেঁপের টুকরা ও একটা সন্দেশ।

এ মানীর কাজ ছাড়া আর কারও নয়, বিপিন তাহা জানে। এ বাড়িতে মানী যখন ছিল না, বাহিরের ঘরে এক আধ পেয়ালা চা যদি বা কালেভদ্রে আসিয়াছে, খাবার কখনও যে আসে নাই, এ কথা সে হলপ করিয়া বলিতে পারে।

৩

কাছারিঘরে একা বসিয়া সন্ধ্যার সময় বিপিনের আজকাল বড়ই খারাপ লাগে।

ধোপাখালিতে সে আসিয়াছে আজ প্রায় দেড় মাস পরে। এতদিন দেশে ছিল নিজের পরিবারের মধ্যে নিজ্জনে বসিয়া, আকাশের তারা গুনিবার বিড়ম্বনা সেখানে ভোগ করিতে হয় নাই।

বিশেষ করিয়া মানীর সঙ্গে দেখা হইবার পরে দিন কতক এই নির্জ্জনতা যেন একেবারে অসহ্য হইয়া পড়ে। আবার কিছু দিন পরে সহিয়া যায়।

কাছারির উঠানের সেই বাদামগাছটার ডালপালার মধ্যে কেমন এক প্রকার শব্দ হয়, বিপিন দাওয়ায় বসিয়া চুপ করিয়া রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে।

মানী যে বলিয়াছিল, 'জীবনে উন্নতি কর বিপিনদা'—কথাটা বিপিনের বড় মনে লাগিয়াছে। তখন হাসি পাইলে কি হইবে, এখন সে বুঝিয়াছে, মানীর এই কথাটা তাহার মনে অনেকখানি আনন্দ ও উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে।

জীবনে উন্নতি তাহাকে করিতেই হইবে।

সন্ধ্যার পরে কাছারির চাকরটা আলো জ্বালাইয়া রান্নার যোগাড় করিতে রান্নাঘরে ঢোকে। কিন্তু বিপিন এবেলা বড় একটা রান্নাবান্নার হাঙ্গামাতে যায় না। ওবেলার বাসি তরকারি থাকে, চাকরকে দিয়া খানকতক রুটি করাইয়া লয় মাত্র। খাইয়া আসিয়া মানীর দেওয়া বইগুলি পড়িতে বসে। এ সময়টা একরকম মন্দ কাটে না।

বইগুলি একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, মানী সত্যই বলিয়াছিল।

ডাক্তারি বইখানা প্রথম প্রথম সে ভাল বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু ক্রমে এই বইখানাই তাহার গাঢ় মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। মানুষের শরীরের মধ্যে এত সব ব্যাপার আছে, সে কোন দিন ভাবে নাই। দেহের নানা রকম যন্ত্রের ছবি বইয়ের গোড়ার দিকে দেওয়া আছে, বিভিন্ন যন্ত্রের কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে, উপন্যাসের চেয়েও বিপিনের কাছে সে সব বেশি চমকপ্রদ মনে হইল।

'তিন চার দিন বইখানা পড়িবার পরেই বিপিন ঠিক করিয়া ফেলিল, ডাক্তারি সে শিখিবেই। এতদিন পরে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এতদিন সে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মানীর কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকিবে পথ দেখাইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া দিবার জন্য।

দিন পনরো লাগিল বইখানা শেষ করিতে।

শেষ করিয়া একটা কথা তাহার মনে হইল, কি অন্যায় সে করিয়াছে পৈতৃক অর্থের অপব্যয় করিয়া! আজ যদি হাতে টাকা থাকিত, সে চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতায় কোন ডাক্তারি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া কিছুদিন পড়াশুনা করিত। বাংলা ভাষায় ডাক্তারি ব্যবসায় শেখানো হয়, এমন স্কুল কলিকাতায় আছে— এই বইখানার মধ্যেই সে স্কুলের বিজ্ঞাপন আছে শেষের পাতায়।

তাহার মনে হইল মানী মেয়েমানুষ, কিছু তেমন জানে না, তাই সে বলিয়াছিল বীজপুরে তাহার দেওরের কাছে ছয় মাস থাকিলে বিপিন ডাক্তারি-শাস্ত্রে পটু হইয়া যাইবে। বেচারী মানী!

এ সে জিনিস নয়, বইখানা আগাগোড়া পড়িবার পরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ডাক্তারি শেখা ছয় মাস এক বছরের কর্ম্ম নয়। ভাল ডাক্তার হইতে হইলে কোনও ভাল স্কুলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে না পড়িলে কিছুই হইবে না। বহু ব্যাপার শিখিবার আছে, এ বিষয়ে মানীর দেওর কি শিখাইবে?

বিপিনের আরও মনে হইল, ডাক্তারি সে ভাল পারিবে। তাহার মন বলিতেছে, এই কাজে নামিয়া পড়িলে যশ অর্জ্জন করিবে সে। এই একখানা মাত্র বই পড়িয়া সে অনেক কিছু বুঝিয়াছে, বইতে যা বলে নাই, তাহার চেয়ে বেশি বুঝিয়াছে।

মানীর সঙ্গে দেখা করিয়া এসব কথা তাহাকে বলিতে হইবে। মানীর সঙ্গেই পরামর্শ করিতে হইবে, ডাক্তারি

শিখিবার আর কি উপায় স্থির করা যাইতে পারে। তাহার ভাল মন্দ মানী যেমন বোঝে, সে নিজেও যেন তেমন বোঝে না।

৪

বিপিন পাঁচ ছয় টাকা খরচ করিয়া রাণাঘাট হইতে কুইনাইন, লাইকার আর্সেনিক, লাইকার অ্যামোনিয়া, এসিড এন. এম. ডিল. প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ আনাইল, যাহা সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রেসক্রিপ্শনে লাগে বলিয়া বইতে লিখিয়াছে। অ্যাল্ক্যালি-মিক্শ্চারের উপকরণও ওই সঙ্গে কিছু আনাইল।

আনাইবার পরদিনই কামিনীর প্রতিবেশিনী হাবু ঘোষের দিদিমা আসিয়া বলিল, ও নায়েববাবু, কামিনীর বড় অসুখ হয়েছে আজ তিন চার দিন হ'ল, একবার আপনারে যেতে বলেছে।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রথম রোগী দেখিতে ছুটিল। যদিও হাবুর দিদিমা ডাক্তার হিসাবে তাহাকে আহ্বান করে নাই, সে যে ডাক্তারি বই পড়িয়া ভিতরে ভিতরে ডাক্তার হইয়া উঠিয়াছে, এ খবর কেহ রাখে না।

বিপিন এবার যখন কাছারিতে আসে, আজ দিন কুড়ি আগের কথা, কামিনী সেই দিনই গিয়া বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। তারপর দুপুরের পরে প্রায়ই বুড়ী কাছারিতে আসিয়া

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যাইত। তাহার অভ্যাসমত কয়দিন দুধ ও ফলমূলও নিজে লইয়া আসিয়াছে। আজ সাত আট দিন হইল কামিনী কাছারিতে আসে নাই, বিপিনের এখন মনে পড়িল। সে নিজেকে লইয়া এমন মশগুল যে, বুড়ী কেন আজকাল কাছারিতে আসিতেছে না—এ প্রশ্ন তাহার মনে উঠে নাই।

গোয়ালাপাড়ার মধ্যেই কামিনীর বাড়ি।

দুইখানা বড় চালাঘর, মাটির দেওয়াল। খুব পরিষ্কার করিয়া লেপা-পোঁছা! এক দিকে গোহাল, আগে অনেকগুলি গরু ছিল। বিপিন ছেলেবেলায় কামিনীর বাড়িতে আসিয়াছে, কামিনী কাছারি গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি আনিত এবং ওই বড় ঘরের দাওয়ায় বসাইয়া কত গল্প করিত, খাবার খাইতে দিত, সে কথা বিপিনের আজও মনে আছে। তবে সে কামিনীর বাড়িতে আসে নাই আর কখনও সেই বাল্য-দিনগুলির পরে, আসিবার আবশ্যকও হয় নাই।

কামিনী ঘরের মেঝেতে বিছানার উপর শুইয়া আছে।

বিছানাপত্রের অবস্থা দেখিয়া বিপিন বুঝিল, কামিনীর সচ্ছল দিন আর নাই। এক সময়ে এই ঘরের মধ্যে এক হাত পুরু গদির উপরে তোষক ও ধপধপে চাদর পাতা চওড়া বিছানা সে নিজের চোখে দেখিয়াছে। ঘরে নানা রকম ছবি টাঙানো থাকিত, এখনও অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া দুইচারখানা ছবি ঝুল-কালি মাখানো অবস্থায় দেওয়ালে ঝুলিতেছে—

কালী, দশমহাবিদ্যা, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রঙিন ছবি, গোষ্ঠবিহার।

কামিনী ময়লা কাঁথার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, এস বাবা, এস, ওই পিঁড়িখানা পেতে দে তো ভাই।

হাবুর দিদিমা পিঁড়ি পাতিয়া দিল। সেই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে বিপিনকে।

বিপিন বলিল, দেখি হাতখানা জ্বর হয়েছে, তা আমায় আগে জানাও নি কেন? আজ গিয়ে হাবুর দিদিমা বললে, তাই জানতে পারলাম।

তুমি ব'স ব'স, ভাল হয়ে ব'স। আমার কথা বাদ দাও, অসুখ লেগেই আছে। বয়েস হয়েছে, এখন এই রকম ক'রে যে কদিন যায়।

বিপিন হাত দেখিয়া বুঝিল, জ্বর খুব বেশি। মনে মনে ভাবিল, কি ভুলই হয়েছে! একটা থার্মোমিটার না পেলে কি জ্বর দেখা যায়! একদিন রাণাঘাট গিয়ে একটা থার্মোমিটার আনতেই হবে, নইলে রোগী দেখা চলবে না।

বিপিন হাবুর দিদিমাকে বলিল, একটা শিশি নিয়ে চল, ওষুধ দিচ্ছি।

কামিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি ওষুধ দেবে কোথা থেকে?

বিপিন হাসিয়া বলিল, বা রে, তুমি বুঝি জান না, আমি ডাক্তারি করি যে আজকাল!

কামিনী কথাটা বিশ্বাস করিল না। বলিল, আহা, কেবল পাগলামি আর খেয়াল।

হাবুর দিদিমা শিশি ধুইতে বাহিরে গিয়াছিল, এই সুযোগে কামিনী বলিল, স'রে এসে ব'স কাছে।

বিপিন মলিন কাঁথা-পাতা বিছানার এক পাশে বসিল।

কামিনী সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, চিরকালটা একরকম গেল। কামিনী আড়ালে আবডালে যে তাহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করে, ইহা বিপিনের অনেকদিন হইতেই জানা আছে। সেও হাসিয়া বলিল, না, সত্যি বলছি, আমি ডাক্তারি শিখছি। শুনবে তবে, কে আমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে? আমাদের জমিদারের মেয়ে!

কামিনী অবাক হইয়া বলিল, আমাদের বাবুর মেয়ে! সে আর কতটুকু, আমি তাকে দেখি নি যেন! কর্তা থাকতে একবার দোলের সময় জমিদারবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন সে খুকীকে দেখেছি, কর্তামশায় তাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখ, আমাদের বাবুর মেয়ে। ওই এক মেয়েই তো! কর্তা বলতেন—। আচ্ছা, কর্তা ইদানীং একটু চোখে কম দেখতেন, না?

বিপিন দেখিল, বুড়ী তাহার বাবার কথা আনিয়া ফেলিয়াছে, হঠাৎ থামিবে না, এখন বাবার সম্বন্ধে বুড়ীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার নাই! সে হাসিয়া বলিল, তুমি সে কতকাল আগে দেখেছিলে, তোমার খেয়াল আছে? সে মেয়ে কি চিরকাল তেমনই খুকী থাকবে?

এখন তার বয়েস কুড়ি বাইশ। অনাদিবাবুদের বাড়ি দোল হ'ত আজকের কথা নয়, আমার ছেলেবেলার কথা।

—বাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কোথায়?

—কলকাতায় এক উকিলের সঙ্গে।

—তা সে মেয়ে তোমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে কেমন কথা? সে ডাক্তারি জানলে কোথা থেকে?

বিপিনের ইচ্ছা, মানীর সম্বন্ধে কথা বলে। অনেক দিন মানীর বিষয়ে সে কথা বলে নাই, তাহাকে দেখেও নাই, তাহার মনটা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তত মানীর বিষয় লইয়া কিছু বলিয়াও [redacted]। কিন্তু ধোপাখালির প্রজাদের নিকট তো আর জমিদারবাবুর মেয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে না!

কামিনীর কথার উত্তরে বিপিন যাহা বলিয়া গেল, তাহা বৃদ্ধার প্রশ্নের সঠিক উত্তর নয়, মানীর রূপগুণের একটি দীর্ঘ বর্ণনা।

কামিনী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বিপিনের কথা শেষ হইয়া গেলে বলিল, বেশ মেয়ে। তোমার সামনে বেরোয়?

—কেন বেরুবে না? ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি, আমার সামনে বেরুবে না?

—একটা কথা বলি, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তোমারও ঘরে সোনার পিরতিমের মত বউ। আমার একটা কথা শোন বাবা। তুমি তার সঙ্গে আর দেখাশুনা ক'র না। তুমি

কালকের ছেলে, কি জান আর কিই বা বোঝ। তোমার মাথায় এখনও অনেক রকম পাগলামি ঢুকে আছে। তোমায় জানতে আমার বাকি নেই বাবা, কর্ত্তামশায়ের ত ছেলে! তুমি ও মেয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষো না, নিজে কষ্ট পাবে, তাকেও কষ্ট দেবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল।

দুপুরের পরে বিপিন কাছারিতে বসিয়া হিসাবপত্র দেখিতেছে, নিবারণ গোয়ালার ছেলে পাঁচু আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, কামিনী পিসী একবার আপনাকে ডেকেছে।

বিপিন গিয়া দেখিল, কামিনীর অসুখ বাড়িয়াছে। গায়ের উত্তাপ খুব বেশি, জ্বরের ধমকে বৃদ্ধা যেন হাঁপাইতেছে, বেশি কথা বলিবার শক্তি নাই।

বিপিন বলিল, কি খেয়েছ?

কামিনী ক্ষীণস্বরে বলিল, নিবারণের বউ একটু জলসাবু ক'রে দিয়ে গেল, দুপুরের আগে তাই একচুমুক—মুখে ভাল লাগে না কিছু।

—আচ্ছা, আচ্ছা চুপ ক'রে শুয়ে থাক।

—তুমি আমায় আজ দেখতে আস নি কেন?

কথাটা কামিনী কেমন যেন গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল; বেশ একটু অভিমানের সুরও বটে।

বিপিন মনে মনে অনুতপ্ত হইল। দেখিতে আসা খুব উচিত ছিল; সকালে কাছারিতে জনকতক প্রজার সঙ্গে গোলমাল মিটাইতে দেরি হইয়া গেল, নতুবা ঠিক আসিত। কামিনীর কেহ নাই, বৃদ্ধা হয়তো আশা করে, বিপিন তাহার অসময়ে পুত্রবৎ দেখাশোনা করিবে; যদিও বিপিন কামিনীর মনের এত কথা বুঝিতে পারে না, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, অপরের দিকে চাহিবার অবসর তাহার কোথায়?

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে বিপিন বলিল, এখন যাই, প্রজাপত্তর আসবে, আর আমায় একবার গদাধরপুর যেতে হবে একটা জমির মীমাংসা করতে। সন্ধ্যের পর আবার আসব।

কামিনী উঠিতে দেয় না, হাত বাড়াইয়া টানিয়া টানিয়া বলিল, যেও না, যেও না, ও বাবা বিপিন, যেওনা, ব'স, ব'স।

বিপিনের কষ্ট হইল বৃদ্ধাকে এভাবে ফেলিয়া যাইতে। কিন্তু সত্যই তাহার থাকিবার উপায় নাই। গদাধরপুরে কয়েকঘর জেলে প্রজা আছে, তাহারা স্থানীয় বাঁওড়ের দখল লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার ফলে কাছারির খাজনা আদায় হইতেছে না। বিপিন নিজে গিয়া এ ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিলে তাহারা মানিয়া লইবে, এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছে। সুতরাং যাইতেই হইবে তাহাকে।

অনাদিবাবুর কানে যদি কথা যায়, তবে এতদিন সে যায় নাই কেন, এজন্য কৈফিয়ং তলব করিয়া পাঠাইবেন।

আড়ালে পাঁচুকে ডাকিয়া বলিল, পাঁচু, তোমার মাকে বল এখানে একটু থাকতে। আমি আবার আসব এখন, একবার কাজে যাব গদাধরপুরে। আর একবার একটু সাবু ক'রে খাইয়ে দিতে ব'ল তোমার মাকে। খরচপত্তর যা হবে, সব আমার। আমি সব দোব। আচ্ছা, একটা লোক দিতে পার, রাণাঘাট থেকে কমলালেবু আর বেদানা কিনে আনবে?

বিপিন কাছারির নায়েব বটে, কিন্তু সে ভালমানুষ নায়েব। লোকে সেজন্য তাহাকে তত ভয় করে না। বিপিনের বাবার আমলে প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না, মুখের কথা খসাইয়া হুকুম করিলেই চলিত।

পাঁচু বলিল, আচ্ছা বাবু, আমি দেখছি যদি হাবুল যায়, ব'লে দেখছি।

—এই আট আনা পয়সা রাখ। হাবুলকে পাও বা যাকে পাও, দিয়ে ব'ল ভাল বেদানা আর কমলালেবু আনতে; আর যে যাবে, তার জলখাবার আর মজুরি এই নাও চার আনা।

বিপিন কাছারি আসিয়া গদাধরপুর যাইবার জন্য বাহির হইয়াছে, এমন সময় পাঁচু আসিয়া বলিল, কেউ গেল না নায়েববাবু, আমি নিজেই চললাম রাণাঘাট। ফিরতে কিন্তু আমার রাত হবে, তা ব'লে যাচ্ছি।

বিপিন বুঝিল, মজুরি ও জলখাবারের দরুন চারি আনার পয়সার লোভ সম্বরণ করা পাঁচুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; তারপর বাকি আট আনার ভিতর হইতে অন্তত আর ছয় পয়সা উপরিই বা কোন না হইবে?

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা।

গদাধরপুর এখান হইতে তিন চার মাইল পথ। বিপিন জোরে হাঁটিতে লাগিল। বজরাপুর পর্য্যন্ত সে ও পাঁচু একসঙ্গে গেল! তারপর রাণাঘাটের রাস্তা বাঁকিয়া পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। পাঁচু সেই রাস্তায় চলিয়া গেল। গদাধরপুর যাইবার কোনও বাঁধা-ধরা পথ নাই। মাঠের উপর দিয়া সরু পায়ে চলার পথ, কখনও বা ফুরাইয়া যায়, আবার কিছু দূরে গিয়া অন্য একটা পথ মেলে। মাঠে লোকজনও নাই যে, পথ জিজ্ঞাসা করা যায়। নানা সরু সরু পথ নানা দিকে গিয়াছে, কোন্ পথ যে ধরিতে হইবে, জানা নাই। বিপিন এক প্রকার আন্দাজে চলিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। রোদের তেজ কমিয়া গেল।

মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় আকন্দগাছে ফুল ফুটিয়াছে। সোঁদা, রোদপোড়া মাটি ও শুকনো কাশঝোপের গন্ধ বাহির হইতেছে। ফাঁকা মাঠ, গাছপালাও বেশি নাই, কোথাও হয়তো বা একটা নিমগাছ, মাঝে মাঝে খেজুরগাছ।

অবশেষে দূর হইতে জলাশয় দেখিয়া বিপিন বুঝিল, এই গদাধরপুরের বাঁওড়, সুতরাং সে ঠিক পথেই আসিয়াছে।

গদাধরপুরের প্রজারা বিপিনকে খাতির করিয়া বসাইল। গ্রামের মধ্যে একটা কলু-বাড়ির বড় দাওয়ায় নূতন মাদুর পাতিয়া দিল বিপিনের জন্য। এ গ্রাম অনাদিবাবুর খাস তালুকের অন্তর্গত, গোটা গ্রামখানার সব লোকই কাছারির প্রজা।

বাঁওড়ের দখলের মীমাংসা করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

দুই তিন জন প্রজা বলিল, নায়েববাবু, বলচে আমাদের বাধ-বাধ ঠেকে, কিন্তু আপনার একটু জল মুখে দিলে হ'ত।

বিপিন বলিল, না, সে থাক। এখনও অনেক কাজ বাকি। আমাকে আবার সব কাজ সেরে ফিরতে হবে এতখানি রাস্তা।

প্রজারা ছাড়িল না, শেষ পর্যান্ত বিপিনকে একটা ডাব খাইতে হইল।

একটি চাষাদের বউ কি মেয়ে এক কাঠা ধান হাতে কলু-বাড়ির উঠানে আসিয়া বলিল, হ্যাদে, ইদিকি এস। তেল দ্যাও আধপোয়া আর এক ছটাক নুন, আধপয়সার ঝাল্—

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি ধান দিয়ে জিনিস কেনো?

মেয়েটি বলিল, হ্যাঁ বাবু, কনে পয়সা পাব? শীতকাল গেল, একখানা বস্তর নেই যে গায়ে দিই। যে কবিশ ধান পেয়েলাম, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে খাবার ধান চাট্টি ঘরে ছেল। তাই দিয়ে তেল নুন হবে সারা বছরের আরও খাওয়া হবে।

—এতে কুলোবে সারা বছর?

—তা কি কুলোয় বাবু? আষাঢ় শ্রাবণ মাসের দিকি আবার মহাজনের গোলায় ধামা হাতে যাতি হবে! ধান কর্জ্জ না করলি আর চলবে না তারপর।

কলু-বাড়িতে একটা ছোট মুদীর দোকানও আছে। আরও কয়েকটি লোক জিনিসপত্র কিনিতে আসিল। মেয়েটি তেল নুন কিনিয়া যাইবার সময় বলিল, মুসুরি নেবা?

হরি কলু বলিল, নতুন মুসুরি? কাল নিয়ে এস।

—মুসুরির বদলে কিন্তু চাল দিতি হবে।

বিপিন বলিল, তোমার ঘরে ধান আছে তো চাল নিয়ে কি করবে?

মেয়েটি উঠানে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। তাহার ভাই জন খাটিয়া খায়, কিন্তু তাহার হাঁপানির অসুখ, দশ দিন খাটে তো পনরো দিন পড়িয়া থাকে। সংসারের বড় কষ্ট, সাত জন লোক এক এক বেলায় খায়, দু বেলায় চোদ্দ জন। যে কয়টি ধান আছে, তাহাতে কয় মাস যাইবে? সামান্য কিছু মুসুরি ছিল, তাহার বদলে চাল না লইলে চলে কি করিয়া?

এই সব প্রজা। ইহাদের নিকট খাজনা আদায় করিয়া তাহাকে চাকুরি বজায় রাখিতে হইবে। অনাদিবাবুর চাকুরি লইয়া সে মস্ত বড় ভুল করিয়াছে। এ সব জিনিস তাহার ধাতে নাই। বাবা কি করিয়া কাজ চালাইতেন সে জানে না, কিন্তু তাহার পক্ষে অসম্ভব।

মানী ঠিক পরামর্শ দিয়াছে।

ডাক্তারি শিখিতেই হইবে তাহাকে। ডাক্তারি শিখিলে এই সব গরিব লোকের অনেকখানি উপকার করিতেও তো পারিবে।

এখানকার আর একজন প্রজার কাছে অনেকগুলি টাকা খাজনা বাকি। বিপিন সন্ধ্যার পরে তাহার বাড়ি তাগাদা দিতে গেল। গিয়া দেখিল, খড়ের ঘরের দাওয়ায় লোকটা শয্যাগত, মলিন লেপ কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। তিন চারটি পাড়ার লোক নায়েববাবুর আগমন-সংবাদ শুনিয়া বাড়ির উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রোগীর বিছানার পাশে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, বিপিনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

লোকটির নাম বিশু ঘোষ, জাতিতে কৈবর্ত্ত। বিপিনকে সে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু বিপিন দাওয়ায় উঠিয়া বসিতেই তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কে? ছিরাম? তামাক দে, ছিরাম খুড়োকে তামাক দে।

বিপিন তো অবাক। পরে রোগীর চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল, চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল। ঘোর বিকার। রোগী মানুষ চিনিতে পারিতেছে না। বিপিন বলিল, ওর মাথায় জল দাও! দেখছে কে?

একজন উত্তর দিল, ফকির সায়েব দেখছেন।

—কোথাকার ফকির সায়েব? ডাক্তার?

—আজ্ঞে না, তিনি ঝাড়ফুঁক করেন খুব ভাল। তিনি বলেছেন, উপরিভাব হয়েছে।

বিপিন বুঝিতে না পারিয়া বলিল, উপরিভাব কি ব্যাপার?

দুই তিন জনে বুঝাইয়া দিবার উৎসাহে একসঙ্গে বলিল, আজ্ঞে, এই দৃষ্টি হয়েছে আর কি, অপদেবতার দিষ্টি হয়েছে।

—ভূতে পেয়েছে ?

—ভূতে পাওয়া না ঠিক। দিষ্টি হয়েছে আর কি।

বিপিনের যতটুকু ডাক্তারি-বিদ্যা এই কয়দিন বই পড়িয়া হইয়াছে, তাহারই বলে সে বলিল, ওর ঘোর জ্বর, বিকার হয়েছে। লোক চিনতে পারছে না, চোখ লাল, মাথায় জল ঢাল। উপরিভাব-টাব বাজে, ওকে ডাক্তার দেখাও, নইলে বাঁচবে না। ফকিরের কর্ম্ম নয় এ সব।

উহাদের মধ্যে একজন বলিল, এ দিগরে বরাবর থেকে ফকির সায়েব ঝাড়ান-ফাড়ান, তেলপড়া দিয়েই রোগ সারান বাবু। ডাক্তার কোথায় এখানে ? ডাক্তার আছে সেই রামনগরের হাটে, নয়তো সেই চাক্‌দার বাজারে। আর এক আছে রাণাঘাটে। দু কোশ রাস্তা। এক মুঠো টাকা খরচ ক'রে কি গরিবগুরবো লোকে ডাক্তার আনতি পারে ?

২

গদাধরপুর হইতে বিপিন যখন বাহির হইয়া ফাঁকা মাঠে পড়িল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি, একটু পরেই চাঁদ উঠিবে। চাঁদ উঠার জন্যই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল।

মাঠে জনপ্রাণী নাই। অপূর্ব্ব তারাভরা রাত্রি। আকাশের

দিকে বিপিনের নজর পড়িত না, যদি চাঁদ কখন ওঠে, ইহা দেখিবার প্রয়োজন তাহার না হইত। কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়া নক্ষত্রভরা অন্ধকার আকাশের দৃশ্য দেখিয়া জীবনে এই বোধ হয় বিপিনের বড় ভাল লাগিল।

কেমন নিস্তব্ধতা, কেমন একটা রহস্যময় ভাব রাত্রির এই নিস্তব্ধতার! এত ভাল লাগিবার প্রধান কারণ, এই সময় মানীর কথা তাহার মনে পড়িল।

আজ যে এই সব দরিদ্র রোগপীড়িত মানুষদের সে চোখের উপর অজ্ঞতার ফলে মরণের পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আসিল, মানীই তাহাকে পথ দেখাইয়া বলিয়া দিয়াছে, ইহাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে কি করিয়া বাঁচাইতে হইবে। ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, সংপরামর্শ দিবার মানুষ নাই, কঠিন সান্নিপাতিক বিকারের রোগী, সম্পূর্ণ অসহায়। জলপড়া, তেলপড়ার চিকিৎসা চলিতেছে। ওদিকে কামিনী-মাসীর ওই অবস্থা, তাহার ভাইয়ের ওই অবস্থা।

মানী তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যে পথে গেলে অর্থ ও পুণ্য দুইই মিলিবে!

গরিব প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া, তাহাদের রক্ত চুষিয়া তাহার বাবা এবং মানীর বাবা দুইজনেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সে পাপপথে চলিবে তো নাইই, বরং পিতৃদেবের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবে নিজেদের দিয়া।

মানী তাহাকে জীবনে আলো দেখাইয়াছে।

একটি অদ্ভুত মনের ভাবের সহিত বিপিনের পরিচয় ঘটিল আজ হঠাৎ এই মাঠের মধ্যে। মানীর সঙ্গে ভালবাসার যে সম্পর্ক তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে, এতদিন অন্তত বিপিনের মনের দিক হইতে তাহা দেহসম্পর্কহীন ছিল না, মনে মনে মানীর দেহকে সে বাদ দিতে পারে নাই। বিপিনের স্বভাবই তা নয়, সূক্ষ্ম মানসিক স্তরের আদানপ্রদান তাহার ধাতুগত নয়। মানীর সম্বন্ধে এ আশা বিপিন কখনও ছাড়ে নাই যে, একদিন না একদিন সে মানীকে নামাইবে তাহার নিজস্ব নিম্নস্তরে। সুবিধা সুযোগ এখন নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও কি ঘটিবে না?

আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, মানীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্য ধরণের। মানী তাহাকে যে স্তরে লইয়া গিয়াছে, বিপিনের মন তাহার সহিত পরিচিত ছিল না। অনেক মেয়ের সঙ্গে বিপিন মিশিয়াছে পূর্ব্বে অন্যভাবে। মন বলিয়া জিনিসের কারবার ছিল না সেখানে। হয়তো মন জিনিসটাই ছিল না সে ধরণের মেয়েদের।

কিন্তু মনোরমা? বিপিন জানে না। মনোরমার মন সম্বন্ধে বিপিনের কখনও কৌতূহল জাগে নাই। তেমন ভাবে মনোরমা কখনও বিপিনের সঙ্গে মিশে নাই। হয়তো সেটা বিপিনেরই দোষ, মনোরমার মনকে বিপিন সে ভাবে চাহিয়াছে কবে? যে সোনার কাঠির স্পর্শে মনোরমার মনের ঘুম ভাঙিত, বিপিনের কাছে সে সোনার কাঠি ছিল না।

বিপিনের মনের ঘুম ভাঙাইয়াছে মানী। সে সোনার কাঠি ছিল মানীর কাছে।

দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে। বিপিন একটা খেজুর-গাছের তলায় ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। ভারী ভাল লাগিতেছিল, কি যে হইয়াছে তাহার, কেন আজ এত ভাল লাগিতেছে—এই আধ-অন্ধকার মাঠ, পূব-আকাশে উদীয়মান চন্দ্র, মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় সাদা আকন্দফুল, ঠাণ্ডা হাওয়া—কখনও তেমন ভাবে বিপিন এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই, আজ যেন কি হইয়াছে তাহার!

বলিতে লজ্জা করিলেও বলিতে হইবে, তাহাদের গ্রামের দোকানে সে সন্ধ্যার পর গোপনে তাড়ি পর্য্যন্ত খাইয়া দেখিয়াছে—কি রকম মজা হয়! এই বছর পাঁচ আগেও। বাবা তখন অল্পদিন মারা গিয়াছেন। হাতে কাঁচা পয়সা, বিপিন তখন খুব উড়িতেছে। অবশ্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই খাইয়াছিল। খানিকটা বাহাদুরিও বটে। ভোলা ছুতারের ছেলে হাবুলের সহিত বাজি ফেলা হইয়াছিল।

এ সব কথা বিপিনের আজ এমন করিয়া কেন মনে হইতেছে?

সে মানীর বন্ধুত্বের উপযুক্ত নয়। নিজেকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বিপিনের তাহাই মনে হইল। নিজেকে সে কলঙ্কিত করিয়াছে নানা ভাবে। মানী নিষ্পাপ নির্ম্মল।

বিপিন উঠিয়া পথ চলিতে লাগিল। বোধ হয় সে অপেক্ষা করিতেছিল চাঁদ ভাল করিয়া উঠিবার জন্য।

একটা নীচু খেজুরগাছে এক ভাঁড় খেজুর রস দেখিয়া সে ভাঁড় পাড়িয়া রস খাইল, সন্ধ্যার টাটকা রস সাধারণত মেলে না। ভাঁড়টা আবার গাছে টাঙাইয়া রাখিবার সময় সে ভাঁড়টার মধ্যে দুইটি পয়সা রাখিয়া দিল। পল্লীগ্রামে এত ধার্ম্মিক কেহ হয় না, কিন্তু আজ বিপিনের মনে হইল, চুরি সে করিতে পারিবে না। মানীর কাছে দাঁড়াইতে হইবে তাহাকে, চোরের বিবেক লইয়া দাঁড়াইতে পারিবে সেখানে?

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, ছোকরা চাকরটা তাহার জন্য বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

বিপিন বলিল, এই ওঠ, উনুন ধরাগে যা। দুধ দিয়ে গিয়েছে এবেলা?

চাকরটা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বাবা! কত রাত ক'রে আলেন নায়েববাবু? আমি বলি রাত্তিরি বুঝি থাকবেন সেখানে।

—কামিনী-মাসী কেমন আছে রে? রাণাঘাট থেকে লেবু নিয়ে ফিরেছে কিনা জানিস?

—জানি নে বাবু।

৩

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া কামিনীকে দেখিতে গেল।

বেশ জ্যোৎস্নাভরা রাত। কিন্তু গাঁয়ের লোক প্রায় সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গোয়ালাপাড়ার মধ্যে কাহারও বড় একটা সাড়াশব্দ নাই।

কামিনীর ঘরের দোর ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মেঝেতে একটা পিলসুজের উপরে মাটির পিদিম টিম টিম জ্বলিতেছে, বোধ হয় পাঁচুর মা জ্বালিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। রোগী কাঁথামুড়ি দিয়া একলাটি শুইয়া বোধ হয় ঘুমাইতেছে।

বিপিন ডাকিল, ও মাসী, কেমন আছ, ও মাসী ?

সাড়াশব্দ নাই।

বিপিন বিছানার পাশে গিয়া বসিয়া বৃদ্ধার গায়ে হাত দিয়া দেখিল। নাড়ী দেখিয়া মনে হইল, নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ। খুব ঘাম হইতেছে, বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে ঘামে। বৃদ্ধা ঘুমাইতেছে, না ক্রমশ অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছে, বোঝাও কঠিন।

যাই হোক, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে কামিনী চোখ চাহিয়া বিপিনের দিকে চাহিল। কি যেন বলিল, বোঝা গেল না, ঠোঁট যেন নড়িল।

বিপিন বলিল, কি মাসী, কেমন আছ ? বলছ কিছু ?

কামিনীর জ্ঞান নাই। সে দৃষ্টিহীন নেত্রে বিপিনের দিকে চাহিল, ঘরের বাঁশের আড়ার দিকে চাহিল, আলনায় বাঁধা পুরানো লেপ-কাঁথার দিকে চাহিল। বৃদ্ধার এই ঘরে ৺বিনোদ চাটুজ্জে নিয়মিত আসিতেন, কামিনী তখন দেখিতে বেশ ফর্সা ও দোহারা চেহারার স্ত্রীলোক ছিল, কালাপেড়ে কাপড় পরিত, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙা করিয়া রাখিত, হাতে সোনার বালা ও অনন্ত পরিত, কালো চুলে খোঁপা বাঁধিত, এ কথা বিপিনের অল্প অল্প মনে আছে। বাইশ তেইশ বছর আগের কথা। এই যে বৃদ্ধা বিছানার সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে, মাথায় পাকা চুল, গায়ের রং হাজিয়া আধকালো, দাঁত পড়িয়া গালে টোল খাইয়া গিয়াছে, বিশেষত জ্বরে ভুগিয়া বর্তমানে তাড়কা রাক্ষসীর মত চেহারা হইয়া উঠিয়াছে যাহার, এই যে সেই একদিনের হাস্যলাস্যময়ী সুন্দরী কামিনী, যাহার চটুল চাহনিতে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, ইহাকে দেখিয়া কে বলিবে সে কথা?

প্রথম যৌবনে দুইজনের দেখাশোনা হয়। কামিনী ছিল গোয়ালার মেয়ে—বালবিধবা, সুন্দরী। বিনোদ চাটুজ্জেও ছিলেন লম্বা চওড়া জোয়ান, বড় বড় চোখ, গলার স্বর গম্ভীর ও ভারী—পুরুষের মত শক্ত সমর্থ চেহারা। তা ছাড়া ছিল অসম্ভব দাপট। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগের কথা, তখন নায়েববাবুই ছিলেন এ অঞ্চলের দারোগা, নায়েববাবুই ম্যাজিস্ট্রেট।

কামিনী বিনোদ চাটুজ্জেকে ভালবাসিবে. এ বিচিত্র কথা কি ?

সারাজীবন একসঙ্গে যাহার সহিত কাটাইয়া, নিজের উজ্জ্বল যৌবন যাহাকে দান করিয়া কামিনী নারীজন্মের সার্থকতাকে বুঝিয়াছিল, সেই বিনোদ চাটুজ্জের অভাবে তাহার জীবন শূন্য হইয়া পড়িবে ইহাও বিচিত্র কথা নয়।

হয়তো এইমাত্র অজ্ঞান অচৈতন্য জ্বরঘোরে কামিনীর মন ঘুরিয়া ফিরিতেছিল তাহার প্রথম যৌবনের সেই পাখী-ডাকা, ফুল-ফোটা, আলো-মাখা মাধবী রাত্রির প্রহরগুলি অনুসন্ধান করিয়া, আবার মনে মনে সেখানে বাস করিয়া, হারানো রাত্রির শিশিরসিক্ত স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করিয়া।

হয়তো মনে পড়িতেছিল প্রথম দিনের সেই ছবিটি।

ষোড়শী বালিকা তাহাদের বাড়ির সামনের বেগুনের ক্ষেত হইতে ছোট্ট চুপড়ি করিয়া বেগুন তুলিয়া ফিরিতেছিল।

পথে আসিতেছিল যুবক বিনোদ চাটুজ্জে, ধোপাখালি কাছারির নায়েব, ধোপাখালি গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সবাই বলাবলি করিত, নায়েববাবুর কাছে গেলে সব জব্দ হয়ে যাবে এখন! নায়েব এসেছে যা জবর। কোন ট্যাঁ-ফোঁ খাটবে না সেখানে! নায়েবের মত নায়েব!

সে কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিল। বেশ মনে আছে, বেগুনের ক্ষেতের কঞ্চি-বাঁধা আগড়ের কাছে দাঁড়াইয়া।

লম্বা, সুপুরুষ, টকটকে ফর্সা, মাথায় ঢেউ খেলানো কালো

চুল, তবে বয়স খুব কম নয়। ত্রিশ বত্রিশ হইবে, কিংবা তারও কিছু বেশি।

নায়েববাবু যখন কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহার তখন বড় লজ্জা হইল। বাঁ হাতে বেগুনের চুপড়িটা, ডান হাতে কঞ্চির আগড়টা শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল।

হঠাৎ বিনোদ চাটুজ্জে তাহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন।

—বেগুন ওতে? এ কাদের ক্ষেত?

সে লজ্জায় সঙ্কোচে বেড়ার সহিত মিশিয়া কোন রকমে উত্তর দিল, আমাদের ক্ষেত।

—তুমি কি রসিক ঘোষের মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—বেগুন কি বিক্রি কর তোমরা?

—না, এ খাবার বেগুন।

—তোমার বাবা কোথায়?

—চিলেমারি দুধ আনতে গেছে।

—ও।

নায়েববাবু চলিয়া গেলেন।

তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। ভয় না লজ্জা, কে জানে। বাড়ি আসিয়া দিদিমাকে (মা তাহার আগের বছর মারা গিয়াছিল) বলিল, আইমা, ওই বুঝি কাছারির নতুন নায়েব? যাচ্ছিলেন এখান দিয়ে,

আমার কাছে বেগুন দেখে বললেন, বেগুন বিক্রির? কি জাত, আইমা?

তাহার দিদিমা বলিল, বামুন যে, তাও জান না পোড়ারমুখ মেয়ে। চাইলেন কিনতে, বেগুন কটা দিয়ে দিলেই হ'ত। আমার তো মনে থাকে না, তোর বাবাকে বেগুন দিয়ে আসতে বলিস কাছারিতে। বামুন মানুষ।

এক চুপড়ি ভাল কাঁচ বেগুন ও এক ঘটি দুধ সে-ই কাছারিতে দিয়া আসিয়াছিল। পরদিন বিকালবেলা বাবার সঙ্গে গিয়াছিল।

কিন্তু হায়! সে প্রেমমুগ্ধা তরুণী পল্লীবালিকা আর নাই, সে সুপুরুষ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েববাবুও আর নাই।

অনেক কালের কথা এ সব। সেকালের কথা!

* * * *

বিপিন পড়িল মহা মুস্কিলে।

কামিনী যখন মারা গেল, তখন রাত দেড়টার কম নয়। মৃতদেহ ফেলিয়াই বা কোথায় সে যায় এখন? বাধ্য হইয়া ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইল। বৃদ্ধার মৃতদেহ এ ভাবে ফেলিয়া সে যাইতে পারিবে না, মনে মনে সে মায়ের মতই ভালবাসিত কামিনীকে। ভোর হইল। কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিতেই বিপিন গিয়া ডাকহাঁক করিয়া লোকজন উঠাইল। পাঁচু কাল অনেক রাত্রে রাণাঘাট হইতে কমলালেবু লইয়া ফিরিয়াছিল, সকালে দিতে আসিতেছিল, পথে দেখা। তাহাকে পাঠাইয়া ওপাড়া হইতে গোয়ালার পুরোহিত বামনদাস

চক্কত্তিকে আনাইল। এ সব পাড়াগাঁয়ে 'প্রাচিত্তির' না করাইলে মড়া-দেহ ছুঁইবে না, বিপিন জানে। কামিনীর আপনার বলিতে কেহ ছিল না, দূর সম্পর্কের এক বোনপো আছে রাণাঘাটে, তাহাকে খবর দিবার জন্য লোক পাঠাইল। তাহাকে দিয়াই শ্রাদ্ধ করাইতে হইবে। সব কাজ শেষ করাইয়া দাহ করিতে বেলা একটা বাজিল।

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, পলাশপুর হইতে জমিদারবাবুর পত্র লইয়া লোক আসিয়া বসিয়া আছে। নানা রকমের কাজের তাগাদা চিঠির মধ্যে, বিশেষ করিয়া টাকার তাগাদা—ত্রিশটি টাকা এই লোকের হাতে যেন আজই পাঠানো হয়।

লোকটাকে বিপিন বলিল, আজ কাছারিতে থাক। এখন টাকা অবেলায় কোথায় পাব? কাল যাবে। দেখি, নরহরি দাসকে ব'লে।

লোকটা আর একখানি ক্ষুদ্র খামের চিঠি বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, মনে ছেল না নায়েববাবু, দিদিমণি এই চিঠিখানা আপনাকে দিতে বলেছেলেন। আমি যখন আসি, খিড়কি-দোরের পথে এসে দিয়ে গেলেন।

মানীর চিঠি! কখনও তো সে বিপিনকে চিঠি দেয় নাই! কি লিখিয়াছে মানী? বিপিন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া যতদূর সম্ভব উদাসীন মুখে বলিল, ও, বোধ হয় বড় মাছ চাই। বাবাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে মাছ চেয়ে পাঠায় বটে। আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর।

বাদামতলায় দাঁড়াইয়া মানীর চিঠি খুলিয়া পড়িল। ছোট্ট চিঠি। লেখা আছে,—

"বিপিনদা,

প্রণাম নেবে। অনেকদিন গিয়েছ, আদায়পত্র কেমন হচ্ছে? নায়েবি কাজের যেন গলদ না হয়, তাগাদাপত্র ঠিকমত হচ্ছে তো? নইলে কৈফিয়ং তলব করব, মনে থাকে যেন। আমিও জমিদারের মেয়ে।

আর একটি বিশেষ কথা। আমি এই মাসেই চ'লে যাব, আমার ছোট দেওরের বিয়ের হঠাৎ ঠিক হয়েছে। যাবার আগে তুমি অবিশ্যি একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে। একবার এসেই না হয় চ'লে যেও, কিন্তু আসাই চাই। আবার কবে আসব, তার ঠিকানা নেই। চিঠির কথা কাউকে ব'লো না ইতি

মানী"

৪

পরদিন অনাদিবাবুর লোক বিপিনের একখানা চিঠি লইয়া চলিয়া গেল, তাহাতে বিপিন লিখিল, টাকা আদায় হইলেই কাল কিংবা পরশু নাগাত সে নিজে লইয়া যাইতেছে। মানীর সঙ্গে দেখা করিবার এই উত্তম সুযোগ।

সন্ধ্যা হইল। বাদামগাছের পাতায় হাওয়া লাগিয়া এক-

প্রকার শব্দ হইতেছে। অন্ধকার রাত্রি, জ্যোৎস্না উঠিবার দেরি আছে।

কামিনীর মৃত্যু বিপিনের মনে বিষাদের রেখাপাত করিয়াছে, পুরাতন দিনের সঙ্গে ঐ একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল চিরকালের জন্য।

আজ তাহার মনে হইল, এই প্রবাসে বৃদ্ধা তাহার সুখদুঃখ যত বুঝিত, এত আর কে বুঝিত? তাহার খাওয়ায় কষ্ট, শোওয়ায় কষ্ট হইলে কামিনীর মনে তাহা বাজিত, সাধ্যমত চেষ্টা করিত সে কষ্ট দূর করিতে। টাকার দরকার হইলে বিপিন যদি হাত পাতিত, কামিনী তাহাকে বিমুখ করিত না কখনও। গতবার যে পঞ্চাশটি টাকা সে ধার দিয়াছিল বিপিন একবার দুইবার চাওয়ামাত্র, সে দেনা বিপিন শোধ করে নাই। পুত্রহীনা বৃদ্ধা তাহাকে সন্তানের মতই স্নেহ করিত।

তাহার বাবার কথা উঠিলে বৃদ্ধা আর কোনও কথা বলিতে ভালবাসিত না। কতবার এ ব্যাপার বিপিন লক্ষ্য করিয়াছে। তরুণ মনের স্পর্দ্ধিত ঔদাসীন্যে হয়তো বিপিন এই ব্যাপারে কৌতুকই অনুভব করিয়া আসিয়াছে বরাবর, আজ তাহার মনে হইতেছে, বৃদ্ধা কি ভালই বাসিত তাহার স্বর্গগত পিতা বিনোদ চাটুজ্জেকে! আগে যাহা সে বুঝিত না, আজকাল তাহা সে ভাল করিয়াই বোঝে। মানী তাহার চোখ খুলিয়া দিয়াছে নানা দিকে।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, মানীকে সে কখনও এ ভাবে দেখে

নাই। এই কয় মাসে যে মানীকে সে দেখিতেছে, সে কোন্ মানী? ছেলেবেলার সাথী সেই মানী কিন্তু এ নয়। বালক-বালিকা হিসাবে সে খেলা তো বিপিন অনেক মেয়ের সঙ্গেই করিয়াছে; অন্য পাঁচটা ছেলেবেলার সঙ্গিনী মেয়ের সহিত যেমন ভাব হয়, মানীর সহিত তাহার বেশি কিছু হয় নাই, এ কথা বিপিন বেশ জানে।

মধ্যে সে হইয়া গিয়াছিল জমিদার অনাদিবাবুর মেয়ে সুলতা।

তখন কলিকাতায় থাকিয়া কোন মেয়ে-স্কুলে মানী পড়িত। খুব সম্ভব ম্যাট্রিক পাসও করিয়াছিল—সে কথা বিপিন ঠিকমত জানে না; বাবা মারা গিয়াছেন তখন, বিপিন আর পলাশপুরে জমিদার-বাটিতে আসে নাই।

তবে সুলতার কথা মাঝে মাঝে বিপিনের মনে পড়িত—বাল্য-প্রীতির দিক দিয়া নয়, সুলতা সুন্দরী মেয়ে এই জন্য। না জানি সে এতদিনে কেমন সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে! সেই সুন্দরী সুলতা আবার 'মানী' হইয়া দেখা দিল তো সেদিন।

টাকা যোগাড় করিতে পারিলেই পলাশপুর জমিদারদের বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু এখনও এমন টাকা যোগাড় হয় নাই, যাহা হাতে করিয়া সেখানে যাওয়া চলে। এদিকে বেশি দেরি হইলে যদি মানী চলিয়া যায়!

কামিনী মাসী থাকিলে এসব সময়ে সাহায্য করিত।

উপায় অন্য কিছু না দেখিয়া নরহরি মুচিকে সন্ধ্যার পর

ডাকিয়া পাঠাইল। নরহরি আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, নায়েব মশাই, কি জন্যি ডেকোচ ? দণ্ডবৎ হই।

—এস নরহরি, ব'স। গোটা কুড়ি টাকা কাল যেখান থেকে পার দিতে হবেই। জমিদারবাবু চেয়েছেন, নিয়ে যেতে হবে।

নরহরি চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, বিষম হ্যাঙ্গামায় ফাললেন যে! কুড়ি টাকা এখন কোথায় পাই। আচ্ছা দেখি। কাল বেনবেলা এস্তক যদি যোগাড়যন্তর করতে পারি, তবে সে কথা বলব। হ্যাঁ, একটা কথা বলি নায়েব মশাই—

—কি ?

—কামিনী পিসীর কিছু টাকা ছেল। সিন্দুক প্যাঁটরা খুলে দেখেছেলেন ? ওর বেশ টাকা ছেল হাতে, আমরা যদ্দুর জানি। আপনি তো সে রাত্তিরি ওর কাছে ছেলেন, আপনাকে কিছু ব'লে যায় নি ?

বিপিনের এ কথা বাস্তবিকই মনে হয় না। কামিনীর টাকা ছিল, সে শুনিয়াছে বটে ; কিন্তু তাহার মৃত্যুর সময়ে বা তাহার পরে এ কথা বিপিনের মনে উদয় হয় নাই যে, তাহার টাকাগুলি কোথায় রহিল বা সে টাকার কি ব্যবস্থা কামিনী করিতে চায়।

আর যদি থাকেই টাকা, তাহাতেই বা বিপিনের কি ? কামিনী বিপিনের নামে উইল করিয়া দিয়া যায় নাই, সুতরাং অত গরজ নাই বিপিনের কামিনীর টাকা কোথায় গেল তাহা জানিতে। মুখে বলিল, ছিল ব'লে জানতাম বটে, তবে আমায় কিছু ব'লে যায় নি। কেন বল তো ?

কথাটা বলিয়াই বুঝিল নরহরি যে প্রশ্ন করিয়াছে, তাহার বিশেষ অর্থ আছে। নরহরি বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাহার বাবার সঙ্গে কামিনীর সম্পর্ক যে কি ছিল, এ গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা সবাই জানে, কামিনীর টাকার যদি কেহ ন্যায্য ওয়ারিশন থাকে, তবে সে বিপিন। সেই বিপিন কামিনীর মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিল, অথচ টাকার কথা সে কিছু জানে না, পাড়াগাঁয়ে ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

—কামিনীর বাড়িডায় ভাল চাবিতালা লাগিয়ে দেবেন, নায়েব মশাই। রাতবিরেতের কাণ্ড, পাড়াগাঁ জায়গা। কখন কি হয়, কার মনে কি আছে, বলা তো যায় না। আচ্ছা, কাল আসব বেনবেলা। এখন যাই।

নরহরি চলিয়া গেলে বিপিন কথাটা ভাবিল। সিন্দুক তোরঙ্গ একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিবে। টাকাকড়ি এ সময় পাইলে কিছু সুবিধা ছিল বটে। কিন্তু বাক্স ভাঙিয়া টাকা হাতড়াইতে গেলে শেষে কি একটা হাঙ্গামায় পড়িয়া যাইবে! যদি কামিনীর কোন দূর সম্পর্কের ভাসুরপো বাহির হইয়া পড়ে, তখন? না, সে দরকার নাই। বরং মানীর সঙ্গে পরামর্শ করা যাইবে। তার কি মত জানিয়া তবে যাহা হয় করিলে চলিবে।

সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল বিপিনের জীবনে।

বিপিন কখনও কাহার জন্য চোখের জল ফেলে নাই। সে

এই দিক দিয়া বেশ একটু কঠোর প্রকৃতির মানুষ, কথায় কথায় চোখের জল ফেলিবার মত নরম মন নয় তাহার। আজ হঠাৎ একা বসিয়া কামিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মনে মনে সে একটু লজ্জিত হইয়া উঠিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভাবিয়াও আশ্চর্য্য হইল, কামিনী মাসীকে সে এতখানি ভালবাসিত!

আজ সে স্নেহময়ী বৃদ্ধা নাই, যে দুধের বাটি, কি লাউটা শসাটা হাতে আসিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে, দুটা মিষ্ট কথা বলিবে।

নিঃসঙ্গ ঘরের রোগশয্যায় একা মরিল, কেহ আপনার জন ছিল না যে একটু মুখে জল দেয়।

কে জানে, তাহার পিতা স্বর্গগত বিনোদ চাটুজ্জে পুরাতন বন্ধুর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অদৃশ্য চরণে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন কি না?

বুড়ী ভালবাসা কাহাকে বলে জানিত। বিনোদ চাটুজ্জে মহাশয় পরলোকগমন করিলে পর আর সে ভাল করিয়া হাসে নাই, ভাল করিয়া আনন্দ পায় নাই জীবনে।

তাহাকে ছুটিয়া দেখিতে আসিত এইজন্য যে, তাহার মুখে-চোখে হাবে-ভাবে স্বর্গীয় নায়েব মহাশয়ের অনেকখানি ফুটিয়া বাহির হয়। কর্ত্তা মহাশয়েরই ছেলে, কর্ত্তা মহাশয়ের তরুণ প্রতিনিধি। তাহার সঙ্গে দুইটা কথা কহিয়াও সুখ।

আজ সে বোঝে, এই যে মানীর সম্বন্ধে কথা বলিতে তাহার ইচ্ছা হয়, কাহারও সঙ্গে অন্তত কিছুক্ষণ সে কথা বলিয়াও সুখ, না বলিলে মন হাঁপাইয়া উঠে, দেখা তো হইতেছেই না, তাহার উপর তাহার সম্বন্ধে কথা না বলিলে কি করিয়া টিকিয়া থাকা যায়—এ রকম তো কামিনী মাসীরও হইত তাহার বাবার সম্বন্ধে!

অভাগিনী যে আনন্দ হয়তো পায় নাই প্রথম জীবনে, ৺বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়ের সাহচর্য্যে তাহা সে পাইয়াছিল। তাহার বঞ্চিতা নারী-হৃদয়ের সবটুকু কৃতজ্ঞতা প্রেমের আকারে ঢালিয়া দিয়াছিল তাই নায়েব মহাশয়ের চরণযুগলে। কি পাইয়াছিল, কি না পাইয়াছিল, আজ তাহা কে বুঝিবে? ত্রিশ বছর পরে কে বুঝিবে মানী তাহার জীবনে কি অমৃত পরিবেশন করিয়াছিল একদিন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

বেলা পড়িলে বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বাহিরের বৈঠকখানায় শ্যামহরি চাকর ঝাঁট দিতেছিল, বিপিন বলিল, বাবু কোথায় রে?

—রাণাঘাট গিয়েছেন আজ সকালবেলা। সন্দের সময় আসবেন ব'লে গিয়েছেন।

—রাণাঘাটে কেন?

—উকিলবাবু পত্তর দিয়েছেন, বলছিলেন গিন্নীমাকে—কি মামলার কথা আছে। আপনার কথাও হচ্ছিল।

—আমার কথা ?

—হ্যাঁ, বাবু বলছিলেন, ধোপাখালির কাছারি থেকে আপনি টাকা নিয়ে এলি আপনাকে রাণাঘাট পাঠাবেন। টাকার বড্ড দরকার নাকি—

—বাড়িতে কে কে আছেন ?

—গিন্নীমা আছেন, দিদিমণি আছেন। দিদিমণিকে নিতে আসবেন কিনা জামাইবাবু, তাই বাবু বলছিলেন আপনার নাম ক'রে, আপনি এই সময় টাকা নিয়ে এসে পড়লি ভাল হয়, খরচপত্তর আছে।

—ও। তা এর মধ্যে আসবেন বুঝি ?

—আজ্ঞে, পরশু বুধবারে তো শুনছিলাম আসবেন।

—বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। জামাইবাবুর সঙ্গে দেখাটা হ'য়ে যাবে এখন এই সময় তা হ'লে। তুই যা দিকি বাড়ির মধ্যে। গিন্নিমাকে বল, আমি এসেছি। আর আমার সঙ্গে টাকা রয়েছে কিনা। সেগুলো কি তাঁর হাতে দোব, না বাবু এলে বাবুকে দোব, জিজ্ঞেস ক'রে আয়।

শ্যামহরি বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার একটু পরেই স্থানীয় পুরোহিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি বৈঠকখানায় উঁকি দিয়া বলিলেন, কে ব'সে ? বিপিন ? বাবু কোথায় ?

বিপিন আশা করিতেছিল এই সময় অনাদিবাবু বাড়ি নাই, মানী তাহার আসিবার খবর শুনিয়া বৈঠকখানায় আসিতে পারে। কিন্তু মানীর পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ বটুক ভটচাজকে দেখিয়া বিপিনের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

মুখে বলিল, আসুন ভটচাজ মশাই, বাবু নেই, রাণাঘাটে গিয়েছেন মামলার তদারক করতে। কখন আসবেন ঠিক নেই, আজ বোধ হয় আসবেন না।

এই উত্তর শুনিয়া বুড়া চলিয়া যাইবে এই আশা করাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না গিয়া সে দিব্য জাঁকিয়া বসিয়া গেল। বিপিন প্রমাদ গণিল, বৃদ্ধ অত্যন্ত বকবক করে সে জানে, বকুনি পাইলে উঠিতে চায় না—মাটি করিল দেখিতেছি! বাহিরের ঘরে অন্য লোকের গলার আওয়াজ পাইলে মানী সেখানে পা দিবে না। অনাদিবাবু বাড়ি নাই—এমন ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে, সাধারণত তিনি কোথাও বাহির হন না। মানীও চলিয়া যাইতেছে, এমন একটা সুবর্ণ-সুযোগ যদি বা ঘটিল তাহার সহিত নির্জ্জনে দুইটা কথা বলিবার, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। বটুক ভটচাজ বলিল, মামলা? কিসের মামলা?

বিপিন উদাস নিস্পৃহ সুরে বলিল, আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারছি না। শুনলাম, উকিল সুরেনবাবু চিঠি লিখেছিলেন।

—সুরেন উকিল? কোন্ সুরেন? সুরেন মুখুজ্জে?

—আজ্ঞে না, সুরেন তরফদার।

—কালী তরফদারের ছেলে? সুরেন আবার কি হে! ওকে

আমরা পটলা ব'লে জানি। ছেলেবেলা থেকে ওদের বাড়িতে আমার যাতায়াত, অবিশ্যি আমি ক্রিয়াকর্ম্ম কখনও করি নি ওদের বাড়ি। শূদ্রযাজক হতে পারতাম যদি, তা হ'লে আজ এ দুর্দ্দশা ঘটত না। কিন্তু আমার কর্ত্তা মশায়ের নিষেধ আছে। তিনি মরবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন, বটুক, না খেয়ে কষ্ট যদি পাও, সেও ভাল, কিন্তু নারায়ণ-শিলা হাতে শূদ্দুরের বাড়ি কখনও ঢুকো না। আমাদের বংশে ও কাজ কখনও কেউ করে নি, বুঝলে?

বিপিন বলিল, হুঁ।

—তা সেই পটলা আজ উকিল হয়েছে, কালী তরফদার মারা যাওয়ার পর হাতে কিছু টাকাও আজকাল পেয়েছে শুনেছি। তা ছাড়া টাকা জমাতে কি ক'রে হয়, তা ওরা জানে। হাড় কঞ্জুষ ছিল সেই কালী তরফদার, তার ছেলে তো? ওদের আদি বাড়ি শান্তিপুর, তা জান তো? ওর জ্যাঠামশায় এখনও শান্তিপুরের বাড়িতেই থাকে। জমিজমা আছে শান্তিপুরে। বেশ বড় বাড়ি, দোমহলা।

—ওঁ।

—অনেকদিন আগে একবার শান্তিপুর গিয়েছি রাস দেখতে, ভারি যত্ন-আত্যি করলে আমাদের। শান্তিপুরের রাস দেখেছ কখনও? দেখবার মত জিনিস; অত বড় মেলা এ দিগরে হয় না কোথাও।

—ও।

—এখানে তামাক-টামাক দেবার কেউ নেই? বল না একটু ডেকে। আর একটু চা যদি হয়, কাউকে ব'লে পাঠাও না। আমি এসেছি শুনলেই বউমা চা পাঠিয়ে দেবেন। তবে শোন, একটা রাসের মেলার গল্প করি। সেবার হ'ল কি জান—ওই যে চাকরটা যাচ্ছে—ও শ্যামহরি, শোন্ একবার এদিকে বাবা, বাড়ির মধ্যে যা তো, বলগে, ভটচাজ্জি মশাই একটু চা খেতে চাইছেন, আর একবার এক কলকে তামাক দিয়ে যা তো বাবা। বিপিন চা খাবে কি? ও কি, উঠছ কোথায়? ব'স, ব'স।

—আজ্ঞে, আপনি ব'সে চা খান। আমি একটু তাগাদায় যাব ওপাড়ায়, বাবু ব'লে গিয়েছেন, কিছু টাকা পাওয়া যাবে, এখন না গেলে হবে না। সন্ধ্যে হয়ে এল। আমি আসি।

বিপিন বাহির হইয়া পড়িল। বটুক ভটচাজের সঙ্গে বসিয়া গল্প করা বর্ত্তমানে তাহার মনের অবস্থায় সম্ভব নয়!

সব নষ্ট হইয়া গেল। অনাদিবাবু সন্ধ্যার পরই আসিয়া পড়িবেন। তাহাকে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া মুখ বুজিয়া খাইতে হইবে; তাহার পর বৈঠকখানায় আসিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িতে হইবে। হয়তো সে সময়ে অনাদিবাবু গড়গড়া হাতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে জমিদারি সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিবেন, তাহাও শুনিতে হইবে। তারপর কাল সকালে আর সে কোন্ ছুতায় পলাশপুরে বসিয়া থাকিবে? তাহার তো আসার কথাই ছিল না। টাকা আনিবার ছুতায় সে আসিয়াছে।

টাকা ইরশালে ধরা হইয়া গিয়াছে, তাহার কাজও শেষ হইয়াছে। যাও চলিয়া ধোপাখালির কাছারি। মিটিয়া গেল।

বিপিন উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি করিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই। হয়তো এতক্ষণ অনাদিবাবু আসিয়া পড়িয়াছেন। আচ্ছা, সে একটু দেরি করিয়াই যাইবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর-ঘোর হইতে বিপিন ফিরিল। উঁকি মারিয়া দেখিল, বটুক ভটচাজ বৈঠকখানায় বসিয়া আছে কি না। না, কেহই নাই। অনাদিবাবুও আসেন নাই, কারণ উঠানে তাহা হইলে গরুর গাড়ি থাকিতে। বাড়ির গরুর গাড়ি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই ফিরিবেন।

গাড়ি উঠানে না দেখিয়া বিপিন যে খুব আশ্বস্ত হইল, তাহা নয়। আসেন নাই বটে, কিন্তু আসিলেন বলিয়া। আর বেশি দেরি হইবার কথা নয়, দুই ক্রোশ পথ গরুর গাড়ি আসিতে।

বিপিন বৈঠকখানায় ঢুকিয়া গায়ের জামাটা খুলিবার আগে একটুখানি বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় অন্দরের দিকের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল—মানী।

বিপিনের সারা দেহে যেন বিদ্যুতের মত কি একটা খেলিয়া গেল। সে কিছু বলিবার পূর্বেই মানী বলিল, আচ্ছা, কি কাণ্ড বল তো বিপিনদা? এলে সেই ধোপাখালি থেকে তেতে পুড়ে—শ্যামহরি চাকর গিয়ে বললে—চা ক'রে নিয়ে আসছি, এসে দেখি ভটচাজ জ্যাঠামশাই ব'সে আছেন, তুমি নেই। ভটচাজ

জ্যাঠামশাই বললেন, কোথায় তাগাদায় বেরুলে এইমাত্র। তারপর ছুবার এসে খুঁজে গেলাম—কোথায় কে ? এলে—চা খাও, জিরোও, তারপর তাগাদায় গেলে হ'ত না কি ? প্রজারা পালিয়ে যাচ্ছে না তো।

বিপিনের মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল মানীকে দেখিয়া, আমতা আমতা করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়—তা বেশ ভাল—কাকা কি রাণাঘাটে—

মানী বলিল, দাঁড়াও, আগে তোমার চা আর খাবার আনি

মানী কথাটা ভাল করিয়া শেষ না করিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিপিন দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, মানী, শোন শোন, যাস নি, ছুটো কথা বলি আগে, দাঁড়া।

মানী বলিল, দাঁড়াচ্ছি, চা-টা আনি আগে। কতক্ষণ লাগবে ? স্টোভ ধরাব আর করব। আগে যে চা ক'রে দিলুম তা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

আবার সে চলিয়া যায়। এদিকে অনাদিবাবুও আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। হঠাৎ বিপিন বেদনাপূর্ণ আকুল মিনতির সুরে বলিল, মানী, চা আমি খাব না। তুই যাস নি, একবার আমার কথা শোন্। তুই চা আনতে যাস নি।

মানী বিস্মিত হইয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল কেন বিপিনদা ? চা খাবে না কেন ? কি হয়েছে তোমার ? অমন করছ কেন ?

বিপিন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল, সত্যই তাহার কণ্ঠস্বরটা তাহার নিজের কানেই স্বাভাবিক শোনায় নাই। কিন্তু সে কি করিবে? মেয়েমানুষ কি কথা শোনে? চা আনিবার ঝোঁক যখন করিয়াছে, তখন চা সে আনিবেই। খোপাখালি হইতে পথ হাঁটিয়া বিপিন এখানে চা খাইতে আসিয়াছিল?

নিজেকে খানিকটা সংযত করিয়া লইয়া বলিল, মানী, যাস নি।

মানী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—অনেকদিন তোকে দেখি নি, কথাও বলি নি, এলি আর চ'লে যাবি চা করতে? চা কি এত ভাল জিনিস যে, না খেলে দিন যাবে না। আমি যেতে দোব না তোকে। এখানে দাঁড়িয়ে থাক।

মানী শান্ত স্বরে মৃদু হাসিমুখে বলিল, বিপিনদা, মেয়েমানুষের একটা কর্ত্তব্য আছে। তুমি তেতে পুড়ে এসেছ রাস্তা হেঁটে, আর আমি তোমার মুখে একটু জল দেবার ব্যবস্থা না ক'রে সঙের মত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব—এ হয় না। তুমি একটু ব'স, আমি আগে চা আনি, খেয়ে যত খুশি গল্প ক'র। আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আমারও কি ইচ্ছে নয় তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবার?

মিনিট পনরো—প্রত্যেক মিনিট এক একটি ঘণ্টা দীর্ঘ—কাটিয়া গেল। মানীর তবুও দেখা নাই।

অনাদিবাবু কি আসিলেন? বাহিরে গরুর গাড়ীর শব্দ হইল না? না, কিছু নয়। অন্য গরুর গাড়ি রাস্তা দিয়া যাইতেছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে মানী আসিল। একটা থালায় খানকতক পরটা, একটু আলু-চচ্চড়ি, একটু গুড়। বিপিনের সামনে থালা রাখিয়া বলিল, ততক্ষণ খাও, আমি চা আনি। কতকক্ষণ লাগল? এই তো গিয়ে ময়দা মেখে বেলে ভেজে নিয়ে এলুম। চায়ের জল ফুটছে, এখুনি আনছি ক'রে। সব কখানা কিন্তু খাবে, নইলে রাগ করব, আস্তে আস্তে খাও।

বিপিনের সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। পরটা কয়খানা সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল।

অনাদিবাবু বুঝি আসিলেন? গরুর গাড়ির শব্দ না?

চা করিতে এত সময় লাগে? কত যুগ ধরিয়া মানী কেটলিতে চায়ের জল ফুটাইতেছে—যুগ যুগান্তর ধরিয়া চায়ের জল ফুটিতেছে।

মানী আসিল। এক পেয়ালা চা এক হাতে, অন্য হাতে একটি ছোট খাগড়াই কাঁসার রেকাবে পান।

—কই, দেখি কেমন সব খেয়েছ? বেশ, লক্ষ্মী ছেলে। এই নাও চা, এই নাও পান।

বিপিন হাসিয়া বলিল, ভারী খিদে পেয়েছিল, সত্যি বলছি। আঃ, চা-টুকু যে কি চমৎকার লাগছে!

মানী বলিল, মুখ দেখে বুঝতে পারি বিপিনদা। তোমার

যে অনেকক্ষণ খাওয়া হয় নি, তা যদি তোমার মুখ দেখে বুঝতে না পারলুম, তবে আবার মেয়েমানুষ কি ?

—দাঁড়িয়ে কেন, ব'স ওই চেয়ারখানায়। ভাল কথা, কাকা তো এখনও এলেন না ?

—বাবা ব'লে গিয়েছিলেন কাজ সারতে পারলে আজ আসবেন, নয়তো কাল আসবেন। বোধ হয় আজ এলেন না, এলে এতক্ষণ আসতেন।

ওঃ, এত কথা মানীর পেটে ছিল, মানী জানিত যে বাবা আজ ফিরিবেন না, তাই সে নিশ্চিন্ত মনে চা ও খাবার করিতে গিয়াছিল ! আর মূর্খ সে ছটফট করিয়া মরিতেছে !

সে বলিল—মানী, তুই অমন ভাবে চিঠি আর আমায় পাঠাসনে। পাড়াগাঁ জায়গার ভাব তুমি জান না, থাক কলকাতায়, যদি কেউ দেখে ফেলে বা জানতে পারে, তাতে নানা রকম কথা ওঠাবে। তোমার সুনাম বজায় থাকে এটা আমি চাই। কেউ কোন কথা তোমাকে এই নিয়ে বললে আমি তা সহ্য করতে পারব না মানী।

মানী বলিল, আমাদের চাকরের হাতে দিয়েছিলুম, সে নিজে চিঠি পড়তে পারে না। তার কাছ থেকে নিয়েই বা কে পড়বে পরের চিঠি, আর তাতে ছিলই বা কি ?

—তুমি আমায় আসতে বলছ এ কথাও তো আছে। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, ওর অনেক রকম মানে বার করত। দরকার কি সে গোলমালের মধ্যে গিয়ে ?

মানী চুপ করিয়া শুনিল, তারপর গম্ভীর মুখে বলিল, শোন বিপিনদা, আমিও একটা কথা বলি। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, তার কি মানে বার করত আমি জানি। তারা বলত, আমি তোমায় দেখতে চেয়েছি, তোমায় নিশ্চয়ই ভালবাসি তবে। এই তো?

বিপিন অবাক হইয়া মানীর মুখের দিকে চাহিল। মানী এমন কথা মুখ ফুটিয়া কোনদিন বলে নাই। কোন মেয়ে কখন বলে নাই। 'তোমাকে ভালবাসি' অতি সংক্ষিপ্ত, অতি সামান্য কয়েকটি কথা, কিন্তু এই কথা কয়টির কি অদ্ভুত শক্তি, বিশেষত যখন সেই মেয়েটির মুখ হইতে এ কথা বাহির হয়, যাহাকে মনে মনে ভাল লাগে। প্রণয়পাত্রীর মুখে এই স্পষ্ট সহজ উক্তিটি শুনিবার আশ্চর্য্য ও দুর্লভ অভিজ্ঞতা বিপিনের জীবনে এই প্রথম হইল।

মানীর উপরে সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরণের স্নেহ ও মায়াও হইল। এতদিন যেন সেটা মনের কোণেই প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু বাহিরে ফুটিয়া প্রকাশ পায় নাই। ওগো কল্যাণী, এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তোমারই দান, বিপিন সেজন্য চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মানী বলিল, বিপিনদা, কথা বললে না যে? ভাবছ বোধ হয়, মানীটা বড্ড বেহায়া হয়ে উঠেছে দেখছি, না?

বিপিন তখনও চুপ করিয়া রহিল। সে অন্য কথা ভাবিতেছিল, মানীর বিবাহিত জীবন কি খুব সুখের নয়? স্বামীকে কি তাহার মনে ধরে নাই?

খুব সম্ভব। বেচারী মানী! অনাদিবাবু বড় ঘরে বিবাহ দিতে গিয়া মানীর ভাল লাগা-না-লাগার দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, মেয়েকে ভাসাইয়া দিয়াছেন হয়তো ধনীর সহিত কুটুম্বিতার লোভে!

মানী মৃদু হাসিমুখে বলিল, রাগ করলে বিপিনদা?

বিপিন বলিল, রাগের কথা কি হয়েছে যে রাগ করব? কিন্তু আমি ভাবছি মানী, তোর মত মেয়ে আমার ওপর—ইয়ে—একটুও স্নেহ দেখাতে পারে, এর মানে কি? আমার কোন্ কথা তোর কাছে না বলেছি। কি চরিত্রের মানুষ আমি ছিলাম, তুই তো সব জানিস। সে হীনচরিত্রের লোককে তোর মত একটা শিক্ষিতা ভদ্র মেয়ে যে এতটুকু ভাল চোখে দেখতে পারে, সেইটেই আমার কাছে বড় আশ্চর্য্য মনে হয়।

মানী বলিল, থাক ও কথা বিপিনদা।

বিপিনের যেন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছিল, সে আপন মনে বলিয়াই চলিল, না মানী, আমার মনে হয়, আমার সব কথা তুই জানিস্‌নে। কি ক'রেই বা জানবি, ছেলেবেলার পর আর তো দেখা হয়নি! তোকে সব কথা বলি। শুনেও যদি মনে হয়, আমি তোর স্নেহের উপযুক্ত, তবে স্নেহ করিস, ধন্য হয়ে যাব। আর যদি—

মানী বলিল, আমি শুনতে চাইছি বিপিনদা?

—না, তোকে শুনতে হবে। তুমি আমাকে ভারী সাধুপুরুষ ভেবে রেখেছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারব না। রাণাঘাটে

বা বনগাঁয়ে এমন কোন কুস্থান নেই, যেখানে আমি যাতায়াত করিনি। মদ খেয়ে বাবার বিষয় উড়িয়েছি, স্ত্রীর গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে অন্য মেয়েমানুষের আবদার রেখেছি। যখন সব গেল, মদ জোটেনি, তাড়ি খেয়েছি, হয়তো চুরি পর্যান্ত করতাম, কিন্তু নিতান্ত ভদ্রবংশের রক্ত ছিল ব'লেই হোক বা যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত করা হয়নি! তাও অন্য কিছু চুরি নয়, একখানা শাড়ি। শামকুড় পোস্ট-আপিসের বারান্দায় শাড়িখানা শুকুতে দেওয়া ছিল, বোধ হয় পোস্ট-মাস্টারের স্ত্রীর। আমার হাতে পয়সা নেই, শাড়িখানা নতুন আর বেশ ভাল, একজনকে দিতে হবে। সে চেয়েছিল, কিন্তু কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। চুরি করবার জন্যে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরলাম, পাড়াগাঁয়ের ব্রাঞ্চ পোস্ট-আপিস, পোস্ট-মাস্টার আপিস বন্ধ ক'রে স্কুলে পড়াতে গিয়েছে। কেউ কোন দিকে নেই! একবার গিয়ে এক দিকের গেরো খুললাম—

মানী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, তুমি চুপ করবে, না আমি এখান থেকে চ'লে যাব ?

—না শোন, ঠিক সেই সময় একটা ছোট মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা বাঁধানো পুকুর ঘাট। মেয়েটাকে দেখে আমি ডাকঘরের রোয়াক থেকে নেমে বাঁধাঘাটে গিয়ে বসলাম। মেয়েটা চ'লে গেল, আমি আবার গিয়ে উঠলাম রোয়াকে। এবার কাপড় নেবোই এই রকম ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, ছিঃ, আমি না বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে ?

আমার বাবা কত গরিব দুঃখী লোককে কাপড় বিলিয়েছেন আর আমি কিনা একখানা অপরের পরনের কাপড় চুরি করছি? তখন যেন ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেল, ঠিক সেই সময় বাড়ির মধ্যে থেকে একটা ছেলে বার হয়ে এসে বললে, কাকে চান? বললাম, খাম কিনতে এসেছি। খাম পাব? ছেলেটা বললে, না, ডাকঘর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন চ'লে এলাম সেখান থেকে।

মানী বলিল, বেশ করেছিলে, খুব বাহাদুরি করেছিলে। নিজের আর নিজের গুণ ব্যাখ্যায় দরকার নেই, থাক। আমার দেওয়া বইগুলো পড়েছিলে?

—ওই যে বললাম, সব পড়া হয় নি। 'দত্তা'খানা পড়েছি, বেশ চমৎকার লেগেছে।

—'শ্রীকান্ত' পড়নি?

—সময় পাইনি। সেখানা আনিওনি সঙ্গে, এর পর পড়ব ব'লে রেখে এসেছি কাছারিতে। 'দত্তা'খানা ফেরত এনেছি।

—তোমার কাছে সবই রেখে দাও না, মাঝে মাঝে প'ড়। একলাটি থাক কাছারিতে। আমার সঙ্গে আরও যে সব বই আছে, যাবার সময় তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি সেখানে প'ড় ব'সে ব'সে। আচ্ছা, বল তো বিজয়া কে?

বিপিন হাসিয়া বলিল, ও! এগজামিন করা হচ্ছে বুঝি? মাস্টারনী এলেন আমার।

মানী কৃত্রিম রাগের সুরে অথচ ঈষৎ লাজুক ভাবে বলিল, আবার! উত্তর দাও আমার কথার।

—বিজয়া তোমার মত একটি জমিদারের মেয়ে।

—তারপর ?

—তারপর আবার কি ? নরেনের সঙ্গে তার ভালবাসা হ'ল।—কথাটা বলিয়াই বিপিনের মনে হইল মানী পাছে কি ভাবে, কথাটা বলা উচিত হয় নাই, মানীও তো জমিদারের মেয়ে! 'তোমার মত' কথাটা না বলিলেই চলিত। কিন্তু মানীর মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না। সে বেশ সহজ ভাবেই বলিল, মনে হচ্ছে, পড়েছ। ভাল, পড়লে মানুষ হয়ে যাবে। এইবার রবি ঠাকুরের 'চয়নিকা' ব'লে কবিতার বই আছে, সেখানা থেকে কবিতা মুখস্থ কর। খুব ভাল ভাল কবিতা।

বিপিন খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, কবিতা আবার মুখস্থও করতে হবে। উঃ, তুই হাসালি মানী, পাঠশালায় ইস্কুলে যা কখনও হ'ল না, উঃ, এই বুড়ো বয়সে বলে কি না, হি-হি, বলে কি না—

হাঁ, মুখস্থ করতে হবে। আমার হুকুম। শুনতে বাধ্য তুমি। মানুষ বলে যদি পরিচয় দিতে চাও তবে তা' দরকার। য়া বলি তাই শোন, হাসি খুশি তুলে রাখ এখন—

কিন্তু অত্যন্ত কৌতুকের প্রাবল্যে বিপিনের হাসি তখনও থামিতে চায় না। মানী মাস্টারনী সাজিয়া তাহাকে কবিতা মুখস্থ করাইতেছে—এই ছবিটা তাহার কাছে এতই আমোদজনক মনে হইল যে, সে হাসির বেগ তখনও থামাইতেই পারিল না।

এবার মানীও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বড্ড হাসির কথাটা কি যে হ'ল তা তো বুঝিনে। আমার কথাগুলো কানে গেল, না গেল না?

—খুব গিয়েছে। আচ্ছা, তোর কবিতা মুখস্থ আছে?

—আছেই তো। 'চয়নিকা'র আদ্ধেক কবিতা মুখস্থ আছে।

—সত্যি? একটা বল না?

—এখন কবিতা বলবার সময় নয়। আর বললেই বা তুমি বুঝবে কি ক'রে, হয়েছে কি না? তুমি তো জান ঢেঁকি, কি ক'রে ধরবে?

—তাতেই তো তোর সুবিধে, যা খুশি বলবি, ধরবার লোক নেই।

মানী মুখে কাপড় দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ওমা, কি দুষ্টু বুদ্ধি!

—তবে বল একটা শুনি।

—শুনবে? তবে শোন। দাঁড়াও কেউ আসছে কি না দেখে আসি, আবার বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে কবিতা বলছি শুনলে কে কি মনে করবে!

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া মানী স্কুলের ছাত্রীর কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া সুরু করিল—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ও গো মরণ হে মোর মরণ!

বিপিন হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি! মানীর কি চোখ মুখের ভাব, কি হাত পা নাড়ার কায়দা! যেন থিয়েটারের

অ্যাকটো করিতেছে। অথচ হাসিবার জো নাই, মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে শান্ত ছেলেটির মত। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! মানীটা চিরদিনই একটু ছিটগ্রস্ত।

কিন্তু খানিকটা পরে মানীর আবৃত্তি বিপিনের বড় অদ্ভুত লাগিতে লাগিল।—

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন, ও গো মরণ হে মোর মরণ!

এই জায়গাটাতে যখন মানী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন বিপিনের হাসিবার প্রবৃত্তি আর নাই, সে তখন আগ্রহের সঙ্গে মানীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাঃ, বেশ লাগিতেছে তো পদ্যটা! মানী কি চমৎকার বলিতেছে! অল্পক্ষণের জন্য মানী বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার চোখে মুখে অন্য এক রকমের ভাব। কবিতা যে এমন ভাবে বলা যাইতে পারে, তাহা সে জানিত না, কখনও শোনে নাই।

—বাঃ, বেশ, খাসা। চমৎকার বলতে পারিস তো?

মানী যেন একটু হাঁপাইতেছে। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে, বড় কষ্ট হয় পদ্য আবৃত্তি করিতে, বিশেষত অমনি হাত পা নাড়িয়া। ভারী সুন্দর দেখাইতেছে মানীকে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে, একটু রাঙা হইয়াছে মুখ, বুক ঈষৎ উঠিতেছে নামিতেছে। এ যেন মানীর অন্য রূপ, এ রূপে কখনও সে মানীকে দেখে নাই।

—নেবু খাবে বিপিনদা?

—কি নেবু?

—কমলানেবু, সেদিন কলকাতা থেকে এক টুকরি এসেছে। দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

—যাস নি মানী, তুই চ'লে গেলে আমার নেবু ভাল লাগবে না।

মানী যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাজে কথা ব'ল না বিপিনদা।

বিপিন হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, বাজে কথা কি বললাম ?

—বাজে কথা ছাড়া কি ? যাক, দাঁড়াও, নেবু আনি।

মানী একটু পরে দুইটি বড় বড় কমলানেবু ছাড়াইয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া যখন হাজির করিল, বিপিনের তখন নেবু খাইবার প্রবৃত্তি আদৌ নাই, অভিমানে তাহার মন বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে।

সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, নেবু আমি খাব না। নিয়ে যা।

—কি, রাগ হ'ল অমনিই ? তোমার তো পান থেকে চূন খসবার জো নেই, হ'ল কি ?

—না না, কিছু হয় নি, তুই যা। মিটে গেল গণ্ডগোল।

—কেন, কি হয়েছে বল না ?

—আমার সব কথা বাজে। আমার কথা তোর কি শুনতে ভাল লাগে ? আমি যখন বাজে লোক তখন তো বাজে কথা বলবই। তবে ডেকে এনে অপমান করা কেন ?

মানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে বলিল, দেখ বিপিনদা, আমি যা ভেবে বলেছি, তা যদি তুমি বুঝতে

পারতে, তবে এমন কথা ভাবতে না বা বলতেও না। তোমার কথাকে কেন বাজে কথা বলেছি, তা বুঝবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তোমার ঘটে থাকলে কথায় কথায় অত রাগও আসত না।

বিপিন চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়, বলিল, জানিস তো আমার মোটা বুদ্ধি, তবে আর—

মানী পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে বলিল, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই এখন আমার, তুমি বস। কমলা-নেবু এই রইল, খাও তো খেও, না খাও রেখে দিও, শ্যামহরি এসে নিয়ে যাবে, আমি চললুম।

কথা শেষ করিয়া মানী এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না।

২

বিপিন কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের তাহার মনের সে আনন্দ আর নাই, জগৎটা যেন এক মুহূর্ত্তে বিস্বাদ হইয়া গেল। মানী এমন ধরণের কথা কখনও তাহাকে নাই। মেয়েমানুষ সবই সমান, যেমন মানী তেমনই মনোরমা। মিছামিছি মনোরমার প্রতি মনে মনে সে অবিচার করিয়াছে। মানীও রাগী কম নয়, এখন দেখা যাইতেছে। স্বরূপ কি আর দুই একদিনে প্রকাশ হয়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়। যাক। ওসব কথায় দরকার নাই। সে আজই—এখনই ধোপাখালি কাছারিতে ফিরিবে। কত রাত আর

হইয়াছে! সাতটা হয়তো। দুইঘণ্টা জোর হাঁটিলে রাত নয়টার মধ্যে খুব কাছারি পৌঁছানো যাইবে। কমলানেবু খাওয়ার দরকার নাই আর।

কিন্তু একটা মুস্কিল হইয়াছে এই, অনাদিবাবু এখনও রাণাঘাট হইতে ফিরিলেন না। সঙ্গে যে টাকা আছে, তাহা ইরশাল না করিয়া কি ভাবে যাওয়া যায়? সে আসিয়া কেন চলিয়া গেল হঠাৎ, না খাইয়া রাত্রিবেলাতেই চলিয়া গেল, একথা যদি অনাদিবাবু জিজ্ঞাসা করেন, তখন সে কি জবাব দিবে? তাঁহার মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—একথা তো বলিতে পারিবে না!

বিপিন ঠিক করিল, আর একটু অপেক্ষা করিয়া সে দেখিবে অনাদিবাবু আসেন কিনা। দেখিয়া যাওয়াই ভাল। বাড়ির মধ্যে মানীর মায়ের কাছে টাকা দেওয়া চলে না, তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন এত রাত্রে সে না খাইয়া কেন কাছারি ফিরিবে? যাইতে দিবেন না, পীড়াপীড়ি করিবেন। সব দিকেই বিপদ।

মানী কেন ও কথা বলিল? বড্ড হেঁয়ালির ধরণের কথাবার্ত্তা বলে আজকাল। কি গূঢ় অর্থ না জানি উহার মধ্যে নিহিত আছে! আছে থাকুক, গূঢ় অর্থ মাথায় থাকুক, সে এখন চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও অনাদিবাবু আসিলেন না। রাত নয়টা বাজিয়া গেল, পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে খাওয়া দাওয়া চুকিয়া যায়। একবার শ্যামহরি চাকর আসিয়া

বলিল, মা ব'লে পাঠালেন আপনি একা খেয়ে নেবেন, না বাবু এলে খাবেন ?

বিপিন বলিল, বলগে বাবু এলে খাব এখন একসঙ্গে। কিন্তু রাত দশটা বাজিয়া গেল, তখনও অনাদিবাবুর দেখা নাই। অগত্যা সে বাড়ির মধ্যে একাই খাইতে গেল।

মানীর মা পরিবেশন করিতেছিলেন, মানী সেখানে নাই। বিপিনের মন ভাল ছিল না, সে অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল। যেন খাওয়া শেষ করিতে পারিলে বাঁচে।

মানীর মা বলিলেন, বিপিন, টাকাকড়ি কিছু এনেছ নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ খুড়ীমা, কাকাবাবু তো এলেন না রাণাঘাট থেকে, আমি কাল খুব ভোরে চ'লে যাব ধোপাখালি কাছারি। টাকা আপনি নিয়ে রাখুন। খেয়ে উঠে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কাল সকালেই কাছারি যাবে কেন ? কর্ত্তার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না ? তিনি ব'লেই গিয়েছিলেন, আজ যদি না আসেন, কাল নিশ্চয়ই আসবেন সকালে আটটার মধ্যে।

—আমার থাকা হবে না খুড়ীমা, কাজ আছে।

—কাল জামাই আসবেন মানীকে নিতে, এদিকে দেখ বাবা, মেয়ের কি হয়েছে সন্ধ্যের পর থেকে। ওপরে শুয়ে আছে, খাইনি দাইনি। ওর আবার কি যে হ'ল! এদিকে কর্ত্তা নেই বাড়ি, তুমি যাচ্ছ চ'লে, আমি আথান্তরে প'ড়ে যাব তা হ'লে।

বিপিন ভাতের গ্রাস হাতে তুলিয়াছিল, মুখে না দিয়া সেই অবস্থাতেই মানীর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইতে বলিল, কি হয়েছে মানীর ?

—কি হয়েছে কি জানি বাবা। ডুবার ওপরে গেলাম, বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে, উঠলও না। বললে, আমার শরীর ভাল না, রাত্তিরে খাব না কিছু। বললুম, একটু গরম দুধ খাবি ? বললে তাও খাবে না। কি জানি বাবা, কিছুই বুঝলুম না। একালের ধাতের মেয়ে, ওদের কথা আদ্ধেক থাকে পেটে, আদ্ধেক মুখে, কি হয়েছে না হয় বল, তাও বলবে না।

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল বটে, কিন্তু নিদ্রা যাইবার এতটুকু ইচ্ছা মনে জাগিল না। মানীর মনে নিশ্চয়ই সে কষ্ট দিয়াছে, মানীর অসুখবিসুখ কিছুই নয়, বাহিরের ঘর হইতে গিয়াই সে উপরের ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। কেন ? কি বলিয়াছিল সে মানীকে ? সে চলিয়া গেলে নেবু ভাল লাগিবে না—এই কথার মধ্যে প্রেমনিবেদনের গন্ধ পাইয়া কি মানী নিজেকে অপমা[illegible] মনে করিয়াছে ? কিন্তু এ ধরণের কথা সে তো ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার মানীকে বলিয়াছে, তাহাতে তো মানী চটে নাই !

বিপিনের মন বলিল এ কারণ আসল কারণ নয়। অন্য কোনও ব্যাপার আছে ইহার মধ্যে। তা ছাড়া মানীর অত

যত্নে দেওয়া নেবু সে খাইতে চাহে নাই, রাগের মাথায় অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মানীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল। ছিঃ ছিঃ, কি অন্যায় সে করিয়া বসিয়াছে! মানীর মত তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিনী জগতে খুব বেশি আছে কি?

রাত তিনটা পর্য্যন্ত বিপিনের ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে যদি এখনই একবার দেখা হইত! সত্যই, সে বড় আঘাত দিয়াছে মানীর মনে। মানীর নিকট ক্ষমা না চাহিয়া সে ধোপাখালি যাইতে পারিবে না। কে জানে হয়তো এই মানীর সঙ্গে শেষ দেখা। এ চাকরি কবে আছে, কবে নাই। আজ সে অনাদিবাবুর নায়েব, কালই সে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। মানী হয়তো কতদিন এখন আর আসিবে না। অনুতাপের কাঁটা চিরদিন ফুটিয়া থাকিবে বিপিনের মনে।

সকাল হইলে যে-কোন ছুতায় মানীর সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। না হয়, তুপুরে আহারাদি করিয়া কাছারি রওনা হইলেই চলিবে এখন। মানীর মনের কষ্ট না মুছাইয়া সে এ স্থান ত্যাগ করিবে না।

৩

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। শেষরাত্রের দিকে বিপিনের ঘুম আসিয়াছিল, কাহাদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মুছিতে মুছিতে উঠানের

দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানা গরুর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান একটা হারিকেন লণ্ঠন উঁচু করিয়া হাঁকডাক করিতেছে, অনাদিবাবু ছইয়ের ভিতর হইতে নামিতেছেন।

শ্যামহরি চাকরও বৈঠকখানায় শোয়, বিপিন তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। অনাদিবাবু বিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে বিপিন! তোমার কথাই ভাবছিলাম। বড্ড জরুরি কাজে রাণাঘাট যেতে হবে তোমাকে কাল সকালেই। আজ রাত্রেই তোমায় কাগজপত্র দিয়ে দিই, কাল বেলা আটটার মধ্যে উকিল-বাড়ি দাখিল ক'রে দিতে হবে। ভাবছিলাম কাকে দিয়ে পাঠাই। তুমি এ সময়ে এসে পড়েছ, খুব ভাল হয়েছে। ব'স, আমি আসছি ভেতর থেকে। সেখান থেকে বেরিয়েছি রাত দশটার পরে। নতুন গরু, চলতে পারে না পথে, এখন রাত তো প্রায় ভোর। আঃ, কি কষ্টই গিয়েছে সারা রাত!

বাড়ির ভিতর হইতে তখনই ফিরিয়া অনাদিবাবু বিপিনকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি, তুমিও শোও। এখনও ঘণ্টা দুই রাত আছে। ভোরে উঠে চ'লে যেও। যদি উকিলবাবু ছেড়ে দেন, তবে কাল ওখানে খাওয়াদাওয়া ক'রে বিকেল নাগাৎ এখানে চ'লে এস। কাল আবার আমার মেয়েকে নিতে জামাই আসছেন কলকাতা থেকে, পার তো কিছু মিষ্টি এন সাধুচরণ ময়রার দোকান থেকে। এই একটা টাকা নিয়ে যাও।

খুব ভোরে উঠিয়া বিপিন রাণাঘাট রওনা হইল। যাইবার

সময় সারাপথ খুব ভোরে উঠিয়া চাষারা জমি নিড়াইতেছে। এবার বৈশাখের প্রথমে বৃষ্টি হইয়া ফসল বুনিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, এখন বৃষ্টি আদৌ নাই, জমিতে জমিতে নিড়ানি দেওয়া চলিতেছে। হয়তো এবার জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বর্ষা নামিবে—এই ভয়ে চাষারা শীঘ্র শীঘ্র ছাঁটার কাজ শেষ করিতে চায়। সারাপথ দুইধারে মাঠে ধান-পাটের ক্ষেতে চাষারা জমি নিড়াইতেছে।

ভোরের অতি সুন্দর মিষ্ট বাতাস। মাঠে ও পথের ধারে ছোট বড় গাছে সোঁদালি ফুলের ঝাড় ঝুলিতেছে, বিশেষ করিয়া কানসোনার মাঠে। রেলের ফটক পার হইয়া আবাদ তত নাই, ফাঁকা মাঠের মধ্যে চারিধারে শুধুই সোঁদালি ফুলের গাছ।

কলাধরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বিপিন একবার তামাক খাইবার জন্য বসিল। প্রতিবার রাণাঘাট হইতে যাতায়াতের পথে এইটা তাহার বিশ্রামের স্থান। বিশ্বাসদের বাড়ির সকলেই বিপিনকে চেনে। বিশ্বাসদের কর্তা রাম বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পাটের দড়ি পাকাইতে ব্যস্ত ছিলেন। বিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে আসুন চাটুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। আজ যে বড্ড সকালে রাণাঘাট চলেছেন, মোকদ্দমা আছে না কি? উঠে বসুন ভাল হয়ে। একটু চা ক'রে দিক?

—না না, চায়ের দরকার নেই। একটু তামাক খাই বরং।

—আরে, তামাক তো খাবেনই, চা একটু খান। অত

সকালে তো চা খেয়ে বেরোননি? এখন সাতটা বাজে, আমিও তো চা খাব। বসুন, চার ক্রোশ রাস্তা হেঁটেছেন এর মধ্যে, কষ্ট কম হয়েছে? একটু জিরোন।

মানীর সঙ্গে ফিরিয়া আজ দেখা হইবে কি? আর দেখা হওয়া সম্ভবও নয়। দেখা হইলেও কথাবার্ত্তা তেমন ভাবে হইবে না। জামাইবাবু আসিবেন, কর্ত্তা বাড়ি রহিয়াছেন। তবুও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিশ্বাস মহাশয় চা ও মুড়ি আনিয়া দিলেন। বিপিন খাইতে খাইতে বলিল, এবার পাট ক বিঘে বুনলেন বিশ্বেস মশায়?

—তা ধরুন, প্রায় বারো চোদ্দ বিঘে হবে। বুনলে কি হবে, খরচা পোষায় না, দশ টাকা করে ছুটো কৃষাণ, তা বাদে জোনমজুর তো আছেই। পাটের দর তো উঠল না। ওই দেখুন ছত্রিশ সালে পাটের দর ভাল পেয়ে উত্তরের পোঁতায় বড় ঘরখানা তুলতে গিয়েছিলাম, আদ্ধেক গাঁথুনি হয়ে দেখুন প'ড়ে আছে, আর দর পেলাম না, তা কি হবে?

—আপনার বড় ছেলে কোথায়?

—সে ওই বীজপুরে কারখানায় ত্রিশ টাকা মাইনেয় ঢুকেছে, রং মিস্ত্রী। আমি বলি, ও কেন, বাড়িতে এসে ফলাও ক'রে চাষ-বাস লাগা। মেসে খায়, একটু দুধ ঘি পেটে যায় না, শরীর মাটি। ওমাসে বাড়ি এসেছিল, আমার স্ত্রী এক বোতল ঘরের গাওয়া ঘি সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে আবার।

ঐ খাটুনি, দুধ ঘি না খেলে শরীর থাকে? উঠলেন? ফিরবার পথে পায়ের ধূলো দিয়ে যাবেন। না হয় এখানেই ফিরবার সময় দুটো স্বপাকে আহার ক'রে যাবেন এখন।

—না না, আমি সেখানেই খাব। উকিলের কাজ মিটতে বেলা এগারোটা বাজবে। তারপর হয়তো একবার কোর্টেও যেতে হবে স্ট্যাম্পভেণ্ডারের কাছে। ফিরতে তো তিনটের কম হবে না। আচ্ছা, আসি।

—আজ্ঞে আসুন, প্রণাম হই।

রাণাঘাট কোর্টে বিপিনের স্বগ্রামের নিবারণ মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা। নিবারণ মুখুজ্জে বিপিনকে দূর হইতে দেখিয়া কাছে আসিলেন, বিপিন প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

—কে বিপিন? কোর্টে কাজে এসেছিলে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকা। আপনি?

—আমিও এসেছিলাম একবার একটা কাগজের নকল নিতে। আমার আবার একটু ব্রহ্মোত্তর জমি নদীয়ার এলাকায় পড়ে কিনা? সেজন্যে রাণাঘাট ছুটোছুটি করতে হয়। হাঁ, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে বাবা। দেখা হ'ল ভালই হ'ল। একটু আড়ালের দিকে চল যাই, গোপনীয় কথা।

বিপিন একটু কৌতূহলী হইয়া নিবারণ মুখুজ্জের সহিত লোকজন হইতে একটু দূরে গেল।

—বাবা, কথাটা খুব গুরুতর। তোমার বাড়ির সম্বন্ধেই

কথা। তুমি থাক বারো মাস বিদেশে, নিশ্চয়ই তোমার কানে এখনও ওঠেনি। বড্ড গুরুতর কথা আর বড় দুঃখের কথা।

বিপিন আশঙ্কায় উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল। বাড়ির সম্বন্ধে কি গুরুতর, আর কি দুঃখের কথা! প্রথমেই তাহার মুখ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া গেল—কাকাবাবু, বলাই বেঁচে আছে তো?

তাহার বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস ধড়াস করিতেছে, জজের মুখে ফাঁসির হুকুম শুনিবার ভঙ্গিতে সে আকুল ও শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিবারণ মুখুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিবারণ মুখুজ্জে বলিলেন, না না সে সব কিছু নয়। ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। বলেই ফেলি। এই গিয়ে তোমার বোনকে নিয়ে গাঁয়ে কথা উঠেছে—মানে ওপাড়ার পটলের সঙ্গে সর্ব্বদাই মেলামেশা করে আসছে তো অনেকদিন থেকেই—সম্প্রতি একদিন নাকি সন্দেবেলা তোমাদের বাড়ীর পেছনে বাগানে কাঁটালতলায় দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল—যে দেখেছিল সেই বলেছে। এই নিয়ে গাঁয়ে খুব কথা চলছে। এই সময় তোমার একবার বাড়ী যাওয়া খুব দরকার বলে মনে করি।

বিপিন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল—তাহার বোন অসঙ্গত কিছু করিতে পারে ইহা তাহার মাথায় আসেই না। তাহাকে বিপন নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া জানে—আচ্ছা, যদি পটলের সঙ্গে কথাই বলিয়া থাকে তাহাতে দোষই বা কি আছে?

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল বাড়ী যাওয়াটা খুব দরকার বটে এসময়। পলাশ পাড়ায় এমন কোনো জরুরী দরকার নাই, যে আজ না ফিরিলেই চলিবে না। বরং একবার বাড়ী ঘুরিয়া আসা যাক্।

৫

বৈকালের দিকে বিপিন গ্রামে পৌঁছিল। বাড়ী ঢুকিতেই প্রথমে মনোরমার সঙ্গে দেখা। স্বামীকে হঠাৎ এভাবে আসিতে দেখিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল—কখন এলে কোন্ গাড়ীতে? চিঠি তো দাও নি? ভাল আছ তো?

বিপিন পুঁটুলিটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল—ধরো এটা। মার জন্যে বাতাসা আছে, ভেঙে না যায় দেখো। নেবেঞ্চুস্ আছে, ছেলেপিলেদের ডেকে দাও। তোমরা কেমন আছ? বলাই কোথায়?

—বলাই গিয়েচে মাছ ধরতে।

—কেমন আছে সে?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল।

—কেমন আছে বলাই?

—ভালো না। আমার কথা কেউ তো শোনে না, যা পাচ্চে তা খাচ্চে, রোজ নদীর ধারে মাছ ধরতে গিয়ে জলের হাওয়ায় বসে থাকে। জ্বর হয় রোজ রাত্তিরে—তার ওপর খায় দায়। ওষুধ বিষুধ কিছুই না।

—মুখ হাত পা কেমন আছে ?

—বেজায় ফোলা। এলেই দেখে বুঝতে পারবে। আর একটা কথা শুনেচ ?

—হ্যাঁ, নিবারণ কাকার মুখে শুনলাম রাণাঘাটে। কি ব্যাপার বলো তো ?

—যা শুনেছ, সব সত্যি। আমার কথা ঠাকুরঝি একবারে শোনে না—কত দিন বারণ করেছি। মাকেও বলে দিইছি, মা শুনেও শোনেন না। এখন গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে—এখন আমার কথা হয় তো তোমাদের ভাল লাগলেও লাগতে পারে। দাসী বাঁদির মত এ বাড়ীতে আছি বই তো নয় ?

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, যা জিগ্যেস্ করছি তার উত্তর দাও না আগে। তুমি নিজের চোখে কিছু দেখেছ ?

—কত দিন। তোমাকে বল্লেই তুমি রেগে যাবে বলে কিছু বলিনি। মাকে বলে কি হবে—বলা না বলা তুই সমান।

—আচ্ছা থাক্। বীণাকে একবার ডেকে দাও—আমি ওকে দুএকটা কথা বলি। তুমি এঘর থেকে যাও।

কিন্তু মনোরমার ঘর হইতে চলিয়া গেলেও বীণার আসিতে দেরি হইতে লাগিল। এ ব্যাপার লইয়া সে কি বলিবে ? বীণা তাহার ছোট বোন। কখনও তাহাকে সে রূঢ় কথা জীবনে বলে নাই—বিশেষ করিয়া বীণা বিধবা হইবার পরে বিপিন সাধ্যমত চেষ্টা করে ছেলেমানুষ বীণাকে কি করিয়া একটুখানি সুখী করা যায়। বিপিন ভাবিতে লাগিল—বীণার

দোষ কি ? অল্প বয়সে বিধবা ! ওর মনের কোন্ সাধই বা পুরেছে ? পটলকে হয়তো ওর চোখে ভাল লেগেছে —সম্পূর্ণ সম্ভব। ছেলেবেলা থেকেই পটলের সঙ্গে ওর ভাব ছিল, আর কেউ না জানুক, আমি জানি। যদি পটলের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে ওর তৃপ্তি হয়—তা আমি বারণ করিই বা কি ভাবে !······ তবে বীণা ছেলেমানুষ, সংসারের কি-ই বা জানে ! কত বিপদ আছে কত দিকে, সে তার কি খবর রাখে ? না—আমার কাজ নয়। মনোরমাকে দিয়ে বলাতে হবে।

হঠাৎ তাহার মনে আসিল, মানীর কথা।

সেও তো এই রকম ছেলেবেলার বন্ধুত্ব। মানী বিবাহিতা, তার স্বামী শিক্ষিত, মার্জ্জিত, ভদ্র যুবক। তবে মানী কেন তাহার সহিত কথা বলিতে আসে ? কেন তাহাকে দেখিবার জন্য মানীর এত আগ্রহ ?

এসব কথার কোনো মীমাংসা নাই। মীমাংসা হয় না। এই যে সে আজ বাড়ী আসিয়াছে—সারাপথ, সারা ট্রেনে কাহার কথা সে ভাবিয়াছে ?

নিজের মনকে চোখ ঠারা চলে না। ছেলেমানুষ বীণাকে সে কি দোষ দিবে ? তাহার বাবা কি করিয়াছিলেন ?

যাক ওসব কথা। মনোরমাকে দিয়া বীণাকে বলাইতে হইবে। গ্রামে কোনো কুৎসা রটে বীণার নামে—তাহা কখনই হইতে দেওয়া চলিবে না। আবশ্যক হইলে বীণাকে এখান

ই সরাইয়া ধোপাখালি কাছারীতে নিজের কাছে কিছুদিন ন য় রাখিবে।

এই সময়ে বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ডাকিছিলে দাদা?

বিপিন চোখ তুলিয়া বীণার দিকে চাহিল। অনেক দিন ভা করিয়া সে বীণাকে দেখে নাই। বীণার মুখশ্রী আজকাল এত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে! কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে বীণা! চোখ দুটি যেমন ডাগর, তেমনি স্নিগ্ধ। মুখখানি এখনও ছেলেমানুষের মতই। এ চোখে ও মুখে কোন পাপ থাকিতে পারে?

বিপিন বলিল—বলাই কোথায়?

—ছোড়দা মাছ ধরতে গিয়েছে।

—তোর শরীর ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ। তুমি হঠাৎ চলে এলে যে?

—এম্‌নি। রাণাঘাটে এসেছিলাম কাজে—ভাবলুম একবার বাড়ী ঘুরে যাই। হ্যাঁ, মা কোথায়?

—মা বড়ির ডাল ধুতে গিয়েছেন পুকুরের ঘাটে। ডেকে আনবো?

থাক্ এখন ডাকার দরকার নেই তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কি বল না?

—তুই পটলের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিস্ নে। গাঁয়ে ওতে পাঁচরকম কথা উঠাচ্ছে—আমরা গরীব লোক, আমাদের পক্ষে সেটা ভাল নয়।

বিপিন কথাটা মরীয়া হইয়া বলিয়াই ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, পটলের কথা বলিতেই বীণার চোখ মুখের ভাব যেন কেমন হইয়া গেল—যে ভাব সে বীণার মুখে চোখে কখনও দেখে নাই।

মনোরমার কথা তাহা হইলে মিথ্যা নয়—নিবারণ মুখুজ্জেও বাজে কথা বলেন নাই। পূর্ব্বে হইলে হয় তো বিপিন বীণার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত না—কিন্তু গত কয়েক মাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বিপিন এসব লক্ষণ বুঝিতে পারে এখন।

বীণা কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে যেন সামলাইয়া লইয়া সহজ ভাবেই বলিল—যা বলো দাদা। পটল-দা আসে, কথাবার্ত্তা বলে—তাই বলি। না হয় আর বলবো না।

বিপিন বুঝিল ইহা মিথ্যা আশ্বাস। বীণা ছলনা করিতেছে—পটলের সঙ্গে তাহার কিছুই নাই, ইহা সে দেখাইতে চায়—আর একটি খারাপ লক্ষণ। ছেলেমানুষ বীণা ভাবিয়াছে ইহাতেই দাদার চোখে ধূলা দেওয়া যাইবে—যাইতও যদি মানীর সঙ্গে পলাশপুরের বাড়ীতে তাহার দেখা না হইত।

ইহা ঠিকই যে বীণা মিথ্যা কথা বলিতেছে। পটলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে বন্ধ করিবে না। লুকাইয়া দেখা করিবার চেষ্টা করিবে। বিপিন বুঝিল, সে বীণা আর নাই, তাহার ছোট বোন সরলা ছেলেমানুষ বীণা এ নয়, এ প্রেমমুগ্ধা তরুণী-নারী, প্রেমিকের সহিত মিশিবার সুবিধা খুঁজিতে সব রকম ছলনা এ

অবলম্বন করিবে। সহোদরা বটে, কিন্তু বীণাকে আর বিশ্বাস নাই। বীণা দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বিপিন তবুও হাল ছাড়িল না। বীণাকে কাছে বসাইয়া তাহাদের বংশের পূর্ব্ব গৌরব সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গ্রাম্য কুৎসা যে ভয়ানক জিনিষ, তাহাতে একটি গৃহস্থের ভবিষ্যৎ কি ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, দু একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বীণা খানিকক্ষণ মন দিয়া শুনিল—কিন্তু ক্রমশঃ সে যেন অধীর হইয়া পড়িতেছে, দু একবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও সে সাহস পাইতেছে না—দাদার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচে—এরূপ ভাব তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৬

এই সময়ে বলাই আসিয়া পড়াতে বিপিনের বক্তৃতা আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া গেল। বলাই ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দাদা, কখন এলে? মাছ ধরে এনেছি দেখবে এস—মস্ত একটা শোল মাছ আর দুটো ছোট ছোট বান—

বিপিন বলাইয়ের চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মুখ আরও ফুলিয়াছে, শরীরে রক্ত নাই—পায়ের পাতা বেরি বেরি রোগীর মত দেখিতে, চোখের কোণ সাদা। অথচ এই চেহারা লইয়া বলাই দিব্য মনের আনন্দে মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে, খাওয়া দাওয়া করিতেছে।

ভগবান এ কি করিলেন? চারিদিক হইতে তাহার জীবনে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহার বুঝিতে বাকি নাই। বলাই বাঁচিবে না। নেফ্রাইটিসের রোগীর শেষ অবস্থা তার চেহারায় পরিস্ফুট—অথচ সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

বিপিন বলাইকে কিছু বলিল না। বলিয়া কোনো ফল নাই—যেমন বীণাকে বলিয়া কোনো ফল নাই। কেহই তাহার কথা শুনিবে না। সে চাকুরী করিতে বাহির হইলেই উহারা যাহা খুসী তাহাই করিবে। এ জগতে কেহ কাহারও কথা শোনে না—সবাই স্বার্থপর, যাহা যাহার ভাল লাগে—সে তাহাই করে, অন্য কারো মুখের দিকে চাহিবার অবসর তখন তাহাদের বড় একটা থাকে না। সে নিজে সারাজীবন তাহাই করিয়া আসিয়াছে—এখনও করিতেছে—অপরের দোষ দিয়া লাভ কি?

তুপুরের পর সে নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছে, মনোরমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি?

—না ঘুমুই নি। বসো।

মনোরমা তক্তপোষের এক কোণে বিপিনের মাথার কাছে বসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বীণাকে বল্লে কিছু নাকি?

—বলেছি।

—ও কি বল্লে?

—বল্লে, পটলের সঙ্গে আর কথা বলবে না।

—একটা কথা বলি শোনো। ওরকম করলে হবে না

কিছু। বীণা ঠাকুরঝি যাই বলুক, পটলের সঙ্গে দেখা না করে পারবে না। তুমি বাড়ী থেকে বেরুতে যা দেরী। তার চেয়ে এক কাজ করো, পটলকে একবার বলে যাও কথাটা। ওকে ভয় দেখাও, বাড়ী আসতে বারণ করে যাও—তাতে কাজ হবে। বুঝলে আমার কথা? বিপিন মনে মনে মনোরমার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। মেয়ে-মানুষের মন সে অনেক বেশী বোঝে তাহার নিজের চেয়ে।

মনোরমা আবার বলিল—না হয় পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে তাদের সামনে পটলকে তুকথা বল। এ বাড়ী আসতে মানা করে দাও। তাতে তুকাজই হবে। গাঁয়ের লোক জানুক তুমি বাড়ী এসে তুজনকেই শাসন করে দিয়েছ—পটলেরও একটা ভয় আর লজ্জা হবে—সে হঠাৎ এবাড়ীতে আসতে পারবে না।

—কিন্তু তাতে একটা বিপদ আছে। গাঁয়ের লোকের কথা আমিই বা অনর্থক গায়ে মেখে নিতে যাই কেন? তাতে উল্টো উৎপত্তি হবে না?

—কিছু উল্টো উৎপত্তি হবে না। বেশ, ভয় দেখিয়ে, না হয় মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলো পটলকে। যখন এরকম একটা কথা উঠেছে—তখন ভাই আমাদের বাড়ী আর তোমার যাওয়া আসাটা ভাল দেখায় না—এই ভাবে বল।

—তাই তবে করি। এদিকে আর একটা কথা বলি শোনো। বলাইয়ের অবস্থা ভাল নয়। আজ দেখে বুঝলাম ও আর বেশী দিন নয়।

—বল কি গো? অমন বলতে নেই।

—আর বলতে নেই! মনোরমা, সামনে আমার অনেক বিপদ আসছে আমি বুঝতে পেরেছি। এই বীণার ব্যাপার, বলাইয়ের চেহারা—এ সব দেখে তোমারই বা কি মনে হয়? আমার এখন পলাশপাড়া যাওয়া হয় না।

সেই রাত্রেই বিপিনের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইল। শেষ রাত্রি হইতে বলাই হঠাৎ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল, মাঝে মাঝে চীৎকার করে, মাঝে মাঝে ছুটিয়া বাহির হইতে যায়। প্রতিবেশীরা অনেকে দেখিতে আসিলেন—নানারকম টোটকা ওষুধের ব্যবস্থা করিলেন—কিছুতেই কিছু হইল না। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, বলাইএর মুখের বুলিই হইল—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!......যন্ত্রণায় বলাই যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল, মুখে যাহা আসে বকে, হাত পা ছোঁড়ে, আর কেবলই ছুটিয়া বাহির হইতে যায়।

তিন দিন তিন রাত্রি একই ভাবে কাটিল। কত রকম তেল-পড়া, জল-পড়া, ঝাড়-ফুঁক যে যাহা বলে তাহাই করা হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। চতুর্থ দিন সকাল আটটার সময় হইতে বলাইয়ের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

বিপিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—কি করচো?

মনোরমার চক্ষু রাত জাগিয়া লাল, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে—বৃদ্ধা শাশুড়ী রাত জাগিতে পারেন না—বিপিনও

আয়েসী লোক, রাত একটা পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে জাগিয়া থাকে—তারপর গিয়া শুইয়া পড়ে। মনোরমা সারারাত জাগিয়া থাকে রোগীর পাশে—আর থাকে বীণা।

মনোরমা বলিল—গোয়ালে আজ চারিদিন ঝাঁট পড়েনি গোয়ালটা একটু ঝাঁট দিচ্ছি।

বিপিন বলিল—গোয়াল ঝাঁট থাকুক। সকাল সকাল নেয়ে এসে দুটো যা হয় রেঁধে ছেলেপিলেদের খাইয়ে দাইয়ে নাও—বীণাকে আর মাকে খাইয়ে দাও। বলাইয়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না?

মনোরমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কেন গো—ঠাকুরপোর অবস্থা খারাপ?

তা দেখে বুঝতে পারছ না? আজই হয়ে যাবে। আর দেরি নেই। শীগ্‌গির করে ঘাটে যাও।

মনোরমা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। বিপিন বলিল—কেঁদে কি হবে, এখন যা করবার আছে করে ফেল। মায়ের সামনে যেন কেঁদো না, ঘাটে যাও চলে।

মনোরমার একটা অভ্যাস সংসারের মধ্যে যে যে আছে তাহাদের সকলকেই সে ভালবাসে, স্নেহ করে—মা, বীণা ঠাকুরঝি, ঠাকুরপো,—সকলেরই সুখসুবিধা দেখা তাহার চিরকালের অভ্যাস। এই সাজানো সংসারের মধ্য হইতে বলাই ঠাকুরপো চলিয়া গেলে সংসারের কতখানি চলিয়া যাইবে।......সে চিন্তা মনোরমার পক্ষে অসহ্য!

বিপিন ভাইয়ের সামনে গিয়া বসিল। বীণাকে বলিল—যা বীণা, ঘাটে যা—আমি আছি বসে। মাকে নিয়ে যা।

সত্যি, এতটুকু মেয়ে বীণা কয়দিন কি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সমানে রাত জাগিতেছে—মা ও উহার বৌদিদির সঙ্গে। দেবীর মত সেবা করিতেছে ভাইয়ের, অথচ কি অভাগিনী! জীবনে সে কখনো যাহা পায় নাই—অথচ যার জন্য তার বালিকা মন বুভুক্ষু, অপরের নিকট হইতে তারই এককণা পাইবার নিমিত্ত অভাগিনীর কি ব্যর্থ আগ্রহ! নিজেকে দিয়া বিপিন বোঝে এ নিদারুণ বুভুক্ষা।

সকলে আহারাদি শেষ করিয়া লইয়া বলাইয়ের কাছে বসিল। বলাইয়ের গত দুই দিন কোনো জ্ঞান ছিল না—যন্ত্রণায় চীৎকার করে মাঝে মাঝে কিন্তু মানুষ চিনিতে পারে না। বিপিনের মা খুব শক্ত মেয়ে—তিনি সবই বুঝিয়াছিলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত তাঁহার চোখে জল পড়ে নাই—বরং বীণা ও মনোরমা কাঁদিলে তিনি কালও বুঝাইয়াছেন। আজ কিন্তু দুপুরের পর হইতে তিনি অনবরত কাঁদিতেছেন। বীণা ডোবার ধারে বাসন লইয়া গিয়াছিল।

ডোবার ওপারের ঘাটে রায় বৌ ও নিবারণ মুখুজ্জের বড় মেয়ে নলিনী কথা বলিতেছিল। নলিনী হাত পা নাড়িয়া বলিতেছে—তা হবে না ওরকম? বাড়ীতে বিধবা মেয়ের ওই রকম অনাচার ভগবান সহ্যি করেন! জলজ্যান্ত ভাইটা ধড়ফড় করে মরলো চোখের সামনে। এখনও চন্দ্র সূর্য্য আছেন—

অনাচার ঢুকলে সে সংসারে মঙ্গল হয় কখনো! বীণা জলে নামিতে পারিল না—জলের ধারে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

উহারা বীণাকে দেখিতে পায় নাই—বীণা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাসন লইয়া চলিয়া আসিল—চোখের জল সামলাইতে পারিল না ফিরিবার সময়। পটলদা'র সঙ্গে কথা বলা অনাচার! এ ছাড়া আর কি অনাচার সে করিয়াছে? ভগবান তো সব জানেন। তাহারই পাপে ছোড়দা মরিতে বসিয়াছে—একথা যদি সত্য হয়—সে পিতল কাঁসা হাতে শপথ করিয়া বলিতেছে, আর কোন দিন সে পটলদার মুখ দেখিবে না। ভগবান ছোড়দাকে বাঁচাইয়া দিন।

কিন্তু ভগবান তাহার অনুরোধ রাখিলেন না। বৈকাল পাঁচটার সময় বলাই মারা গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

বলাইয়ের দাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়া বিপিন রাত্রি দুপুরের পর বাড়ী আসিল। বাড়ীসুদ্ধ সবাই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওপাড়া হইতে কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী আসিয়া অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া ছিলেন, বিপিনের মাকে নানারকমে বুঝাইতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ সময় সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা, সুতরাং হুঁকা হাতে রোয়াকের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপিন বলিল কাকা, কখন এলেন? তামাক পেয়েছেন?

—আর বাবা তামাক! তামাক তো আছেই। এখন যে বিপদে পড়ে গেলে তা থেকে সামলে উঠলেই বাঁচি। বৌদিদিকে বোঝাচ্ছি সেই সন্দে থেকে, উনি মা, ওঁর কষ্ট তো চোখে দেখা যায় না—এসো বাবা—পরে বিপিনের চোখে জল পড়িতে দেখিয়া বলিলেন—আহা হা, তুমি অধৈর্য্য হোলে চল্‌বে কেন বাবা? এদের এখন তোমাকেই ঠাণ্ডা করতে হবে—বোঝাতে হবে—বৌদিদি, বৌমা, বীণা—তোমাকে দেখে ওরা বুক বাঁধবে—তোমার চোখে জল পড়লে কি চলে?…

এমন সময় আরও দু পাঁচজন প্রতিবেশী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। একজন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিনের মাকে বোঝাতে গেলেন। একজন বিপিনের হাত ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

—রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়ো সব। সকলেরই শরীর খারাপ, কেঁদেকেটে আর কি হবে বলো বাবা, যা হবার তা হয়ে গেল। সবই তাঁর খেলা, দুনিয়াটাই এইরকম বাবা, আজ আমার, কাল আর একজনের পালা—শুয়ে পড়ো—

কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী রাত্রি এখানেই কাটাইবেন। ইহারা একা থাকিবে তাহা হয় না। আজ রাত্রে অন্ততঃ বাড়িতে অন্য কেহ থাকা খুব দরকার। বিপিন সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না, কৃষ্ণলালের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় রাত কাটিয়া গেল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন—তুমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ বাবাজি?

—আজ্ঞে ছুটি তো নয়। রাণাঘাট কোর্টে এসেছিলাম কাজে—সেখান থেকে বাড়ী এলাম এক দিনের জন্যে। তারপর তো বলাইয়ের অসুখ ক্রমেই বেড়ে উঠলো আর যাই কি করে—আটকে পড়লাম। তবে জমিদার বাবুকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছি—এ কথাও লিখে দেবো কাল। এখন ধরুন এদের ফেলে হঠাৎ কি করে বাড়ী থেকে যাই ? মায়ের ওই অবস্থা, আমি কাছে থাকলেও একটা সান্ত্বনা, তারপর ছোঁড়াটার শ্রাদ্ধশান্তির একটা ব্যবস্থাও আমি না থাকলে কি করে হয় বলুন।

শ্রাদ্ধশান্তি আর কি, তিলকাঞ্চন করে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দাও—এতো জাকিয়ে শ্রাদ্ধ করার কিছু নেই। কোনোরকমে শুদ্ধ হওয়া।

সকালের দিকে মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন দেখিয়া বিপিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ীতে যাইতে ভাল লাগে না—সকলে সহানুভূতি দেখাইবে 'আহা,' 'উহু' করিবে—বর্ত্তমান অবস্থায় বিপিনের তাহা অসহ্য মনে হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আইনদ্দির বাড়ীতে গেল, পাশের গ্রামে। আইনদ্দির বয়স একশত বছর হইলেও (অন্ততঃ সে বলে) বসিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়। বাড়ীর উঠানে একটা আমড়াগাছের ছায়ায় বসিয়া বৃদ্ধ জালের সূতা পাকাইতেছিল।

—বাবাঠাকুর সকালে কি মনে করে ? বোসো—তামাক

খাবা ? সাজি দাঁড়াও। আইনদ্দির সঙ্গেই তামাক খাইবার সরঞ্জাম মজুত। সে চকমকি ঠুকিয়া সোলা ধরাইয়া হাতে করিয়া সোলার টুক্‌রাটি কয়েকবার দোলাইয়া লইয়া কলিকায় কাঠকয়লার উপর চাপিয়া ধরিল।

বিপিন বলিল—চাচা, দেশলাই বুঝি কখনো জ্বালাও না ?

—ও সব আজকাল উঠেছে বাবাঠাকুর—ও সব তোমাদের মত ছেলে ছোকরারা কেনে। সোলা চকমকির মত জিনিষ আর আছে ? আপনি ভাল হয়ে বোসো। সেকালের তু একটা গপ্প করি শোনো। ওই যে দ্যাখ্‌চো অশথ গাছ, ওর পাশের জমিটার নাম ছেল ফাঁসিতলার মাঠ। নীলকুঠীর আমলে ওখানে লোকের ফাঁসি হোত। আমার জ্ঞানে আমি ফাঁসি হতে দেখেছি। তুমি আজ বলচো দিশলায়ের কথা—দিশলাই ছেল কোথায় তখন ? তুঁষের আর ঘুঁটের আগুন মাগীন্‌রা মাল্‌সা পুরে রেখে দিতো ঘরে—আর পাঁকাটির মুখে গন্ধক মাখিয়ে এক আঁটি করে রেখে দিত মাল্‌সার পাশে। এই ছেল সেকালের দিশলাই বাবাঠাকুর—তবে তামাক খাতি সোলা চকমকির রেওয়াজ ছেল। চাঁদামারির বিলি সোলার জঙ্গল—এক বোঝা তুলে এনে শুকিয়ে রাখো, ভোর বছর তামাক খাও। একটা পয়সা খরচ নেই—আর এখন ? একটা দিশলাই এক পয়সা, একটা দিশলাই দেড় পয়সা—হুঁ—

কথা শেষ করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে আইনদ্দি একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিল।

বিপিন বলিল—আচ্ছা চাচা, তুমি তো অনেক মন্তর তন্তর জানো—মানুষ ম'লে তাকে এনে দেখাতে পারো ?

আইনদ্দি বিপিনের হাতে কলিকা দিয়া বলিল—ধরো, একটা সোলা ছুটো করে তোমায় হুঁকো বানিয়ে দিই। মন্তর তন্তর অনেক জানি বাবাঠাকুর তোমার বাপ মায়ের আশিব্বাদে। শ'ন্য ভরে উড়ে যাবো, আগুন খাবো, কাটা মুণ্ডু জোড়া দেবো—

বিপিন এই কথা অন্ততঃ ত্রিশবার শুনিয়াছে বৃদ্ধের মুখে।

—কিন্তু মরা মানুষ আনতে পারো চাচা ?

—ম'লে কি মানুষ ফেরে বাবাঠাকুর ? আসমানে তারা হয়ে ফুটে থাকে—নয়তো শেয়াল কুকুর হয়ে জন্মায়। তবে একটা গল্প বলি শোনো—

ইহার পর আইনদ্দি একটা খুব বড় আজগুবি গল্প ফাঁদিল—কিন্তু বিপিনের সে দিকে মন ছিল না—সে আইনদ্দিদের বাড়ীর উত্তরে সুবিস্তৃত বেল্‌তার মাঠ ও চাঁদামারির বিলের ধারের সবুজ পাতি ঘাসের বনের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গেল। যখনই এখানটিতে আসিয়া বসে, তখনই তাহার মনে কেমন অদ্ভুত ধরণের সব ভাব আসিয়া জোটে।

বলাই চলিয়া গেল !...কতদূরে, কোথায় কে জানে ? সে-ও একদিন যাইবে, বীণাও যাইবে, মনোরমাও যাইবে···মানী··· মানীও যাইবে।

কেন খাটিয়া মরা ? কেন দুমুঠা অন্নের জন্য অনর্থক লোক

পীড়ন করিয়া পরের অভিশাপ কুড়ানো? আজ গেল বলাই··· কাল তাহার পালা।

একটা জিনিষ তাহার মনে হইতেছে। মানী তাহার মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল···মানীর নিকট এজন্য সে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বলাই বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। গরীব লোক এম্‌নি কত আছে এই সব পাড়াগাঁয়ে—যাহারা অর্থের অভাবে রোগের চিকিৎসা করাইতে পারে না। সে ডাক্তারি বই পড়িয়া কিছু ডাক্তারি শিখিয়াছে, বাকীটা না হয় মানীকে বলিয়া, তাহার দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তাহার অধীনে কিছুদিন থাকিয়া শিখিয়া লইবে। ডাক্তারিই সে করিবে—প্রজাপীড়ন কার্য্য তাহার দ্বারা আর চলিবে না।

তাহার বাপ বিনোদ চাটুজ্জে প্রজাপীড়ন করিয়া যথেষ্ট জমিজমা করিয়াছিলেন—যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি, যথেষ্ট খাতির। আজ সে সব কোথায় গেল? বিনোদ চাটুজ্জে আজ মাত্র সতেরো আঠারো বছর মারা গিয়াছেন—ইহার মধ্যেই তাঁহার পুত্রবধূ, খাইতে পায় না—পুত্র বিনা চিকিৎসায় মারা যায়—বিধবা কন্যার সম্বন্ধে গ্রামে নানা বদনাম ওঠে। অসৎ উপায়ে উপার্জ্জনের পয়সাই বা আজ কোথায়—কোথায় বা জমিজমা।

মানী তাহার চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে নানাদিক দিয়া।

জীবনে মানীকে সে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতে যায় বহুবার, বহুবার। সারাজীবন ধরিয়া।

বিপিন উঠিল। আইনদ্দি বলিল—কি নিয়ে যাবা হাতে করে বাবাঠাকুর? তুটো মুরগীর আণ্ডা নিয়ে যাবা? না, তোমরা বুঝি ও খাওনা। তবে তুটো শাকের ডাঁটা নিয়ে যাও। ভাল শাকের ডাঁটা হয়েল বাবাঠাকুর, স্থমুন্দিদের গরুর জন্যি বাড়তি পারলো না। ও মাখন—হ্যাদে ও মাখন—

বিপিন প্রভাতের রৌদ্রদীপ্ত সুবিস্তীর্ণ বেলতার মাঠের দিকে চাহিয়াছিল। চমৎকার জীবন! এই রকম বাঁশতলার ছায়ায় ...এই রকম সকালের বাতাসে বসিয়া চুপ করিয়া মানীর কথা ভাবা...

কিন্তু ইহা জীবন নয়। ইহা পুরুষ মানুষের জীবন নয়। ৺বিনোদ চাটুজ্জে পুরুষ মানুষ ছিলেন—তিনি পৌরুষদীপ্ত জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন—হৈ হৈ, হল্লা, কঠিন কাজ, মামলা মোকদ্দমা, জমিদারী শাসন, দাঙ্গাহাঙ্গামা—বিপিন জানে সে এই সব কাজের উপযুক্ত নয়। সে শাসন করিতে পারে না তাহা নয়—সে তুর্ব্বল বা ভীরু নয়—কিন্তু তাহার ধাতে সহ্য হয় না ওসব। বিশেষতঃ মানীর সংস্পর্শে আসিয়া সে আরো ভাল করিয়া এসব বুঝিয়াছে। জীবনে অনেক ভাল জিনিষ আছে—ভাল বই, ভাল গান, ভাল কথা—খাওয়া দাওয়ার কথা, মামলা মোকর্দ্দমা বা পরচর্চ্চা ছাড়াও আরও ভাল কথা জগতে আছে, মানী তাহাকে দেখাইয়াছে।

জমিদারী শাসন ছাড়াও পুরুষ মানুষের জীবন আছে—রোগের সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে, নিজের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম

করিয়া বড় হইতে চেষ্টা পাওয়াও পুরুষ মানুষের কাজ। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেই সে।

(২)

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন মাসের মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল। বিপিনকে বলাইয়ের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত বাড়ী থাকিতে হইল। বীণার ব্যাপার একটু আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে হইল বিপিনের কাছে। মনোরমা প্রায়ই বলে, তুজনে গোপনে দেখাশোনা এখনও করে —মনোরমা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বীণাকে বিপিন এজন্য তিরস্কার করিয়াছে, কড়া কথা শোনাইয়াছে, বীণা কাঁদিয়া ফেলে ছেলে মানুষের মত, বলে—ও সব মিছে কথা দাদা। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি পটল-দার সঙ্গে আর দেখাই করিনে।

কথার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল।

বলাইয়ের মৃত্যুর পর বীণার ধারণা হইল পটল-দা'র সঙ্গে গোপনে কথা বলিবার এ লোভ ভাল নয়, এ সব অনাচার, বিধবা মানুষের করা উচিত নয় যাহা, তাহা সে করিতেছে বলিয়াই আজ ভাইটা মরিয়া গেল।

বলাই মারা যাওয়ার ছ'দিন পরে পটল একদিন তাহাদের বাড়ীতে আসিল। বীণার মা বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তাহার

সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—বলাইয়ের মৃত্যু-সংক্রান্ত কথাই বেশী। বীণা লক্ষ্য করিল কথা বলিতে বলিতে পটল-দা জানালার দিকে আগ্রহদৃষ্টিতে চাহিতেছে। অন্য অন্য বার এতক্ষণ বীণা মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়ায়, পটলের সঙ্গে কথা সুরু করে—কিন্তু আজ সে ইচ্ছা করিয়াই যায় নাই। আর কখনো সে পটল-দার সামনে বাহির হইবে না। বেড়াইতে আসিয়াছে, ভালোই, মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করো, চলিয়া যাও—আমার সঙ্গে তোমার কি? বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে তোমার কি?

প্রায় এক ঘণ্টা থাকিয়া পটল যেন নিরাশ মনে চলিয়া গেল। পটল যেমন বাড়ীর বাহির হইল—বীণার তখন মনে পড়িল ছাদের উপর ওবেলা বৌদিদির রাঙা পাড় শাড়ীটা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল—তুলিয়া আনা হয় নাই। ছাদে উঠিয়া কাপড় তুলিতে তুলিতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ওই তো পটল-দা চলিয়া যাইতেছে···তেঁতুল গাছটার কাছে গিয়াছে···সে ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে—যদি পটল-দা হঠাৎ ফিরিয়া চায়? বীণা কি লজ্জায় পড়িয়া যাইবে! পটল-দাকে একটা পান সাজিয়া দিলে ভাল হইত—দেওয়া উচিত ছিল, মা যেন কি! লোক বাড়ীতে আসিলে তাহাকে শুধুমুখে বিদায় করিতে নাই। ইহা ভদ্রতা। তাহাকে ডাকিয়া পান সাজিয়া দিতে বলিলেই সে পান দিত।

কাপড় তুলিয়া বীণা নামিয়া আসিল। তাহার মন খুব

হালকা—ভালই হইয়াছে, আজ সে বুঝিয়াছে—পটলের সঙ্গে দেখা না করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, ইচ্ছা করিলেই হয়। একটা কঠিন কর্ত্তব্য সে সম্পন্ন করিয়াছে।

বলাইয়ের শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে পটল আর একদিন আসিল। বীণা উঠান ঝাঁট দিতেছিল, মুখ তুলিয়া কে আসিতেছে দেখিয়াই সে হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। তাহার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই মনে হইল, ছিঃ, অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া আশা উচিত হয় নাই—পটল-দা কি দেখিতে পাইয়াছে? বোধহয় পায় নাই, কারণ তখনও সে তেঁতুল-তলার মোড়ে; তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে। যাহা হউক, পটল-দা তো বাঘ নয়, ভালুকও নয়—অমনভাবে ছুটিয়া পলাইবার মানে হয় না। সহজভাবে মায়ের সামনে গিয়া কথা বলাই তো ভালো। ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া তোলাই ভালো।

কিন্তু বীণা এদিনও বাহিরে আসিল না—এমন কি যখন পটল জল খাইতে চাহিল, বীণার মা বলিলেন——ও মা বীণা, তোর পটল-দাদাকে এক গেলাস জল দিয়ে যা—বীণা নিজে না গিয়া বিপিনের বড়ছেলে টুনুর হাতে দিয়া জলের গ্লাস পাঠাইয়া দিল।

তাহার হাসি পাইতেছিল। মনে মনে ভাবিল—সব দুষ্টুমি পটল-দার। জল তেষ্টা না ছাই পেয়েছে! আমি আর বুঝিনে ও সব যেন।

সে যাইবে না, কখনও যাইবে না। জীবনে আর কখনো পটল-দার সঙ্গে দেখা করিবে না। শেষ, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

(৩)

ইহার পাঁচ ছ'দিন পরে বীণা একদিন সন্ধ্যার সময় ছাদে শুকাইতে দেওয়া মুসুরির ডাল তুলিতে গিয়াছে—ছাদের আলিসার কাছে আসিতেই দেখিতে পাইল, পটল-দা নীচে বাগানে কাঁটালতলায় দাঁড়াইয়া ওপরের দিকে চাহিয়া আছে।

বীণার সমস্ত শরীর দিয়া যেন কি একটা বহিয়া গেল! হঠাৎ পটল-দাকে এ ভাবে দেখিবে তাহা সে ভাবে নাই। কিন্তু আজ কয়দিন বীণা দুপুরে ও বিকালের দিকে নির্জ্জনে থাকিলেই ভাবিয়াছে পটল-দার কথা। অন্য কিছু নয়, সে শুধু ভাবিয়াছে এই কথা—আচ্ছা, এই যে দু'দিন সে পটল-দা'র সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিল না, পটল-দা কি ভাবে লইয়াছে জিনিষটা? খুব চটিয়াছে কি? কিংবা হয়তো তাহার কথা লইয়া পটল-দা আর মাথা ঘামায় না। তাহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। দিয়া যদি থাকে, খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছে। পটল-দা কষ্ট পায়, তাহা বীণা চায় না। ভুলিয়া যাক্, সেই ভালো। মনে রাখিয়া যখন কষ্ট পাওয়া, ভুলিয়া যাওয়াই ভালো।

দুপুরে এ কথা ভাবিয়া বীণা দেখিয়াছে বেলা যত পড়ে সেই কথাই মনের মধ্যে কেমন একটা—ঠিক বেদনা বা কষ্ট

বলা হয়তো চলিবে না—কিন্তু কেমন একটা কি হয়, ঠিক বলিয়া বোঝানো কঠিন—কি বলিয়া বুঝাইবে সে ভাবটা ?...যাহোক্, যখন সেটা হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে, যখন বড় তেঁতুলগাছটায় কালো কালো বাদুড়ের দল ঝাঁক বাঁধিয়া ফেরে, সন্তুদের নারকেল গাছটার মাথায় একটা নক্ষত্র ওঠে, বৌদি সাঁজালের মালসা হাতে গোয়াল ঘরে সাঁজাল দিতে ঢোকে, একটু পরেই ঘুঁটের ধোঁয়ায় উঠানের পাতিলেবুতলাটা অন্ধকার হইয়া যায়,—তখন ছাদের ওপর একা দাঁড়াইয়া বাঁশঝাড়ের মাথার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বীণার যেন কান্না আসে...কোথাও কিছু যেন নাই...কোথাও কিছু নাই...

এ ভাবটা সে বেশীক্ষণ মনে থাকিতে দেয় না—তখনি তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নীচে নামিয়া আসে।...নিজের কান্নাতে নিজে লজ্জিত হয়, ভীত হয়।

অথচ কাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই। কাহারও নিকট একটু সান্ত্বনা পাইবার উপায় নাই। মা নয়, বৌদিদি নয়। কাহারও কাছে কিছু বলা চলিবে না, বীণা বোঝে। এ তার নিজস্ব কষ্ট, অত্যন্ত গোপন জিনিষ—গোপনেই সহ্য করিতে হইবে।

হঠাৎ এ সময় পটল-দাকে এ ভাবে দেখিয়া বীণা যেন কেন কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পটল গাছের গুঁড়িটার দিকে আর একটু হটিয়া গেল। বীণার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—বীণা, আমার ওপর তোমার রাগ কিসের ?

বীণা এবার কথা খুঁজিয়া পাইল। বলিল—রাগ কে বল্লে?

—ছুদিন তোমাদের বাড়ী গেলাম, বাইরে এলে না, দেখা করলে না—রাগ নয় তো কি?

—রাগ নয় এম্‌নি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—মিথ্যে কথা। কাজে ব্যস্ত থাকলেও একটু বাইরে আসা যায় না কি? না সত্যি বলো লক্ষ্মীটি আমি কি দোষ করেছি?

তুমি পাগল নাকি পটল-দা? আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা এখানে এসেছ আবার, লোকে দেখলে কি মনে করবে—তোমায় একদিন বারণ করে দিইছি মনে নেই! যাও বাড়ী যাও—

বীণা কথাটা বলিল বটে—কিন্তু তাহার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরণের আনন্দ আসিয়া জুটিয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকার অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে, জোনাকীজ্বলা অন্ধকার, সাঁজালের ঘুঁটের চোখ-জ্বালা-করা ধোঁয়ায় ঘনীভূত অন্ধকার।···

তাহাকে কেহ চায় নাই জীবনে এমন করিয়া—সে কথা কহে নাই বলিয়া ছুটিয়া আশসেওড়া বিছুটিবনের আগাছায় জঙ্গলের মধ্যে, সাপে খায় কি ব্যাঙে খায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকে নাই কখনো—কাঙালের মত, একটুখানি মিষ্ট কথার প্রত্যাশী হইয়া—বিশেষ করিয়া যখন সে তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছে, সামনে বাহির হয় নাই, কথা কয় নাই—তাহার পরেও,—এক পটল-দা ছাড়া!

পটল মিনতির সুরে বলিল—কেন এমন করে তাড়িয়ে দেবে, বীণা? আমি কি করেছি বলো—

—তুমি কিছু করোনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা আর চলবে না—

—কেন চলবে না বীণা ?

—কেউ পছন্দ করে না।

—কেউ মানে কে কে, শুনতো পাবো না ?

—না—তা শুনে কি হবে ? ধরো আমার বাড়ীর লোক। আমি তো স্বাধীন নই—তাঁরা যদি বারণ করেন, অসন্তুষ্ট হন, আমার তা করা উচিত নয়।

—তুমি আমায় ভালবাসো না ?

—বীণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

—আমার কথার উত্তর দাও, বীণা !

—আচ্ছা পটল-দা, ও কথার উত্তর শুনে লাভই বা কি ? আমার আর তোমার সঙ্গে দেখা করা চলবে না। তুমি কিছু মনে কোরো না পটল-দা, এখন বাড়ী যাও, লোকে কি মনে করবে বলো তো। সন্ধ্যেবেলা এখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছ দেখলে বৌদি এখুনি ছাদের ওপর আসবে, তুমি যাও এখন।

—আচ্ছা এখন যাচ্ছি, কাল আসবো ?

—না।

—পরশু আসব ।

—না।

—কবে আসবো আচ্ছা তুমিই বল বীণা।

—কোনোদিন না। কেন আমায় এসব কথা বলাচ্ছ পটল-দা? আমি এক কথার মানুষ—যা বলেছি, তা বলেছি। এখন যাও।

—তাড়াবার জন্য অত ব্যস্ত কেন বীণা, যাবোই তো, থাকতে আসিনি। বেশ তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয়—তবে চল্লাম—এ-ও বলে রাখছি, জীবনে আর কখনও আমায় দেখতে পাবে না।

—না পাই না পাবো, তা আর কি হবে? না পটল-দা, আর বকিও না, কথায় কথা বাড়ে, আমি নীচে নেমে যাই, বৌদিদি মনে করবে—কতক্ষণ ছাদের ওপর এসেছি।

পটল আর কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বীণা যেমন সিঁড়ির মুখে নামিতে যাইবে দেখিল অন্ধকারের মধ্যে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে। বৌদিদির ভাব দেখিয়া বীণার মনে হইল সে বেশীক্ষণ আসে নাই—এবং সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া তাহাদের শেষ কথা শুনিয়াছে।

আসলে মনোরমা কিছুই শুনিতে পায় নাই—কিন্তু ছাদে উঠিবার সময় বীণা কাহার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কথা কহিতেছে জানিবার জন্য সিঁড়ির মুখে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল। এবং অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পরেই বীণা কথা বন্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে ধাক্কা খাইল।

মনোরমা বলিল—কার সঙ্গে কথা বলছিলে ঠাকুরঝি?

বীণা ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—জানিনে—সরো রাস্তা দাও—

উঠে এসে দাঁড়িয়ে তো আছ দিব্যি অন্ধকারে!······বাবারে, সবাই মিলে খাও আমাকে—খেয়ে ফেল—বলিয়া সে তরতর করিয়া নামিয়া গিয়া মায়ের ঘরে একখানা ছেঁড়া মাদুর এক-কোণে পাতিয়া সোজাসুজি শুইয়া পড়িল।

মনোরমা মনে মনে বড় অস্বস্তি অনুভব করিল। বীণা আবার গোপনে পটলের সঙ্গে দেখাশুনা করিতেছে তাহা হইলে। নিশ্চয়ই পটল ও—আর কাহার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ছাদ হইতে চাপাসুরে কথাবার্তা বলিবে সে!···ঠাকুরঝির রাগের কারণই বা কি কাছে তাহা সে বুঝিয়া পাইল না! সে আড়ি পাতিয়া কাহারো কথা শুনিতে যায় নাই সিঁড়ির ঘরে। কি কথা হইতেছিল, যাহার সহিত কথা হইতেছিল তাহাও সে জানে না—তবে আন্দাজ করিয়াছিল বটে। দুশ্চিন্তায় মনোরমার রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ঠাকুরঝি দিন কতক পটলের সামনে বাহির হইত না, তাহাতে মনোরমা খুব খুসি হইয়াছিল মনে মনে। কিন্তু এত বলার পরেও আবার যখন সুরু করিল তাও আবার লুকাইয়া, তখন ফল ভাল হইবে না।

কি করা যায়, কি করিয়া সংসারে শান্তি আনা যায়? তাহাদের বাড়ীটাকে যেন অলক্ষ্মীতে পাইয়া বসিয়াছে। দারিদ্র্য, রোগ, মৃত্যু···অনাচার···কুৎসা কলঙ্ক···বীণা ঠাকুরঝি যে রাগ করে, নতুবা কাল দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সে বেশ করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া বলিতে পারে। বলিতে পারে

যে, এসব ব্যাপারের ফল কখনও ভাল হয় না। পটল বিবাহিত লোক, তাহার স্ত্রী পুত্র বর্ত্তমান, বীণাকে লইয়া নাচানো ছাড়া তাহার আর কি ভাল উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ মানিয়া চলিতে হয়—বীণা বিধবা, বিশেষতঃ ছেলেমানুষ, অনেক বুঝিয়া তাহাকে এখন সংসারে চলিতে হইবে।...কিন্তু বীণা শুনিবে কি তাহার হিতোপদেশ?

৪

ইহার পর পটল আর একদিন আসিল। অমান সন্ধ্যা-বেলা, অমনি ভাবে লুকাইয়া। কিন্তু এদিন বীণা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, ছাদে যাইবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া যায় নাই। ছাদে গিয়াছিল মনোরমা। সিঁড়ির মুখে নামিবার সময় দেখিতে পাইল পটল কাঁটাল তলায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই পটল গুঁড়ির আড়ালে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, একটু থতমত খাইয়া গেল—তাহাকেই বীণা বলিয়া ভুল করিয়াছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে নাকি? মনোরমার হাসিও পাইল। ভাবিল—পোড়ার মুখো ড্যাকরার কাণ্ড ছাখো। জঙ্গলের মধ্যে এই ভর্ সন্দেবেলা দাঁড়িয়ে মরছেন মশার কামড় খেয়ে। খ্যাংরা মারো মুখে—বীণাকে সে কিছুই বলিল না নীচে নামিয়া। তাহাকে চোখে চোখে রাখিল, বীণা চুপি চুপি ছাদে যায় কিনা। ওদের মধ্যে নিশ্চয় পূর্ব্ব হইতে বলা-কওয়া ছিল।

রাত্রে শুইবার সময় সে কৌশল করিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—আজ হয়েছে কি জানো ঠাকুরঝি, ওপরে তো ছাদে গিয়েছি সন্ধ্যের সময়—দেখি কে একজন কাঁটালতলায় দাঁড়িয়ে —ভাল করে চেয়ে দেখি—

বীণার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—পটল-দা ?

মনোরমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসির ধমকে কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "পটল-ই বটে।"

—আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি বৌদি, আমি কিছুই জানি নে।

বীণা কিন্তু একথা কিছুতেই বলিতে পারিল না যে সে পটল-দাকে সেদিনই আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। সে কথা তাহার আর পটল-দার মধ্যে গুপ্ত থাকিবে—বাহিরের লোককে তাহা জানাইলে পটল-দার অপমান হইবে। লোকের সামনে পটল-দা'কে সে ছোট করিতে চায় না। তাহার মন তাহাতে সায় দেয় না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এত বলার পরও পটল-দা আবার আসিয়াছিল! রাত্রে শুইয়া শুইয়া বীণা কতবার পটলের উপর রাগ করিবার···দারুণ রাগ করিবার চেষ্টা করিল। ভারি অন্যায় পটল-দা'র, যখন সে বারণ করিয়া দিয়াছে, তখন কেন আবার দেখা করিবার চেষ্টা পাওয়া ? ছিঃ ছিঃ, বৌদিদি না

দেখিয়া যদি অন্য লোক দেখিত? পটল-দা লোক ভাল নয়। ভাল লোক নয়। খারাপ চরিত্রের লোক। ভাল চরিত্রের লোক যারা, তারা এমন করে না।

আচ্ছা, একটা কথা—তাহারই সঙ্গে বা পটল-দা দেখা করিবার অত আগ্রহ কেন দেখায়? আরও তো কত মেয়ে আছে। এই অন্ধকারে···আগাছায় জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া—সত্য, যদি সাপে কামড়াইত? কথাটা মনে করিবার সঙ্গে সঙ্গে পটলের উপর এক প্রকার অদ্ভুত ধরণের সহানুভূতি আসিয়া জুটিল বীণার মনে। মাগো, পটল-দাকে সাপে কাড়াইত! না, ভাবিতেও কষ্ট হয়। তাহারই জন্য পটল-দাকে সাপে কামড়াইত তো? আর কেহ তো তাহার জন্য ভাবে না, তাহার মুখের কথা শুনিবার অত আগ্রহ দেখায় না, সংসারে কে তাহার জন্য ভাবিয়া মরিতেছে? কোন্ আলো আছে তাহার জীবনে?···

এই শূন্য, অন্ধকার জীবনের মধ্যে তবুও পটল-দা তাহার সঙ্গে একটু কথা কহিবার ব্যাকুল আগ্রহে রাত্রি, অন্ধকার, সাপের ভয়, মশার কামড়, লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া চোরের মত দাড়াইয়া থাকে, ভাঙা কোঠার পাশের জঙ্গলের মধ্যে—যেখানে বিছুটি জঙ্গল এমন ঘন যে দিনমানেই যাওয়া যায় না! তাও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃথা ফিরিয়া গেল। চোখের দেখাও তো তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

নিজের স্বামীকে বীণা মনে করিতে পারে—খুব সামান্য,

অস্পষ্টভাবে। এগার বৎসর বয়সে বীণার বিবাহ হয়। এক বৎসর পরে বাপের বাড়ী থাকিতেই একদিন সে শুনিল স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। মনে আছে, বেশ ছেলেটি। খুব অল্পদিন দেখাশোনা হইয়াছিল। কোথায় স্কুলে পড়িত, শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে বাড়ী বেশীদিন থাকিতে দিতেন না—স্কুল-বোর্ডিংএ পাঠাইয়া দিতেন।

সে-সব আজকার কথা নয়—বীণার বয়স এখন তেইশ চব্বিশ—বারো বছর আগের কথা, স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ বীণা দেখিল সে কাঁদিতেছে—হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে, বালিশের একটা ধার একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে চোখের জলে।

৫

দেনা জড়াইয়া গিয়াছে একরাশ। কোনো দোকানে আর ধার পাইবার যো নাই।

কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী সংসারের বন্ধু, দুবেলাই যাতায়াত করেন, খোঁজখবর যা নেবার, তিনিই লইয়া থাকেন, অন্য লোকে বড় একটা ইহাদের লইয়া মাথা ঘামায় না!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রোয়াকে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কৃষ্ণলাল বলিলেন, পলাশপাড়া যাবার তোমার আর দেরি কিসের হে বিপিন? বেরিয়ে পড়, চলে যাও এবার। তোমার দোষ একবার বাড়ী এসে চেপে বস্‌লে তুমি নড়তে চাও না।

—আপনার কাছে আর লুকোব না কাকা, চাকুরী গিয়েচে আজ মাস খানেক হোল, অনাদিবাবু চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যদি আমি এক হপ্তার মধ্যে না ফিরি, তিনি অন্য লোক রাখতে বাধ্য হবেন। সে চিঠির উত্তর দিই নি।

—চিঠির উত্তর দাও নি? না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্চ সে ভালো খুব, না? তোমার উপায় যে কি হবে আমি কিছু বুঝি নে বাপু! না, শোনো, আমার মনে হয় তোমার চাকুরী এখনও যায় নি। নতুন লোক খুঁজে পাওয়া শক্তও বটে, আর বিশ্বাস যাকে তাকে করাও যায় না বটে। তুমি যাও, কাল সকালেই তুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।

—বেরিয়ে পড়্‌বো কাকা, তবে সে দিকে নয়। আমি ডাক্তারি করবো ভেবে রেখেচি অনেক দিন। ওই সোনাতনপুর, আমার গাঁ, পিপ্‌লিপাড়া এ সব অঞ্চলে ডাক্তার নেই। কে যাবে ওসব অজ পাড়াগাঁয়ে মরতে? আমি সোনাতনপুর বস্‌বো ভেবেচি। সোনাতনপুরের রামনিধি দত্ত ওখানকার মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক, সেখানে গিয়ে বাবার পরিচয় দিয়ে ওই গাঁয়েই বস্‌বো।• দেখি কি হয়। জমিদারী শাসন আর প্রজা ঠ্যাঙানো, ও আর করচি নে কাকা। বলাই মারা যাওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেচি ও কাজে সুখ নেই। আর আমি ওপথে—

কৃষ্ণলাল অবাক হইয়া বলিলেন, ডাক্তারি করবে! ডাক্তারি শিখলে কোথায় তুমি যে ডাক্তারি করবে! যত বদখেয়াল কি তোমার মাথায় আসে!

ডাক্তারি আমি করেচি এর আগেও। ধোপাখালির কাছারিতে বসে। আর শেখার কথা বলচেন, কেন বই পড়ে বুঝি শেখা যায় না? জমিদারবাবুর মেয়ে আমাকে কতকগুলো ডাক্তারি বই দিয়েছিল, তাই পড়ে শিখেচি। সেই আমায় ডাক্তারি করতে পরামর্শ দেয়, কাকা। বলেছিল, তার এক দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তার কাছে গিয়ে শেখার ব্যবস্থা করে দেবে ওই বলেছিল। বেশ চমৎকার মেয়ে, মনটিও খুব ভাল, আমায় বলেছিল—

হঠাৎ বিপিন দেখিল মানীর কথা একবার আসিয়া পড়িয়াছে যখন, তখন ওর কথাই বলিবার ঝোঁকে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ডাক্তারির কথা গৌণ, মুখ্য কাজ মানীর সম্বন্ধে কথা বলা। কৃষ্ণকাকার সামনে!

বিপিন চুপ করিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, জমিদারবাবুর মেয়ে? বিয়ে হয়েছে? তোমার সঙ্গে কি ভাবে আলাপ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে হয়েচে বৈকি। বাইশ বছর বয়েস। আমার সঙ্গে তো ছেলেবেলা থেকেই আলাপ ছিল কিনা! বাবার সঙ্গে ওদের বাড়ী ছেলেবেলায় যেতাম, তখন থেকেই আলাপ। এক সঙ্গে খেলা করেচি। এখনও আমাকে যত্ন আত্যি করে বড্ড, আর কিসে আমার ভাল হবে সর্ব্বদা ওর সেদিকে—

বিপিনের গলার সুরে কৃষ্ণলাল একটু আশ্চর্য্য হইয়া উহার দিকে চাহিয়াছিলেন, বিপিন আবার দেখিল সে মানীর

সম্বন্ধে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলিতেছে। কি যেন অদ্ভুত নেশা! মানীর সম্বন্ধে কতকাল কাহারও কাছে কোনো কথা বলে নাই। আজ যখন ঘটনাক্রমে তাহার কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর থামিতে ইচ্ছা করে না কেন? অনবরত তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করে কেন?

বিপিন আবার চুপ করিয়া রহিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, তা বেশ। তোমার সঙ্গে এবার বুঝি দেখাশুনো হয়েছিল? শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছিল বুঝি?

না, বিপিন আর কিছু বলিবে না। সে সামলাইয়া লইয়াছে নিজেকে। কৃষ্ণলালের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলিল, হ্যাঁ। তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, কেমন এক প্রকারের উত্তেজনা। মানীর কথা এতদিন কাহারও সহিত হয় নাই, অনেক জিনিষ চাপা পড়িয়াছিল। হঠাৎ অনেক কথা, অনেক ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল মানীর সম্বন্ধে। কান দুটা যেন গরম হইয়া উঠিয়াছে, লাল হইয়া উঠিয়াছে কি দেখিতে? কৃষ্ণলাল কি দেখিতে পাইতেছেন?

৬

দিন পনেরো পরে। আপনার একটা বই লিখুন না?

রাত্রে একদিন মনোরমা বলিল, তোমায় তো কোনো কথা বল্লেই চটে যাও। কিন্তু আমার হয়েচে যত গোলমাল, ঝক্কি পোয়াচ্চি আমি। তিন দিন কাঠা হাতে করে এর ওর বাড়ী

থেকে চাল ধার করে আনি, তবে হাঁড়ি চড়ে। আমি মেয়ে মানুষ, ক'দিন বা আমাকে লোকে দেয়? পাড়ায় আর ধার পাওয়া যাবে না, এবার বে-পাড়ায় বেরুতে হবে কাল থেকে। তা আর কি করি, কাল থেকে তাই করবো। ছেলেগুলো উপোস করবে, মা উপোস করবেন, এ তো চোখে দেখতে পারবো না!

মনোরমার কথাগুলি খুব ন্যায্য বলিয়াই বোধ হয় বিপিনের কাছে তিক্ত লাগে। সে ঝাঁঝের সহিত বলিল, তা এখন তোমাদের জন্যে চুরি করতে পারবো না তো। না পোষায়, ভাইকে চিঠি লিখো, দিনকতক গিয়ে বাপের বাড়ী ঘুরে এসো। সোজা কথা আমার কাছে।

মনোরমা কাঁদিতে লাগিল।

নাঃ, বিপিনের আর সহ্য হয় না। কি যে সে করে। চাকুরী তাহার নিজের দোষে যায় নাই। বলাইয়ের অসুখ, বলাইয়ের মৃত্যু, বীণার ব্যাপার, নানা গোলযোগ। সে ইচ্ছা করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া আসে নাই। অথচ স্ত্রী দেখিতেছে সবটাই তাহার দোষ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। পল্লীগ্রামের লোক সকালে সকালেই শুইয়া পড়ে। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই। উত্তর দিকের ভাঙা জানালাটার ধারেই তক্তাপোষখানা পাতা। বিপিন উঠিয়া দালান হইতে তামাক সাজিয়া আনিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে

চাহিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। জানালার বাহিরেই কোঠার গায়ে লাগানো ছোট্ট তরকারীর ক্ষেত, বলাই গত চৈত্র মাসে কুমড়া পুঁতিয়াছিল। এখন খুব বড় গাছ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া লইয়াছে বাগানে। তরকারীর ক্ষেতের পর তাহাদের কাঁঠাল গাছ, তারপর রাস্তা, রাস্তার ওপারে নবীন বাঁড়ুয্যের বাঁশঝাড় ও গোহাল। ঘন ঠাস্-বুনানি কালো অন্ধকার বাঁশঝাড়ের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছে।

মনোরমার উপর তাহার সহানুভূতি হইল। বেচারী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, তাহাদের বাড়ীতে অনেক আশা করিয়াই উহার বাপ-মা বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন খাইতে পায় না পেট ভরিয়া দুবেলা। পাড়ায় কোথাও সে বাহির হয় না, সমবয়সী বৌ-ঝিয়ের সঙ্গে কমই মেশে, কারণ গরীব বলিয়াও বটে এবং বীণার ব্যাপার লইয়াও বটে, নানা অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হয় বলিয়া সে কোথাও বড় একটা যায় না। ঘরের কাজ লইয়াই থাকে।

বিপিন বলিল, কেঁদো না, বলি শোনো।

মনোরমা কথা কহিল না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। আধ-ময়লা শাড়ীর আঁচলটা মাদুর হইতে খানিকটা মেঝের উপর লুটাইতেছে। সত্যি কষ্ট হয় দেখিলে।

—শোনো, আমি কাল কি পরশু বাড়ী থেকে যাই। পিপলিপাড়া গিয়ে ডাক্তারি করবো ভেবেছি। তুমি কি বলো?

পিপলিপাড়া বেশ গাঁ, চাষাবাসী লোক অনেক। হয়তো কিছু কিছু পাবো। তুমি কি বলো ?

স্বামী তাহার মতামত চাহিতেছে, ইহা মনোরমার কাছে এক নূতন জিনিষ বটে। সে একটু আশ্চর্য্য হইল, খুসিও হইল। চোখের জল মুছিয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি ডাক্তারি জানো ?

—জানিই তো। ধোপাখালি থাকতে রুগী দেখতাম।

—কোথা থেকে শিখলে ডাক্তারি ?

—বই পেয়েছিলাম জমিদার বাড়ীর ইয়ে মানে লাইব্রারি থেকে। বেশ বড় লাইব্রারি আছে কিনা ওঁদের বাড়ী।

মনোরমার পিতৃগৃহ গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর। সে বলিল, লাইব্রারি আবার কি ? লাইব্রেরি তো বলে। আমাদের পাড়ায় মস্ত লাইব্রেরি আছে গোয়াড়িতে। জেঠীমা বই আনাতেন, আমরা দুপুরবেলা পড়তাম।

—ওই হোলো, হোলো। তা আমি বলছিলাম কি, দিনকতকের জন্যে একবার ঘুরে এসো না কেন সেখানে ? আমি একটু সামলে নিই। যদি পিপলিপাড়ায় লেগে যায়, তবে পূজোর পরেই নিয়ে আসবো এখন। কি বলো ?

মনোরমা বলিল, সেখানে যাব কোন্ মুখ নিয়ে ? নিজের বাবা মা থাকলে অন্য কথা ছিল। জ্যাঠামশায় বিয়ের সময় যা দিয়েছিলেন, তুমি তা ঘুচিয়েছে। শুধু গায়ে শুধু হাতে তাদের

সেখানে গিয়ে দাঁড়াব যে, তারা হল বড়লোক, তুই জ্যাঠতুতো বোন ইস্কুল কলেজে পড়ে, বড়দিদিরা বড়লোকের মেয়ে, তারা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে হাসে। তার চেয়ে না খেয়ে এখানে পচে মরি সেও ভাল।

যুক্তি অকাট্য। ইহার ওপর বিপিন কিছু বলিতে পারিল না। বলিল, তা নয় মনোরমা, আমি ডাক্তারিতে বসলেই আজই যে হুড় হুড় করে টাকা ঘরে আসবে তা তো নয়? দুদিন একটু আমায় নির্ভাবনায় থাকতে না দিলে আমি তোমাদের বেক্ষাডাঙায় ফেলে রেখে গিয়ে কি সোয়াস্তি পাব? তাই বলছিলাম।

মনোরমা বলিল, তুমি এস গিয়ে, আমাদের ভাবনা আমরা ভাব্‌বো।

—ঠিক? সে ভার নেবে তো?

—না নিয়ে উপায় কি বল।

দিন চার পাঁচ পরে বিপিন ছোট্ট একটি টিনের সুটকেস্ হাতে করিয়া পিপলিপাড়া রামনিধি দত্ত মহাশয়ের বহির্বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা প্রায় বারটা বাজে। সকালে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়াছে। পায়ে এক পা ধূলা, গায়ের কামিজটি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

রামনিধি দত্তের বাড়ি দেখিয়া সে কিছু হতাশ হইল। ভাঙা পুরোনো কোঠা বাড়ি, বহুকাল মেরামত হয় নাই,

কার্নিসে স্থানে স্থানে বট অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। আর কি ভয়ানক জঙ্গল গ্রামটিতে! শুধু আমের বাগান আর ঘন নিবিড় বাঁশবন।

দত্ত মহাশয়কে পূর্ব্বে সে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, তিনি বিপিনকে আসিতেও লিখিয়াছিলেন। তবুও নতুন অচেনা জায়গায় আসিয়া বিপিনের কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল, বাহিরবাটির চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া সে সুটকেস্‌টি নামাইয়া একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারের উপর বসিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। চণ্ডীমণ্ডপটি সেকালের, দেখিলেই বোঝা যায়। নিম কাঠের বড় কড়ি হইতে একটি কাঠের বিড়াল ঝুলিতেছে, সেকালের অনেক চণ্ডীমণ্ডপে এ রকম বিড়াল কিংবা বাঁদর ঝুলিতে বিপিন দেখিয়াছে। একদিকে রাশীকৃত বিচালি, অন্যদিকে একখানা তক্তাপোষের উপর একটা পুরান শপ্ বিছানো। ঘরের মেঝেতে একস্থানে তামাক খাইবার উপকরণ টিকে, তামাক, হুঁকা, কলিকা। ইহা ব্যতীত অন্য কোন আসবাব চণ্ডীমণ্ডপে নাই।

রামনিধি দত্ত খবর পাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন— আপনিই ডাক্তারবাবু? ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম। আসুন আসুন। বড় কষ্ট হয়েছে এই রোদ্দুরে?

বৃদ্ধ বিবেচক লোক, অল্প কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, আপনি বসুন, আমি জল পাঠিয়ে দিই হাত পা ধোবার। জামা খুলে একটু বিশ্রাম করুন, তারপরে

পাশেই নদী, ওই বাঁশঝাড়টার পাশ দিয়ে রাস্তা। নেয়ে আসবেন এখন। তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নান করিতে গিয়া নদীর অবস্থা দেখিয়া বিপিন প্রমাদ গণিল। কচুরীপানার দামে স্নানের ঘাটের জল পর্য্যন্ত এমন ছাইয়া ফেলিয়াছে, যে, জল দেখাই যায় না। জল রাঙা, স্নান করিয়া উঠিলে গা চুলকায়। কোনরকমে স্নান সারিয়া সে ফিরিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, এত বেলায় রান্না করতে গেলে আপনার যদি কষ্ট হয় তবে বলুন চিঁড়ে আছে, দুধ আছে, ভাল কলা আছে, নারকোল-কোরা আছে, আনিয়ে দিই। ওবেলা বরং সকাল সকাল রান্নার ব্যবস্থা করে দেব এখন।

ইতিমধ্যে দশ এগারো বছরের একটি ছেলে একখানা রেকাবিতে একপাশে খানিকটা নারিকেলকোরা আর এক পাশে একটু গুড় লইয়া আসিল। বৃদ্ধ বলিলেন, জল খেয়ে নিন্, সেই কখন বেরিয়েছেন, ব্রাহ্মণ দেবতা, স্নান আহ্নিক না হলে তো জল খাবেন না, কষ্ট কি কম হয়েছে! ওরে, জল আনলি নে? খাবার জল ঘটি করে নিয়ে আয়, সন্ধ্যো আহ্নিক হয়েছে কি?

বিপিন দেখিল দত্ত মহাশয় গোঁড়া হিন্দু। এখানে যদি সুনাম অর্জ্জন করিতে হয়, তবে তাহাকে সব নিয়মকানুন মানিয়া আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান সাজিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং সে বলিল, সন্ধ্যো আহ্নিক নদী থেকে সারব ভেবেছিলাম কিন্তু তা তা হোল না, এখানেই একটু—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখানেই সেরে নিন।

ওঃ ভাগ্যে সে বাড়িতে পা দিয়াই একঘটি জল চাহিয়া লইয়া খায় নাই! তাহা হইলে এ বাড়িতে তাহার মান থাকিত না। অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে কি কষ্টেই পড়িতে হয় মানুষকে।

—তা হলে রান্নার ব্যবস্থা করে দেব, না চিঁড়ে খাবেন এ বেলা?

—না না, রান্না আর এত বেলায় করতে পারব না। এ বেলা যা হয়—

দত্ত মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

১

বিপিন থাকে দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে, পাশের একখানা ছোট চালাঘরে রাঁধিয়া খায়। দত্ত মহাশয় বাড়ি হইতেই প্রতিদিন চালডাল দেন, বিপিনের তাহা লইতে বাধ বাধ ঠেকিলেও উপায় নাই, বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়।

একদিন রোগী দেখিয়া সে একটি টাকা পাইল। দত্ত মহাশয়ের নাতিকে ডাকিয়া বলিল, হীরু, আজ তোমার ঠাকুমাকে বল, আজ আর আমায় সিধে পাঠাতে হবে না। রুগী দেখে কিছু পেয়েছি, তা থেকে জিনিষপত্র কিনে আনব।

এখানে কিছুদিন থাকিয়া সে দেখিল একটা ডাক্তারখানা না খুলিলে ব্যবসা ভাল করিয়া চলিবে না। পাশের গ্রামের নাম কাপাসডাঙ্গা, সেখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসে, আট দশখানি গ্রামের লোক একত্র হয়। দত্ত মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সেখানে হাটতলায় এক চালাঘরে টিনের উপর আলকাতরা দিয়া নিজের নাম লিখিয়া ঝুলাইল। একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলে অনেকগুলি পুরান শিশি বোতল সাজাইয়া দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে সেই হাতলভাঙ্গা চেয়ারখানা চাহিয়া আনিয়া টেবিলের সামনে পাতিয়া রীতিমত ডিস্‌পেনসারি খুলিয়া বসিল।

এ গ্রামেও লোক নাই, যেখানে সে থাকে সেখানেও লোক নাই। তাহার উপর নিবিড় জঙ্গল দুই গ্রামেই। দিনমানেই বাঘ বাহির হয় এমন অবস্থা। কথা কহিবার মানুষ নাই। সকালে উঠিয়া সে এখানে আসিয়া ডাক্তারখানায় বসে, দুপুরে ফিরিয়া স্নান ও রান্নাবান্না করে। আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া আবার হাটতলায় আসিয়া ডাক্তারখানা খোলে। চুপ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে, তারপর অন্ধকার ভাল করিয়া হইবার পূর্ব্বেই দত্তবাড়ি ফিরিয়া যায়, কারণ পথের দুধারের বনে বাঘের ভয় আছে।

রোগী বিশেষ আসে না। এসব অজ পাড়াগাঁয়ে লোকে চিকিৎসা করাইতে শেখে নাই, ঝাড় ফুঁক শিকড় বাকড়েই কাজ চালায়। বিপিন তাহা জানে, কিন্তু জানিয়া

উপায় কি? তাহার মত হাতুড়ে ডাক্তারের কোন্ সহরে স্থান হইবে?

বাড়িতে তাহার বাবার একজোড়া পুরানো চশমা পড়িয়াছিল, সেটা সে সঙ্গে আনিয়াছিল, ডাক্তারখানায় বসিবার বা দৈবাৎপ্রাপ্ত কোন রোগীর বাড়ি যাইবার সময় সেই চশমা চোখে লাগায়। কিন্তু সব সময় চোখে রাখা যায় না, সে চশমায় কাচের ভিতর দিয়া সব যেন ঝাপসা দেখায়, যুবকের চোখের উপযুক্ত চশমা নয়, কাজেই অধিকাংশ সময়েই চশমা চোখ হইতে খুলিয়া পুঁছিবার ছুতা করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিতে হয়।

আশপাশের গ্রাম হইতে মাঝে মাঝে লোক হাটবারে আসিয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে। তাহারা প্রায়ই নিরক্ষর চাষী, চশমা পরা ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত বলে, স্যালাম ডাক্তারবাবু, ভাল আছ? আপনার ডিস্‌পিন্‌সিল ভাল চলছেন?

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, বড্ড ডাক্তার গো। ভাল জায়গার ছাওয়াল, হাতের পানি খালি' ব্যামো সারে। চেহারাখানা ভাখছ না চাচা?

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। পসার যে খুব বেশি জমে, তা নয়। ইহারা নিতান্ত গরীব, পয়সা দিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই।

২

একদিন একজন লোক তাহাকে আসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটু দয়া করে যেতে হবে, রুগীর অবস্থা খুব সঙ্গিন। নরোত্তমপুরের যদু ডাক্তার এয়েছেন, আপনার নাম শুনে বললেন, আপনারে ডাক্তি। সলা পরামর্শ করবার জন্যি।

বিপিন গতিক সুবিধা বুঝিল না। যদু ডাক্তারের নাম সে শুনিয়াছে, তাহারই মত হাতুড়ে বটে তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অনেক দিন ধরিয়া নাকি এ কাজ করিতেছে আর সে একেবারে নূতন, যদি বিদ্যা ধরা পড়িয়া যায় তবে পসার একেবারে মাটি হইবে। বিপিন লোকটাকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে গম্ভীর মুখে কহিল, ওসব কনসাল করার ফি আলাদা। সে আপনি দিতে পারবেন ?

—কত লাগবে বাবু ? যদুবাবু যা বলে দেবেন তাই দেব।

—যদুবাবুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? তিনটাকা ফি দিতে পারবে ?

—হ্যাঁ বাবু, চলুন, তিনডে টাকাই দেবানু। মনিষ্যি আগে, না টাকা আগে ?

এত সহজে লোকটা রাজি হইবে, বিপিন ভাবে নাই। বিপদ তো ঘাড়ে চাপিয়া বসিল দেখা যাইতেছে। বলিল, গাড়ি নিয়ে আসতে হবে কিন্তু। হেঁটে যাব না।

রোগীর বাড়ি পৌঁছিয়া বিপিন দেখিল বাহিরের ঘরে একজন

রোগা মত প্রৌঢ় লোক বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, গায়ে কালো সার্জ্জের কোট ও সাদা চাদর, পায়ে কেম্বিসের ফিতা-আটা জুতা। বুঝিল ইনি যত্ন ডাক্তার। বিপিনের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

প্রৌঢ় লোকটি হাসিয়া কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন, নমস্কার। এসেছেন এ দেশে যখন তখন দেখা একদিন না একদিন হবেই ভেবে রেখেছি। বসুন।

বিপিন নমস্কার করিয়া বসিল। পাড়াগাঁয়ের চাষী লোকের বাহিরের ঘর, অন্তঃপুর যেদিকে, সেদিকে কেবল মাটির দেওয়াল, অন্য কোন দিকে দেওয়াল নাই। নতুন ডাক্তারবাবুকে দেখিবার জন্য বহু ছেলে মেয়ে ও কৌতূহলী লোক উঠানে জড় হইয়াছে।

এতগুলি লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ হওয়াতে বিপিন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাও সে বুঝিল আজ যদি সে জয়ী হইয়া ফেরে, তবে তাহার নাম ও পসার আজ হইতেই এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। জিতিতেই হইবে তাহাকে যে করিয়াই হউক।

যত্ন ডাক্তার বলিল, আপনার পড়াশুনা কোথায়?

বিপিন একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছিল যত্ন ডাক্তার সম্পর্কে, লোকটা শিক্ষিত নয়। বিপিন মামলা মোকর্দ্দমা সম্পর্কে রাণাঘাটে অনেক উকীল মোক্তারের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের কথাবার্ত্তার সুর ও ধরণ অন্য রকম। সে চশমার ভিতর দিয়া

যেন সম্মুখের নারিকেল গাছের মাথার দিকে চাহিয়া আছে এমন ভাবে চশমা শুদ্ধ নাকের ডগাটি খুব উচু করিয়া বেপরোয়া ভাবে বলিল, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে।

—ও! কোন বছর পাশ করেছেন?

—আজ তিন বছর হ'ল।

—এদিকে কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন?

লোকটা নিতান্ত গেঁয়ো বটে। ভাল লেখা-পড়া জানা লোকে এসব কথা প্রথম পরিচয়ের সময় জিজ্ঞাসা করে না। মানীদের বাড়ি সে এতকাল বৃথাই কাটায় নাই। সে খুব চালের সহিত বলিল, আই. এস. সি. পাশ করে ক্যাম্বেল স্কুলে ঢুকি।

যদু ডাক্তার যেন বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেল। বলিল, তা বেশ বেশ।

বিপিন মানীর প্রদত্ত ডাক্তারি বইগুলি পড়িয়া এটুকু বুঝিয়াছিল রোগ নির্ণয় জিনিষটা বড় সহজ নয় এবং ইহা লইয়া ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ ঘটিলে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা বোঝা শক্ত, যে কোন্ ডাক্তারের মত অভ্রান্ত।

সে বলিল, এ বাড়ির পেশেণ্টের রোগটা কি?

—রেমিটেণ্ট ফিভার। সঙ্গে রক্ত আমাশা আছে, দেখুন আপনি একবার।

বিপিন ও যদু ডাক্তার বাড়ির মধ্যে গেল। রোগীর বয়স উনিশ কুড়ির বেশী নয়, চেহারা রোগের পূর্ব্বে ভাল ছিল, বর্ত্তমানে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিপিনকে যদু ডাক্তার বলিল, আপনি দেখুন আগে।

বিপিন অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ি টিপিয়া বুকে পিঠে নল বসাইয়া পিঠ বাজাইয়া বুক বাজাইয়া দেখিয়া বলিল, একটু নিমোনিয়ার ভাব রয়েছে।

যদু ডাক্তার তাড়াতাড়ি বিপিনের মতেই মত দিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমি লক্ষ্য করেছি।

বিপিন সাহস করিয়া আন্দাজে বলিল, টাইফয়েডের দিকে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে। আজ ন' দিনের দিন বল্লেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ন' দিন। টাইফয়েডের কথা আমারও মনে হয়েছে—

বিপিন দেখিল লোকটা ভড়কাইয়া গিয়াছে, তাহার মতে মত দিতে খুবই আগ্রহ দেখাইতেছে। বলিল, আপনি একটা ভুল করেছেন যদুবাবু, কুইনেনটা দেওয়া উচিত হয় নি। প্রেস্ক্রিপশনটা দেখি ক'দিনের।

যদু সত্যই ভয় খাইয়া গিয়াছিল। সে দুখানা প্রেস্ক্রিপশন বিপিনের হাতে দিয়া ভয়ে ভয়ে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হাতুড়ে ডাক্তার আর এ তরুণ যুবক, ক্যাম্বেল স্কুল হইতে বছর দুই পাশ করিয়াছে, আধুনিক ধরণের কত রকমের চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত পরিচিত। কি ভুলই না জানি বাহির করিয়া বসে! যদু ডাক্তারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু বিপিন বুঝিল অনেক দূর আগাইয়াছে, আর বেশী নয়। যদু ডাক্তারকে হাতে রাখিলে এ সব পাড়াগাঁয়ে অনেক

সুবিধা। এ-অঞ্চলে তাহার যথেষ্ট পসার, সলাপরামর্শ করিতেও দু চার টাকা ভিজিট জুটাইয়া দিতে পারা তাহার হাতের মধ্যে।

সে গম্ভীর সুরে বলিল, চমৎকার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন। ঠিকই দিয়েছেন। কিছু বদ্‌লাবার নেই।

যদু ডাক্তার একবার সগর্ব্বে চারিধারের সমবেত লোকজনের দিকে চাহিল। তাহার মন হইতে বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

—যদুবাবু, একটু গরম জলের ফোমেণ্ট্‌ করলে বোধ হয় ভাল হয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমিও কাল থেকে তাই ভাবচি—

—আর একবার জোলাপটা দেওয়ান—

—জোলাপ, নিশ্চয়ই। আমিও তা—

ফিরিবার পূর্ব্বেই দুজনে খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। দুজনের কেহই বুঝিতে পারিল না, পরস্পরকে তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে কিনা।

৩

হাটতলায় বিপিনকে রোগীর আশায় বসিয়া থাকিতে হয় প্রায় সারাদিনই। রোগী যদি আসিত, তবে চুপ করিয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবার কষ্ট হয়তো পোষাইত, কিন্তু রোগী আসে না।

প্রথম মাস তুই রোগী হইয়াছিল, যত্ন ডাক্তারও কয়েকটি জায়গায় পরামর্শ করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রথম মাসে কুড়ি এবং দ্বিতীয় মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা আয় হইবার পরে বিপিনের মনে নতুন আশা, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। পাঁচ টাকা ব্যয় করিয়া সে কলিকাতা হইতে ডাকে একখানা বাংলা 'জ্বর-চিকিৎসা' বলিয়া বই আনাইল। ভারি উপকার হইল বইখানি পড়িয়া। যত্ন ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল তাহাকে দিয়া অস্‌লারের বিখ্যাত বইখানা কেনাইবে। বিপিন বলিতে পারে না যে সে ইংরাজি এমন কিছু জানে না যাহাতে করিয়া সে অস্‌লারের বই বুঝিতে পারে। সুতরাং সে কোনোরূপে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিল। তৃতীয় মাস হইতে কেন যে তুরবস্থা ঘটিল, তাহা সে বোঝে না।

প্রথম তুই সপ্তাহ তো শুধু বসিয়া। কে একজন এক ডোজ ক্যাষ্টর অয়েল লইয়া গিয়াছিল, তুই সপ্তাহের মধ্যে সেই একমাত্র রোগী ও খরিদ্দার।

মুদীর দোকানে বাকী পড়িতে লাগিল, ডাক্তারবাবু বলিয়া খাতির করে তাই ধারে জিনিষ দেয়, নতুবা কি বিপদেই পড়িতে হইত!

একদিন চুপ করিয়া বসিয়া আছে, প্রায় সন্ধ্যার সময় একজন লোক বিপিনের ডাক্তারখানার চালাঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, এইটে কি ডাক্তারখানা?

বিপিনের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো, কোত্থেকে আসচো বাপু?

—আপুনিই ডাক্তারবাবু? পেন্নাম হই। আপনাকে যাতি হবে নরোত্তমপুর। যদুবাবু ডাক্তার চিঠি দিয়েছেন, এই নিন্।

লোকটা একটা চিরকুট কাগজ বিপিনের হাতে দিল। বিপিন পড়িয়া দেখিল কলেরার রোগী, যদু ডাক্তার লিখিয়াছে তাহার স্যালাইন দিবার তোড়জোড় নাই, বিপিনকে সে সব লইয়া শীঘ্র আসিতে। বিলম্ব করিলে রোগী বাঁচিবে না।

স্যালাইন দিবার তোড়জোড় বিপিনেরও নাই। কিন্তু বিপিন একটা ব্যাপার বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইল। জলে লবণ গুলিয়া শিরার মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে বেশি বেগ পাইতে হইবে না। চিকিৎসা করিবার সাহস আছে বিপিনের! সে বাহির হইয়া পড়িল।

—শোনো, আমার বাক্সটা নিয়ে চল, পাঁচ টাকা দিতে হবে কিন্তু—

—চলেন বাবু আপনি। যদুবাবু যা বলে দেবেন, তাই পাবেন।

রোগীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া গৃহস্থের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া বিপিন ভাবিল, ইহাদের নিকট হইতে পাঁচ টাকা তো দূরের কথা, এক টাকা কি আট আনা পয়সা লইতেও বাধে।

যদু ডাক্তার বলিল, স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, বিপিনবাবু।

রোগীর ব্যাপার খুব সুবিধা নয়, বিপিন নাড়ী দেখিয়া বুঝিল। বলিল, এ তো শেষ হয়ে এসেছে যদুবাবু। এরকম ঘাম হচ্ছে, নাড়ী নেমে যাচ্ছে, কতক্ষণ টিক্‌বে ?

যদু ডাক্তার বিপিনের অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ লোক। সে আজ আট দশ বৎসর এই অঞ্চলে বহু রোগী ও বহুপ্রকার রোগের অবস্থা দেখিয়া আসিতেছে। সে বলিল, স্যালাইন দিন আপনি—টিকে যেতে পারে।

বিপিনের জিদ্ চাপিয়া গেল। সে বলিল, নুন জল গুলে ওর শির কেটে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অন্য কিছু ব্যবস্থা নেই। কিন্তু রোগী তার মধ্যেই মারা না যায়—

—আপনি শির কেটে নুনজল ঢোকান, আমি ওর মধ্যে নেই।

বিপিন অসীম সাহসী মানুষ। যে আসুরিক চিকিৎসা করিতে অভিজ্ঞ পাশ করা ডাক্তার ভয় খাইত, বিপিন তাহা আনায়াসে বুক ঠুকিয়া করিয়া ফেলিল। যদু বিপিনের কাণ্ড দেখিয়া ভয় খাইয়া বলিল—

—কত সি, সি দেবেন বিপিন বাবু ?

—সি, সি কি, সি কি মশাই এতে ? বাংলা নুন গোলা জল, তার আবার সি, সি। দেখুন আমি কি করি, আপনি যখন হাত দিচ্ছেন না।

এ পল্লীগ্রামের কোনো লোক এ ধরণের কাণ্ড দেখে নাই, ঘরের দোরের কাছে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া সবাই বিপিনের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ রোগী একেবারে অসাড় হইয়া পড়িল।

যদু ডাক্তার বলিল, বিপিনবাবু, হয়ে গেল বোধ হয়।

—হয় নি। ভয় খাবেন না—

বিপিনের কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বিপিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ রাখিবার জন্য একটা ইন্‌জেক্‌সন করিল, যদু ডাক্তারের বারণ শুনিল না। যদু বলিল, আপনি যা হয় করুন বিপিনবাবু, আমায় যেন এর পরে কেউ দোষ না দেয় তা বলে রাখছি।

বিপিন বলিল, যদুবাবু, সব সময় বই পড়ে ডাক্তারি চলে না, অন্ধকারে লাফিয়ে পড়তে হয়। বাঁচে না বাঁচে রোগী আমার যা ভাল মনে হচ্ছে, তা করে যাবো।

যদু ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেল।

রোগী আর নাই বলিলেই হয়। কান্নাকাটি বেজায় বাড়িয়াছে ঘরের বাহিরে। বিপিন আর দুবার ইন্‌জেক্‌সন করিল, রোগীর বিছানার পাশ ছাড়িয়া সে একটুও নড়িল না। তাহাকে যেন কি একটা নেশায় পাইয়াছে, কিসের ঘোরে সে কাজ করিয়া যাইতেছে সে নিজেই জানে না। আরও আধ ঘন্টা পরে রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। রোগীর চোখের চাহনি দেখিয়া বিপিনের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল যেন, সে লোকজন ঠেলিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল যদু ডাক্তার উঠানের গোলার তলায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে ও কয়েকজন গ্রাম্য লোকের সহিত কি কথা বলিতেছে।

—আসুন যদুবাবু, একবার নাড়ীটা দেখুন তো! আর ভয় নেই, সামলে নিয়েছে।

যদু ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিল, বেঁচে গেল এ যাত্রা। ওকে যমের মুখ থেকে টেনে বার করলেন মশাই।

যে ঘরে রোগী শুইয়া আছে, সে ঘরের মেঝেতে বন্যার জল কিছুদিন আগেও ছিল প্রায় একহাঁটু, বাঁশের মাচার উপর রোগী শুইয়া, ঘরে চারিদিকে চাহিয়া বিপিন দেখিল কয়েকটি দড়ির শিকা এবং ছেঁড়া কাঁথার পুঁটুলি ও হাঁড়িকুড়ি ছাড়া অন্য আসবাব নাই। ইহাদের কাছে ভিজিটের টাকা লইতে পারা যায়?

বিপিন ও যদু বাহিরে চলিয়া আসিল। যদু বলিল, একটা ডাব খাবেন? ওরে ব্যাটারা ইদিকে আয়, ডাক্তারবাবুকে একটা ডাব কেটে খাওয়া।

গ্রামশুদ্ধ লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিপিনের চিকিৎসা দেখিয়াছিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এত বড় ডাক্তার বা এমন চিকিৎসা তাহারা জ্ঞানে কখনও দেখে নাই। যদু ডাক্তার লোকটা চালাক, দেখিল এ স্থানে বিপিনের প্রশংসা করিলেই সে নিজে খাতির পাইবে, নতুবা লোকে ভাবিবে যদু ডাক্তারের হিংসা হইয়াছে। সুতরাং সে বক্তৃতার সুরে সমবেত লোকজনের সামনে বলিল, ডাক্তার অনেক দেখিচি, কিন্তু বিপিনবাবুর মত সাহস কোন ডাক্তারের দেখিনি। হাজার হোক পেটে বিদ্যে আছে কিনা? ভয়ডর নেই কিছুতেই।

একজন লোক গোটা চরেক কচি ডাব কাটিয়া আনিল। বিপিন বলিল, আমাদের ডাব তো দিচ্ছ, রুগীকে এখন অনবরত ডাবের জল দিতে হবে, সে তৈরী আছে তো ?

—খান বাবু, আপনাদের ছিচরণ আশীব্বাদে দশটা নারকেলের গাছ বাড়ীতে। বাবু সহর বাজার হ'লি এই গাছ কডার ফল বিক্রী করে বেশ কিছু প্যাতাম, এখানে জিনিসের দর নেই। কাপাসডাঙার হাটে ডাব একটা এক পয়সা তাও খদ্দের নেই।

৪

ফিরিবার সময় বিপিন ভিজিট লইতে চাহিল না। যদু ডাক্তার অনেক করিয়া বুঝাইল, পাড়াগাঁয়ে সবই এই রকম অবস্থার মানুষ। তাহা হইলে চলিবে কি করিয়া যদি ইহাদের নিকট ভিজিট না লওয়া যায় ?

বিপিন বলিল, তা হোক, যদুবাবু। আমি ডাক্তারি করছি শুধুই কি নিজের জন্যে, অপরের দিকটাও দেখি একটু। আচ্ছা যাই, আজ হাট বার। ডাক্তারখানা খুলি গিয়ে ওখানে। লোক এসে ফিরে যাবে।

বিপিন ভিজিট লইবে কি, মানীর কথা এসময় অনবরত মনে পড়িতেছে। মানী তাহাকে এ পথে নামাইয়াছে, যদি সে কোন গরীব রোগীর প্রাণ দান দিয়া থাকে তবে তাহার বাপ

মায়ের আশীর্ব্বাদ মানীর উপর গিয়া পড়ুক। মানীর লাভ হউক। এই অতি দুরবস্থাগ্রস্ত রোগীর নিকট সে মোচর দিয়া টাকা আদায় করিলে মানীর স্মৃতির সম্মান ঠিকমত বজায় রাখা হইত না।

কাপাসডাঙার হাটতলায় যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

আজ এখানকার হাটবার, পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট হাট, সবশুদ্ধ একশো কি দেড়শো লোক জমিয়াছে, খুচরা ঔষধ কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া থাকে।

কুমড়া বেগুন বিক্রয় করিয়া যে যেখানে চলিয়া গেল। বিপিন ডাক্তারখানা বন্ধ করিয়া পাশে বিষ্ণু নাথের মুদীর দোকানে হারিকেন লণ্ঠনটি ধরাইতে গেল। বিষ্ণু খরিদ্দারকে খৈল আর ক্রাসিন তৈল মাপিয়া দিতেছে। বিপিন বলিল, বিষ্ণু, বাড়ী যাবে না ?

বিষ্ণু বলিল, আমার এখনও অনেক দেরি ডাক্তারবাবু। এখন তবিল মেলাবো, কালকের তাগাদার ফর্দ্দ তৈরী করবো, আপনি যান। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার যে ভারি সুখ্যাত শোনলাম।

—কে করলে সুখ্যাত ?

—ওই সবাই বলাবলি করছিল। আজ কোথায় রুগী দেখে এলেন, তাকে নাকি শির কেটে নুনগোলা জল ঢুকিয়ে কলেরার রুগী একেবারে বাঁচিয়ে চাঙ্গা করে দিয়ে এসেছেন, এই সব কথা বলছিল। সবারই মুখে ঐ এক কথা।

যাহারা প্রশংসা চিরকাল পাইয়া আসিতেছে, তাহারা জানে না জীবনে কত লোক আদৌ কখনো ও জিনিসটার আস্বাদ পায়ই না। বিপিনকে ভাল বলিয়াছিল কেবল একজন, সে গেল অন্য ধরণের ব্যাপার। কাজ করিয়া অনাদিবাবুর সুখ্যাতি সে কোনোদিনই অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই প্রথম লোকে অযাচিতভাবে তাহার কাজকে ভাল বলিতেছে, তাহার ব্যক্তিত্বকে সম্মান দিতেছে, মানুষের জীবনে এ অতি মূল্যবান ঘটনা।

বিষ্ণু আরও বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনি নাকি ওরা গরীব বলে এক পয়সা নেন নি? সবাই বলছিল, কি দয়ার শরীল! মানুষ না দেবতা! গরীব বলে শুধু একটা ডাব খেয়ে চলে এলেন বাবু।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়া দুধারের ঘন বনের ভিতরকার সুঁড়িপথ বাহিয়া বিপিন প্রায় দেড় মাইল দূর রামনিধি দত্তের বাড়ী ফিরিল।

দত্ত মশায় চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তক্তপোষের উপর মাদুর বিছানো, সামনে কাঠের বাক্স, তাহার উপরে লণ্ঠন।

বলিলেন, আসুন ডাক্তারবাবু, আজ বাড়ীতে আমার জামাই মেয়ে এসেছে অনেক দিন পরে। আজ একটু খাওয়া দাওয়া আছে, তা আপনাকে আর হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে না। দুখানা লুচি না হয় অমনি গরীবের বাড়ী—

—বিলক্ষণ, সে কি কথা! তা হবে এখন। ওসব কি বলছেন? জামাইবাবু কই!

—বাড়ির মধ্যে গিয়েচেন। এতক্ষণ বাঁওড়ের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, চা খেতে ডাক দিলে তাই গেলেন। ওরে কেষ্ট, ডাক্তারবাবুকে চা দিয়ে যা. সন্দে আহ্নিক সেরে ফেলুন হাত পা ধুয়ে।

ইহারা কখনও চা খায় না। আজ জামাই আসিয়াছে, তাই চা খাওয়ার ও দেওয়ার ব্যস্ততা। বিপিনের হাসি পাইল।

একটু পরে দত্ত মশায়ের জামাই বাহিরে আসিল। বিপিনের সমবয়সী হইবে, দেখিতে শুনিতে খুব ভাল নয়, মুখে বসন্তের দাগ।

দত্ত মহাশয়ের কথায় সে বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া তক্তাপোষের এক পাশে বসিল।

বিপিন বলিল, জামাইবাবু কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে কুলে বয়ড়া। সেখানে তামাকের ব্যবসা করি।

—এখানে ক'দিন থাকবেন তো?

—থাকলো তো চলে না। এখন তাগাদা পত্তরের সময়, নিজে না দেখ্‌লে কাজ হয় না। পরশু যাবো ভাবচি।

জামাইয়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আজ এবেলা রান্নার হাঙ্গামা নাই বলিয়াই বিপিন নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিবার অবকাশ পাইয়াছে। দত্ত মশায়ের সঙ্গে অন্যদিন যে গল্প হয় তাহা বিপিনের তেমন ভাল লাগে না, দত্ত মহাশয়

শুধু রামায়ণ মহাভারতের কথা বলেন। আজ সমবয়সী একজন লোককে পাইয়া অনেকদিন পরে সে গল্প করিয়া বাঁচিল।

তামাক খাইবার উপায় নাই, দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় তাঁর খেয়াল হইল তিনি উপস্থিত থাকাতে ইহাদের ধূমপানের অসুবিধা হইতেছে। বলিলেন, তাহলে বসুন ডাক্তারবাবু, আমি দেখি খাওয়া দাওয়ার কতদূর হল, এদিকে রাতও হয়েছে।

৫

কিছুক্ষণ পর বাড়ীর ভিতর হইতে আহারের ডাক পড়িল।

পাশাপাশি খাইবার আসন পাতা হইয়াছে দত্ত মহাশয় ও জামাইয়ের। বিপিন ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাহার আসন একটু দূরে পৃথকভাবে পাতা।

একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের তরুণী লুচি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সলজ্জভাবে বিপিনের দিকে চাহিল।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, এইটি আমার মেয়ে। শান্তি, ডাক্তারবাবুকে প্রণাম কর মা।

তরুণী লুচির চুপড়ি নামাইয়া রাখিয়া বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তারপর সকলের পাতে লুচি দিয়া চলিয়া গেল।

বিপিনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল আর একদিনের কথা। মানীদের বাড়ী, সেও এই রকম জামাই আসিয়াছিল, রান্নাঘরে এই রকম জামাইবাবু, অনাদিবাবু ও সে খাইতে বসিয়াছিল। সেদিন আড়ালে ছিল মানী—দেড় বৎসর আগের কথা।

আর কি তাহার সঙ্গে দেখা হইবে? সম্ভব নয়। দেখা সাক্ষাতের সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর সে সম্ভাবনা নাই।

ভাবিতেই বিপিনের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। লুচির ড্যালা গলায় আটকাইয়া গেল, কান্না ঠেলিয়া আসে। মন হু হু করিয়া উঠিল। ইহারা কে? এই যে শ্যামা মেয়েটি আধ ঘোমটা দিয়া পরিবেশন করিতেছে, কে ও? বিপিন ইহাদের চেনে না। অতি সুপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ইহারা সবাই অপরিচিত। কোন দিক দিয়াই বিপিনের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই।

শান্তি আসিয়া পায়েসের বাটি প্রত্যেকের পাতের কাছে রাখিয়া সেই ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। দত্ত মহাশয় বিপিনের ডাক্তারির প্রশংসা করিতেছিলেন, শান্তি একমনে যেন তাহাই শুনিতেছিল।

বিপিন একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই শান্তির সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। শান্তি তাহারই দিকে চাহিয়াছিল এতক্ষণ নাকি? বিপিন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

দত্ত মহাশয় তাঁহার মেয়েকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তিনি লুচি খাইতে ভালবাসেন না, তবে কেন তাঁহাকে লুচি

দেওয়া হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের আহারাদির বিশেষত্ব আছে, পূর্বে অবস্থা ভাল থাকার দরুণই হউক বা যে জন্যই হউক, তাঁহার খাওয়া দাওয়া একটু সৌখীন ধরণের। তাঁহার জমিতে সাধারণতঃ মোটা নাগরা ধান হয়, কিন্তু সে ধানের চাল তিনি খাইতে পারেন না বলিয়া সেই ধানের বদলে উৎকৃষ্ট সরু চামরমণি ধান সংগ্রহ করিয়া আনেন সোনাতনপুরের বিশ্বাসদের গোলাবাড়ী হইতে। বারমাস তিনি এই চামরমণি ধানের চাল ছাড়া খান না। বাড়ীর আর কেহ নয়, শুধু তিনি। অন্য সকলের জন্য ক্ষেতের মোটা চালের ব্যবস্থা। তবে অতিথি-সজ্জন আসিলে অবশ্য অন্য কথা।

বড় বগী থালায় চূড়ার আকারে ভাত বাড়িয়া চূড়ার মাথায় ক্ষুদ্র কাঁসার বাটিতে গাওয়া ঘি দিতে হইবে। ঢাকনিওয়ালা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে তাঁহাকে জল দিতে হইবে। খুব বড় কাঁঠাল কাঠের সেকেলে পিঁড়ি পাতিয়া থালায় সুগোছাল করিয়া ভাত সাজাইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়া হয় না।

অনেকদিন পরে মেয়ে আসিয়াছে, দত্তমহাশয় একটু বেশি সেবা পাইতেছেন। পুত্রবধূরা শ্বশুরের সেবা যথেষ্ট করিলেও বিপত্নীক দত্ত মহাশয়ের তাহা মনে ধরে না। মেয়ে কেন ভাত সাজাইয়া না দিয়া লুচি খাওয়াইতেছে, ইহাই হইল দত্ত মহাশয়ের অনুযোগের কারণ।

খাওয়ার পর বিপিন বাহিরে যাইতে যাইতে দালানের পাশে জানালার দিকে চাহিল মানী দাঁড়াইয়া আছে? কেহ নাই।

রোজ তাহার খাওয়ার পরে বাহিরে যাইবার পথে এই জানালার ধারে সে দাঁড়াইয়া থাকিত। কি ছাই ভস্ম সে ভাবিতেছে! এটা কি মানীদের বাড়ি যে মানী দাঁড়াইয়া থাকিবে জানালায়? বাহিরে সে একাই আসিয়া তামাক খাইতে বসিল।

বেশ অন্ধকার রাত্রি। উঠানের নারিকেল গাছের মাথায় জট পাকান অন্ধকার কিন্তু ক্রমশঃ স্বচ্ছ তরল হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্ব দিগন্তে চাঁদ উঠিবার সময় হইল বোধ হয়। গোলার পাশে হাস্নুহানার ঝাড় হইতে অতি উগ্র সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। এমন রাত্রে ঘুম হয়?

শুধুই বসিয়া ভাবিতে ইচ্ছা করে।

আর কি কখনও তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না?

আজ যে ডাক্তার হিসাবে তাহার এত খাতিরযত্ন, লোক মুখে এত সুখ্যাতি, এ সব কাহার দৌলতে?

যে তাহাকে এ পথ দেখাইয়া দিয়াছিল সে আজ কোথায়?

আজ বিশেষ করিয়া ইহাদের বাড়ির এই জামাই আসার ব্যাপারে মানীদের বাড়ির তিন বৎসর পূর্ব্বের সে ঘটনা তাহার বিশেষ করিয়া মনে পড়িয়াছে। এমন এক দিনেই মানীর সঙ্গে তাহার আলাপ হয় আবার নূতন করিয়া, বাল্যের দিনগুলির অনেক, অনেক পরে। মানীর জন্য এত মন কেমন করে কেন?

বিপিন কত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে আরও বড় হইবে। ভাল করিয়া ডাক্তারি শিখিবে। মানীর যে দেওর

বীজপুরে থাকিয়া ডাক্তারি করে, তাহার কাছে গেলে কেমন হয়? বিপিন নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি অনুভব করে। সে ডাক্তারি খুব ভাল বোঝে। এ কাজে তাহার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু আরও ভাল করিয়া শেখা চাই জিনিষটা।

৬

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে বিপিন স্বপ্ন দেখিল মানী আসিয়াছে। হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, পোলাও কেমন খেলে বিপিনদা? তোমার জন্যে আমি নিজের হাতে—ভাল লাগল?

ঠিক তেমনি হাসি, সেই সুপরিচিত, অতি প্রিয় মুখ!

বিপিন বলিল, আমি মরে যাচ্ছি মানী, তোকে দেখতে না পেয়ে, তুই আমায় বাঁচা, আমায় ডাক্তারি শেখাবি নে বীজপুরে তোর দেওরের কাছে?

খুব ভোরে বিপিন হাত মুখ ধুইয়া সবে চণ্ডীমণ্ডপে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া বসিয়াছে, এমন সময় দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি এক কাপ চা আনিয়া রোয়াকের ধারে রাখিয়াই বিন্দুমাত্র না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন একটু অবাক হইয়া গেল। ইহাদের বাড়ির আবরু বড় কড়া, এতদিন এখানে আছে সে, বাড়ির কোন মেয়ে, অবশ্য

মেয়ে বলিতে দত্ত মহাশয়ের দুই পুত্রবধূ, কখনও তাহার সামনে বাহির হয় নাই। শান্তি যে বড় বাহিরে আসিয়া চা দিয়া গেল? তবে হাঁ, শান্তি তো আর ঘরের বউ নয়, বাড়ীর মেয়ে। তাহার আসিতে বাধা কি? সেদিন সারাদিনের মধ্যে শান্তি আরও অনেকবার বিপিনের সামনে বাহির হইল। শান্তি মেয়েটি বেশ সেবাপরায়ণা ও শান্ত। চেহারার মধ্যে একটা মিষ্টত্ব আছে, যদিও দেখিতে এমন কিছু সুশ্রী নয়।

এক জায়গায় ভালবাসা পড়িলে আর দু জায়গায় কিছু হয় না।

ভালবাসা এমন জিনিস, যাহা কখনও দুই নৌকায় পা দেয় না। হয় এ নৌকা, নয় ও নৌকা। কত মেয়ে তো আছে জগতে, কত মেয়ে তো সে নিজেই দেখিল, কিন্তু মানীর মত মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। আর কাহারও দিকে মন যায় না কেন?

পরবর্ত্তী দুই তিন দিনের মধ্যে বিপিন অনেকগুলি রোগী হাতে পাইল। রোজ সকালবেলা ডাক্তারখানা খুলিতে গিয়া দেখে যে ডাক্তারখানার সামনে হাটচালায় রীতিমত রোগীর ভিড় জমিয়া গিয়াছে, সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ম্যালেরিয়ার সিজন্ পড়িয়া গিয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যে সে ভিজিটই পাইল সাত আট টাকা।

বিপিনের ডাক্তারখানা এই সপ্তাহ হইতেই বেশ জমিয়া উঠিল। গোগা, মল্লিকপুর, সরুলে প্রভৃতি দূর গ্রাম হইতেও

তাহার ডাক আসিতে লাগিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যদু ডাক্তারের পশার একেবারে মাটি হইয়া গেল, নূতন ডাক্তারবাবু আসাতে।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, আপনার চেহারাখানার গুণে আপনার পশার হবে ডাক্তারবাবু। ডাক্তারের এমন চেহারা হওয়া চাই যে তাকে দেখলেই রোগীর রোগ আদ্ধেক সেরে যাবে। আপনার সম্বন্ধেও সকলেই সেই কথা বলে। যদু ডাক্তার আর আপনি! হাজার হোক আপনি হলেন ব্রাহ্মণ। কিসে আর কিসে!

বিপিন হিসাব করিয়া দেখিল সে পাঁচ মাস আদৌ বাড়ি যায় নাই। অবশ্য এই পাঁচ মাসের মধ্যে প্রথম তিন মাস কিছুই হয় নাই, শেষ দুই মাসে প্রায় দেড়শত টাকা আয় হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার সিজন্ এখনও পুরাদমে চলিবে আরও অন্ততঃ এক মাস। এই সময়ে একবার বাড়ি ঘুরিয়া আসা দরকার।

দশম পরিচ্ছেদ

১

যেদিন বিপিন বাড়ী যাইবার ঠিক করিয়াছে, সেদিন সকালে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপে জলখাবার দিতে আসিল। একখানা কাঁসিতে চালভাজা ও নারিকেল-কোরা, ইহাই জলখাবার। চা ইহারা বাঁধা নিয়মে খায় না, ক্বচিৎ

কখনো সর্দ্দি কাশি হইলে ঔষধ হিসাবে খাইয়া থাকে। সুতরাং মেয়েটি যখন জলখাবারের কাঁসি নামাইয়া সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত বলিল, সে চা খাইবে কি না, বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—চা হচ্চে?

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, যদি খান তো করে নিয়ে আসি।

—না শুধু আমার খাওয়ার জন্যে দরকার নেই।

—কেন দরকার নেই, নিয়ে আসচি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত গরম চা আনিয়া দিল। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে তাহার সহিত এত কথা ইহার পূর্ব্বে কখনো বলে নাই, যদিও আর দু একবার তাহাকে জলখাবার দিতে আসিয়াছিল। বিপিন ইহাদের বাড়ীর আবরু কড়া বলিয়াই জানে।

মেয়েটি চা দিয়া তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বিপিন ভাবিল পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্যই সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ব্যগ্রভাবে গরম চায়ের পেয়ালায় প্রাণপণে চুমুকের পর চুমুক দিতে দেখিয়া মেয়েটি হঠাৎ হাসিয়া বলিল, অমন করে তাড়াতাড়ি অত গরম খাওয়ার দরকার কি? আস্তে আস্তে খান—

বিপিন কথা বলিবার জন্যই বলিল, তুমি আর কত দিন আছ?

—এ মাসটা আছি।

—ও!

—আপনি নাকি আজ বাড়ী যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—ক'দিন থাকবেন ?

—দিন পনেরো হবে।

মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—অত দিন ?

পরক্ষণেই যেন কথাটা ও তাহার সুরটা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য বলিল—রুগীপত্তরও তো আছে আবার এদিকে—

—যত্ন ডাক্তার দেখবে আমার রুগী—একটা মোটে আছে।

—বাড়ীতে কে কে আছেন ?

—মা আছেন, আমার একটি বোন আর আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে।

—আপনার এখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়, না ?

—নাঃ, কি কষ্ট ! বেশ আছি, তোমার বাবা যথেষ্ট স্নেহ করেন, বড় ভাল লোক।

—তবে আমাদের এখানেই থাকুন।

—আছিই তো। কোথায় আর যাবো ধরো—

—যদি আমাদের গাঁয়ে বাস করেন, আমি বাবাকে বলে আপনাকে জমি দেওয়াবো। আসবেন ?

বিপিন বিস্মিত হইল। কখনো এ মেয়েটি তাহার সম্মুখে এত দিন ভাল করিয়া কথাই কয় নাই—আজ এত কথায় তাহাকে পাইয়া বসিল কোথা হইতে ? বলিল—তা কি করে হয়, পৈতৃক বাড়ী রয়েচে সেখানে—

—কিন্তু ডাক্তারি তো এখানেই করতে হবে—

—সে তো বটেই।

—আপনি আজ বাড়ী যাবেন কখন ?

—খেয়েদেয়ে যাবো দুপুরে।

—আমি চলে যাবার আগে আসবেন কিন্তু—

—ঠিক আসবো—নিশ্চয়ই আসবো—

মেয়েটি চায়ের পেয়ালা ও কাঁসি লইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন ভাবিল কেমন চমৎকার মেয়েটি। মনে বেশ মায়া আছে। হবে না কেন, কি রকম বাপের মেয়ে! দত্তমশায়ও চমৎকার মানুষ।

২

চা খাইয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়াই বিপিন যদু ডাক্তারের কাছে একখানি পত্র দিয়া একজন লোক পাঠাইয়া দিল—তাহার হাতের রোগীটি দেখিবার জন্য যত দিন সে না ফেরে। তাহার পর দোর বন্ধ করিয়া বাহির হইবে, এমন সময়ে দরজার এক পাশে মেঝের উপর একখানা খামের চিঠি পড়িয়া আছে দেখিয়া সেখানা তুলিয়া লইল। ইতিমধ্যে কখন পিওন আসিয়া চিঠিখানা বোধ হয় দরজার ফাঁক দিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। খামখানার উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত যেন দুলিয়া উঠিল। এ লেখা মানীর হাতের লেখার মত বলিয়া

মনে হয় যেন! বাড়ীর ঠিকানা ছিল, গ্রামের পোষ্টমাষ্টার সে ঠিকানা কাটিয়া এখানে পাঠাইয়াছে। নিশ্চয়ই মানীর চিঠি নয়—সে অসম্ভব ব্যাপার।

চিঠি খুলিয়া প্রথম দুই চার ছত্র পড়িয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না, নীচেয় নামটা একবার পড়িয়া লইতে গিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। মানীরই চিঠি। মানী লিখিয়াছে ঃ—

আলিপুর

শ্রীচরণকমলেষু, সোমবার

বিপিনদা, কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। কাল শেষ রাত্রে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি, যেন আমাদের বাড়ীর মাঝের ঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলচো। মন ভারি খারাপ হয়ে গেল, তাই এই চিঠি লিখছি তোমার বাড়ীর ঠিকানায়। পাবে কিনা জানিনে।

বিপিনদা, কত দিন সারারাত জেগেচি তোমার কথা ভেবে। সর্ব্বদা ভাবি, একটা কি যেন হারিয়েচি, আর কখনো পাবো না। যদি পলাশপাড়ার চাকুরী না ছাড়তে, তবে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। আমি শ্বশুরবাড়ী এসে বাবার চিঠিতে জানলাম তুমি আর আমাদের ওখানে নেই। আমার কথা তুমি রাখলে না, আমি বলেছিলাম আমাকে না জানিয়ে চাকুরী ছেড়ে দিও না। কেনই বা রাখবে? আমার সত্যিই বড় জানতে ইচ্ছে করে, তুমি আমার জন্যে কখনও কোনো দিন এতটুকু ভাবো কি না। হয়তো ভুলে গিয়েচ এতদিনে।

হয়তো আমার এ চিঠি পাবেই না, যদি পাও, আমার কথা একটু মনে কোরো বিপিনদা। তুমি আজকাল কি কর, জানতে বড় ইচ্ছে হয়।

আমার ঠিকানা দিলাম না, এ পত্রের উত্তর চাই না। কত বাধা জানো তো সবই। তুমি যদি আমায় একটুও মনে করো চিঠিখানা পেয়ে, তাতেই আমার সুখ। আমার প্রণাম নিও। আশীর্ব্বাদ কর, আর বেশী দিন না বাঁচি। ইতি

মানী

বিপিন চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া ডিস্‌পেনসারির ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, একি অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব হইয়া গেল। মানী তাহাকে চিঠি লিখিবে, একথা কখনও কি সে ভাবিয়াছিল? এতখানি মনে রাখিয়াছে তাহাকে সে!

অনেক দিন পরেই বটে। মানীর সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই। আজ এই চিঠিখানার ভিতর দিয়া এতকাল পরে বহুদূরের মানীর সহিত আবার দেখা হইল। এতদিন কি নিঃসঙ্গ মনে করিয়াছে নিজেকে—সে নিঃসঙ্গতা যেন হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। মানী তাহার জন্য ভাবে, আর কি চাই সংসারে?

মানী লিখিয়াছে, সে কি করিতেছে জানিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যদি বলিবার সুবিধা থাকিত, তবে সে বলিত, মানী, কি করচি জানতে চেয়েচ, তুমি যে পথের সন্ধান আমায় দয়া করে দিয়েছিলে, সেই পথই ধরেচি। তোমার মুখ দিয়ে যে

কথা বেরিয়েছিল, তাকে সার্থক করে তুলবো আমি প্রাণপণে। তুমি যদি এসে দেখতে, এখানে ডাক্তারিতে আমি কেমন নাম করেচি, তা হোলে কত আনন্দ পেতাম আজ। কিন্তু তা যে হবার নয়। কোনো রকমে যদি সে কথাটা জানাতে পারতাম!

বাড়ী ফিরিতেই দত্ত মহাশয়ের মেয়েটি তখনি আসিল। বলিল, উঃ কত বেলা হয়ে গেল, আপনি কখন আর রান্না করবেন, কখনই বা খাবেন আর কখনই বা বেরুবেন?

—এই এখুনি তাড়াতাড়ি নিচ্চি।

—তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? আমি দুধ জ্বাল দিয়ে এনে দিচ্চি, আর বাবার জন্যে সরু চিঁড়ে তোলা থাকে তাই এনে দিচ্চি। রান্নার হাঙ্গামা এখন আর করবেন না।

—তাই হবে এখন তবে।

—নেয়ে আসুন, তেল দিয়ে যাই।

মেয়েটির এই নূতন ধরণের যত্ন বিপিনের ভাল লাগিতেছিল। বিদেশে বিভূঁয়ে এমন যত্ন কে করে?

স্নান করিতে গেল নদীতে—ক্ষীণকায় নদী, স্থানীয় নাম মাংলা, কচুরিপানার দামে বুজিয়া আছে। ওপারে বাঁশবন আর ফাঁকা মাঠ, এপারে নদীর ঘাটে যাইবার সুঁড়িপথের দুধারে কেলে কোঁড়া ও শাম্‌লা লতার ঝোপ। শাম্‌লা লতায় এ সময় ফুল ফোটে, ভারি সুগন্ধ বাতাসে। ওপারে বাঁশবনে কুকো পাখী ডাকিতেছে। ধোপাখালি কাছারী

থাকিতে একজন প্রজা একজোড়া কুকো পাখী তাহাকে দিয়া গিয়াছিল, বেশ সুস্বাদু মাংস।

মাংলা নদীর যতখানি কচুরিপানায় বুজিয়া গিয়াছে, ততখানি জুড়িয়া সবুজ দামের উপর নীলাভ বেগুনি রঙের ফুল ফুটিয়াছে বড় বড় ডাঁটায়—যতদূর দেখা যায়, ততদূর ফুল, কি চমৎকার দেখাইতেছে!

আজ যেন সবই সুন্দর লাগিতেছে চোখে। যে মানীর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না, তারই হাতের লেখা চিঠিখানা! কি অপূর্ব্ব আনন্দ আর সান্ত্বনা বহন করিয়াই আনিয়াছে সেখানা আজ। সুপ্রভাত—কি অপূর্ব্ব সুপ্রভাত!

দত্ত মহাশয়ের মেয়ে একবার বাহিরের উঠানে আসিয়া বলিল—জায়গা করি?

—করো, আমি যাচ্চি।

মেয়েটি যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া জায়গা করিয়াছে, শুধু একখানা আসন দেখিয়া বিপিন বলিল, দত্ত মহাশয় খাবেন না?

—বাবা বাড়ী নেই, ওপাড়ায় বেরুলেন। তা ছাড়া এখনও রান্না হয়নি, শুধু আপনার চিঁড়ে দুধের ফলার—তাই আপনাকে খাইয়ে দিই। এতটা পথ আবার যাবেন—

সে একটি বড় কাঁসিতে ভিজানো চিঁড়ে লইয়া আসিল। বলিল, আপনি নাইতে গেলেন দেখে আমি চিঁড়েতে জল দিইচি—সরু ধানের চিঁড়ে, বেশী ভিজলে একেবারে ভাতের মত হয়ে যায়—দাঁড়ান, দুধ নিয়ে আসি—

কত যত্নের সহিত সে কলা ছাড়াইয়া দিল, গুড়ের বাটি হইতে গুড় ঢালিয়া দিল।

বিপিন খাইতে আরম্ভ করিলে বলিল, তেঁতুলের ছড়া-আচার খাবেন? বেশ লাগবে চিঁড়ের ফলারে। বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে চলিয়া গেল, আসিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল দেখিয়া বিপিন ভাবিল, বোধ হয় আচার ফুরাইয়া গিয়াছে—মেয়েটি জানিত না, লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছে বেচারী।

কিন্তু প্রায় দশমিনিট পরে সে একটা ছোট্ট পাথরের বাটিতে দু'তিন রকমের আচার আনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ কৈফিয়তের সুরে বলিল, আচারের হাঁড়ি, যে সে কাপড়ে তো ছোঁবার যো নেই, দেরি হয়ে গেল। এই যে করম্‌চার আচার, এ আমি আর বছর করে রেখে গিয়েছিলাম, বাবা খেতে বড় ভালবাসেন। দেখুন তো চেখে, ভাল আছে?

—বাঃ, বেশ আছে। তুমি আচার করতে জানো, বড় চমৎকার দেখচি যে—

মেয়েটি লাজুক হাসি হাসিয়া বলিল, এমন আর কি করতে জানি, মা থাকতে শিখিয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে আমার শাশুড়ীও অনেক রকম আচার করতে জানেন। এঁচড়ের আচার পর্য্যন্ত।

—আর কি কি আচার জানো?

—আমের জানি, নেবুর জানি, নংকার জানি—

—নংকার আচার বড় চমৎকার হয়, একবার খেয়েছিলাম—

—চিঁড়ে আর দুটো নেবেন ?

—পাগল ! পেট ভরে গিয়েচে, দুধ জ্বাল দেওয়া হয়েচে একেবারে ঘন ক্ষীর করে—

খাওয়া শেষ করিয়া বিপিন বাহিরে আসিল। ভাবিল, বেশ মেয়েটি। এমন দয়া শরীরে, এমন মমতা, যেন নিজের বোনটির মত বসে বসে খাওয়ালে।

মানীর কথা মনে পড়িল। মানী ও এই মেয়েটি যেন এক ছাঁচে ঢালাই, তবে প্রভেদও আছে, মানী মনে প্রেম জাগায় আর এ জাগায় স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি একটা নেকড়ায় জড়ানো গোটাকতক পান আনিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, পান ক'টা নিয়ে যান, রদ্দুরে জলতেষ্টা পাবে। পথের জল খাবেন না কোথাও, কবে ফিরবেন ?

বিপিনই উঠানেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, আজ আর বাড়ী যাবো না ভাবচি।

—মেয়েটি অবাক হইয়া বলিল, যাবেন না ?

—না, তাই বেলা দেখছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে। এত দেরিতে বেরুলে পথেই রাত হবে।

—তবে যাবেন না আজ। মিছিমিছি চিঁড়ে খেলেন কেন, কষ্ট পাবেন সারাদিন।

—ফাঁকি দিয়ে চিঁড়ের ফলার করে নিলাম। রোজ তো অদৃষ্টে এমন ফলার জোটে না—

মেয়েটি সলজ্জ হাসিয়া বলিল, তা কেন, ভালবাসেন চিঁড়ের ফলার ? কালই আবার খাবেন। বিপিনের ভারি ভাল লাগিল মেয়েটির এই কথাটি। এই অল্পক্ষণের মধ্যে মেয়েটি তার সরস মন ও কথাবার্ত্তার গুণে বিপিনকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েটি বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেও বিপিনের মনে হইতে লাগিল, আবার যদি সে আসে, তবে বেশ ভাল হয়। বিপিনের এ ধরণের মনের ভাব হয় নাই অনেক দিন।

কিন্তু বহুক্ষণ সে আসিল না। না আসুক, বিপিন আর জালে জড়াইবে না। কেহই শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে না ওরা। কেবল নাড়া দিয়া যায় এই মাত্র। কষ্টও দিয়া যায় খুব। মানী যেমন গিয়াছে, এও তেমনি চলিয়া যাইবে। দরকার কি এই সব আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া ?

মানী আলেয়া বটে—কিন্তু তার আলো তাহার মত পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইয়াছে। খুবই কষ্ট হয় মানীর জন্য, কিন্তু সেই কষ্টের মধ্যেও কি ব্যথাভরা অপূর্ব্ব আনন্দ আসে তাহার মুখখানি, তাহার সেই সপ্রেম দৃষ্টি মনে করিলে ! সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে পাইলে এ মনের ভাব থাকিত না, এ কথা এখন সে বোঝে।

৩

দত্ত মহাশয় দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, শান্তি বলছিল—আপনি বাড়ি যাবেন বলে শুধু দুটি চিঁড়ে খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন সারাদিন—

—বলেছে বুঝি? কষ্টটা কি? না না—বেলা বেশী হোল বলে আর যেতে পারলাম না। আপনার মেয়ে বড় যত্ন করেছে ওবেলা। বড় ভাল মেয়েটি—

—যত্ন আর কি করবে? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাদের সেবাযত্ন করব সে তো আমাদের ভাগ্যি। সে আর এমন বেশী কথা কি—

দত্ত মহাশয় সেকেলে ধরণের গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার অসাধারণ ভক্তি, কাজেই কথাটা তিনি অন্যভাবে লইলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া জমিজমাসক্রান্ত গল্প করিবার পর বলিলেন, এখানে কিছু ধানের জমি করে দিই আপনাকে। জমি সস্তা এখানে। বছরের ভাতের ভাবনা দূর হবে। ডাক্তারির ব্যাপার হচ্ছে, যেখানে পসার সেখানে বাস।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন বাড়ীর মধ্যেই। কিছুক্ষণ পরে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে আসিয়া বলিল, বাবা বললেন, আপনি কিছু খেয়ে যান—

—কি খাব এখন?

—পরোটা ভেজেচি খানকতক, আপনি আর বাবা খাবেন—ভাত খান নি ওবেলা, খিদে পেয়েছে—

বিপিন স্বাস্থ্যবান যুবক, সত্যই তাহার ক্ষুধা পাইয়াছিল। এ সব ধরণের মেয়েমানুষে মনের কথা জানিতে পারে—মানীকে দিয়া সে দেখিয়াছে। অগত্যা সে বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গেল। মেয়েটি ওবেলার মত যত্ন করিয়া খাওয়াইল—কিন্তু খুব বেশী কথা বলিল না, বোধ হয় দত্ত মহাশয় আছেন বলিয়াই।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, আপনার ওবেলা খাওয়া হয় নি বলে আমি ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমার মেয়ে ময়দা মাখতে বসেছে। আমি তো বিকেলে কিছু খাইনে। বললাম, কি হবে রে ময়দা এখন? তাই বললে, ডাক্তারবাবু ওবেলা ভাত খান নি, ওঁর জন্যে খানকতর পরোটা ভাজব। আমি তো তাতেই জানলাম।

ইতিমধ্যে গ্লাসে করে একবার জল দিতে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে আসিল। তাহার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বিপিনের মন শ্রদ্ধায় ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। মেয়েটি দেখিতে ভালই, মুখশ্রীও বেশ। এই নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনে এমন একটি স্নেহ পরায়ণা নারীর সান্নিধ্য পাওয়া সত্যই ভাগ্যের কথা।

বৈকালে সে নদীর ধার হইতে বেড়াইয়া আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছে, মেয়েটি আসিয়া বলিল, চা খাবেন? বারবার তাহাকে খাটাইতে বিপিনের কুণ্ঠা হইল। সে বলিল, না থাক। একটা পান বরং—

পান তো আনবই, চা-ও আনি। আপনি লজ্জা করেন কেন, চা তো আপনি খান—বললেই তৈরি করে দিই।

মিনিট কুড়ি পরে বিপিন চা খাইতে খাইতে মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল, ইহার কাছে মানীর কথা বলিবার জন্য। এর মন সহানুভূতিতে ভরা, এ তাহার মনের কষ্ট বুঝিবে। বলিয়াও সুখ।

ইচ্ছা হইল বলে—শোন শান্তি, তোমার মত একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব আলাপ। সে আমাকে খুব ভালবাসে, তোমার মতই করুণাময়ী, মমতাময়ী সে। আজ তোমার সেবাযত্ন দেখে তার কথা কত মনে হচ্ছে জান শান্তি ?

শান্তি বলিবে, বলুন না তার কথা বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে—

তারপর চোখে আগ্রহভরা দৃষ্টি লইয়া শান্তি তাহার সামনে বসিয়া পড়িবে, আর সে মানীর সহিত তাহার বাল্যের পরিচয়ের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সহিত শেষ সাক্ষাতের দিন পর্য্যন্ত সব কথা বলিয়া যাইবে। বৈকাল উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা নামিবে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া নামিবে জ্যোৎস্নারাত্রি, বাঁশ-বনের মাথায় জ্যোৎস্নালোকিত আকাশে দু'দশটা নক্ষত্র উঠিবে, গাছপালা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির ঝড়িয়া পড়িবে, গ্রাম নিশুতি নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, ডোবার ধারের জগড়ুমুর গাছের খোড়লে রোজকার মত লক্ষ্মীপেঁচাটা ডাকিবে, তখনও শান্তি গালে হাত দিয়া তন্ময় হইয়া এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া যাইতেছে ও মাঝে মাঝে আর্দ্র চক্ষু আঁচল দিয়া মুছিতেছে, আর সে অনবরত বলিয়াই চলিয়াছে—তবুও হয়তো বলা শেষ হইবে

না, হয়তো বা বলিতে বলিতে পূবে ফরসা হইয়া যাইবে, কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিবে, ভোরের কুয়াসায় মাৎলার ধারের আম-শিমুলের বাগান অস্পষ্ট দেখাইবে, অথচ শান্তি উঠিবে না, শেষ পর্য্যন্ত ঠায় বসিয়া শুনিবে।

এ কথা বলা যায় কার কাছে? যে মন দিয়া শোনে, যে ভালবাসে, সহানুভূতি দেখায়—যার মনে স্নেহ আছে, দয়া আছে, মায়া আছে। সে বুঝিবে, অন্যে কি বুঝিবে?

তেমনি মেয়ে এই শান্তি।

কোন্ দূর নক্ষত্রের দেবলোক হইতে শান্তির মত মেয়েরা মানীর মত মেয়েরা, পৃথিবীতে জন্ম নেয়?

চা খাওয়া হইলে শান্তি পান আনিল।

বিপিন বলিল, তুমি এখানে আর কতদিন থাকবে শান্তি?

—এ মাসটা আছি।

—তুমি চলে গেলে আমার বড় খারাপ লাগবে—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু বিপিনের মনে হইল, মেয়েটিকে এরূপ বলা উচিত হয় নাই। এ সব ধরণের কথা বলা হয়, যখন পুরুষ নারীমনের মুকুলিত প্রেমকে ফুটাইতে চায়। বিবাহিতা মেয়ে, কাল শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যাইবে—প্রেম জাগিলে মেয়েটিই কষ্ট পাইবে। বিপিন আর ও পথে পা দিবে না। মেয়েটি বোধ হয় সহজ ভাবেই কথাটা গ্রহণ করিল, নতুবা তাহার চোখে লজ্জা ঘনাইয়া আসিত। মানীকে দিয়া বিপিন ইহা অনেকবার দেখিয়াছে।

সে সরল ভাবেই বলিল, কেন ?

বিপিন ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। হাসিয়া বলিল—দুধ-চিঁড়ের ফলার ঘন ঘন জোগাড় হবে না।

বলিয়াই যেন পূর্ব্ব কথাটা পেটুক লোকের খেদোক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে, প্রমাণ করিবার জন্য সে নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনেক সময় প্রেম আসে করুণা ও সহানুভূতির ছদ্মবেশে। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে সরলা পল্লীবালা, লোককে খাওয়াইয়া মাখাইয়া সে হয়তো খুশি—একটা লোক কোন একটা বিশেষ জিনিষ খাইতে ভালবাসে, অথচ সে চলিয়া গেলে লোকটা তাহার প্রিয় সুখাদ্য হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা তাহার মনে সত্যকার করুণা জাগাইল।

সে মনে মনে ভাবিল, আহা, ডাক্তারবাবু, সরু ধানের চিঁড়ে খেতে এত ভালবাসেন! আমি চলে গেলে কে দেবে? উনি যে মুখচোরা, কাউকে বলতেও পারবেন না!

মুখে বলিল, আমার শ্বশুরবাড়ী কনকশাল ধানের চিঁড়ে হয়, খুব ভাল সরু চিঁড়ে আর কি সুগন্ধ! চিঁড়ে ভেজালে গন্ধ ভুর ভুর করে ঘরে। আমাদের বাড়ীর চেয়েও ভাল। আমি গিয়ে আপনার জন্যে পাঠিয়ে দেবো।

বিপিন ভাবিল, তা দেবে তা জানি। তোমাদের আমি চিনি।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া শান্তি দ্রুতপদে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

সেই দিনের ব্যাপারের পর থেকে বছর খানেক কাটিয়া গিয়াছে, পটল আর বীণার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করে নাই। ইহাতে প্রথম প্রথম বীণা খুব স্বস্তি অনুভব করিল। কিন্তু সপ্তাহ যখন পক্ষে এবং পক্ষ যখন মাসে এমন কি বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল—পটলের টিকি কোনদিকে দেখা গেল না, তখন বীণার মনে হইল তাহার মনের এই যে নিরঙ্কুশ স্বস্তি, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজলভ্য জিনিষ—বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত এই বৈচিত্র্যহীন স্বস্তি সে বরাবর ইস্তকনাগাৎ পাইয়া আসিয়াছে—ইহার মধ্যে কিছু নূতনত্ব নাই। নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য যাহার মধ্যে ছিল, তাহা তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

খুব অল্পদিনের জন্য—কতদিন? বছর দুই?—হাঁ, প্রায় দুই বছরের জন্য তাহার জীবনে এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছিল। পটলদা তাহাদের বাড়িতে আসে—আসিত, মায়ের সঙ্গে কি বলাইয়ের সঙ্গে গল্প করিয়া হয়তো বা একটা পান কিংবা এক গ্লাস জল, কখনো বা দুইই, চাহিয়া খাইয়া চলিয়া যাইত।

মায়ের ডাকে বীণাই পান জল আনিয়া দিত—কেন না মনোরমা ঘরের বউ, স্বামীর বন্ধুস্থানীয় লোকের সম্মুখে বাহির হইবার নিয়ম তাহাদের সংসারে নাই।

হয়তো পান দিতে আসিয়া পটল তুই একটা কথা বলিত, বীণা জবাব দিত। হয়তো পটল এক আধটা ছোটখাটো গল্প করিত, বীণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিত—ভাল লাগিত শুনিতে। হয়তো মা উঠিয়া যাইতেন সন্ধ্যাহ্নিক করিতে—বীণা ও পটল রোয়াকে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিত।

ক্রমে পটলদা যেন একটু ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করিল। পটলের সাড়া পাইলে বীণারও যেন কি হয়। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে, রান্নাঘরে বউদিদির কাছে বসিয়া কুট্‌না কুটিতে কি তেঁতুল কাটিতে কি বাটনা বাটিতে আর ভাল লাগে না। ছুটিয়া গেলে কে কি মনে করিবে, ধীরে ধীরেই যাইত—অন্য ছুতায় যাইত।

—মা, আজ কি বেগুন পোড়াতে আছে? বউদিদি বলছিল, আমি বললাম, আজ বুধবার, দাঁড়াও, জিগ্যেস করে আসি।

—আচ্ছা মা, পাকানো সলতেগুলো কুলুঙ্গিতে রেখে দিইচি, তার কি একটাও নেই—তুমি নাও নি?

—তোমায় কলসীতে জল আনতে হবেনা মা। বলো তো এখুনি আনি, আবার সন্ধ্যে হয়ে গেলে তখন—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারপর কে জানে আধঘণ্টা, কে জানে একঘণ্টা, সে আর পটলদা গল্পই করিতেছে, গল্পই করিতেছে। যতক্ষণ পটলদা বাড়িতে থাকিবে বীণা নড়িতে পারিত না সেখান হইতে।

ক্রমে পটলদা চাহিত একটু আড়ালে দেখা করিতে, বীণা তাহা বুঝিত।

বীণার কৌতূহল তখন বেশ বাড়িয়াছে, পুরুমানুষ একা থাকিলে কি রকম কথাবার্ত্তা চলে? পটলদা মজার মজার কথা বলে বটে। বীণার হাসি পায়, আনন্দও হয়। মা উপস্থিত থাকিলে পটলদা এ ধরণের কথা বলে না। হয়তো বীণার শোনা উচিত নয় এসব কথা, কিন্তু লাগে মন্দ নয়।

তারপর গ্রামে কথা উঠিল, দাদা বাড়ি আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বুঝাইলেন, বউদিদিই দাদার কানে উঠাইল এসব কথা, বলাই মারা গেল, পটলদা সন্ধ্যার সময় ছাদের পাশে বাগানে অন্ধকারে লুকাইয়া দেখা করিতে সুরু করিল, তাহাও একদিন বউদিদির চোখে গেল পড়িয়া—বীণার জীবনে সুখ নাই, আনন্দ নাই কোনদিক হইতে। একটুকু আলো আসিতে সবে আরম্ভ করিয়াছে যাই—অমনি সবাই মিলিয়া হৈ হৈ করিয়া জানালা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

২

সেদিন একাদশী।

বীণা সারাদিন মায়ের সঙ্গে নির্জ্জলা একাদশী করিয়া সন্ধ্যাবেলা মায়ের অনুরোধে একটু দুধ ও দুই একটা ফল খায়। একদিন ঘরে ফলের যোগাড় ছিল না—পাড়াগাঁয়ে থাকে না—মনোরমা বৈকালে বলিল, ও ঠাকুরঝি, মনুর মার

কাছ থেকে এক পয়সার পাকা কলা নিয়ে এসো তো? আমি ঘাটে বলছি ওকে। গিয়ে নিয়ে এস।

বীণা এ পাড়ার সকলের বাড়িতেই একা যাতায়াত করে—ও পাড়ায় কখনও একা যায় না। মনুর মা থাকে এই পাড়ারই সর্ব্বশেষ প্রান্তে, মধ্যে পড়ে ছোট একটা আম বাগান, সেটা পূর্ব্বে ছিল বীণার বাবা বিনোদ মুখুয্যের নীলাম খরিদা সম্পত্তি, আবার ওপাড়ার শ্রীশ বাঁড়ুজ্জে বিপিনের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। একটি আমগাছের নাম 'সোনাতলী,' বীণা ছেলেবেলায় এখানে আম কুড়াইতে আসিত—যখন তাহাদের নিজেদের বাগান ছিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—কি চমৎকার আম ছিল সোনাতলীর। কত বছর এ গাছের আম খাই নি—এবারে খুড়ীমাদের কাছ থেকে দুটো চেয়ে আনবো আমের সময়।

হঠাৎ সে দেখিল পটলদা বাগানের পথ দিয়া বাগানে ঢুকিতেছে। বীণার বুকের রক্ত যেন টল্ খাইয়া উঠিল। এখন সে কি করে? বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? পটলদা তাহাকে দেখিতে পায় নাই—কারণ সে বাগানের কোণাকুণি পথটা বাহিয়া বোধ হয় মুচিপাড়ার দিকে যাইতেছে। পটলদার সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই।

হঠাৎ বীণা নিজের অজ্ঞাতসারে ডাক দিল, ও পটলদা?

পটল চমকিয়া উঠিয়া চারিদিকে কেমন করিয়া চাহিতেছে দেখিয়া বীণার হাসি পাইল।

—এই যে, ও পটলদা!

পটল বিস্মিত ও আনন্দিত মুখে কাছে আসিল।

—তুমি? কোথায় যাচ্ছ?

—যেখানেই যাই। তুমি ভাল আছ?

—তাতে তোমার কি? আমি ম'রে গেলেই বা তোমার কি?

—বাজে বোকো না পটলদা। ও সব কথা বলতে নেই।

—কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল!

বীণা চুপ করিয়া রহিল।

—আমার কথা একটুও ভাবতে বীণা? সত্যি বল।

—বলে লাভ কি পটলদা? যা হবার হয়ে গিয়েছে।

—আমিও তো সেই জন্যে আর যাই না। তোমার নামে কেউ কিছু বললে আমার ভাল লাগে না। তাই ভেবে দেখলাম, দেখা না করাই ভাল, কিন্তু তা বলে ভেবো না যে তোমায় ভুলে গিয়েছি।

বীণা কোন কথা বলিল না।

পটল বলিল, আচ্ছা বীণা, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও—আম-বাগানের মধ্যে কথা কইতে দেখলে কে কি ভাববে—যে আমাদের গাঁয়ের লোক—এসো তুমি—

—তুমি আজকাল সেই কোথায় চাকরী করতে সেখানে কর না?

—সে চাকরী গিয়েছে। এখন ব'সে আছি।

—কতদিন চাকরী নেই?

—প্রায় তিন মাস। সংসারে বড় টানাটানি চলেছে—তাই যাচ্ছি মুচিপাড়ায় রঘু মুচির কাছে কিছু খাজনা পাব—গিয়ে বলি, খাজনা না দিস তো দুখানা গুড়ই দে।

—আচ্ছা এসো পটলদা।

৩

বীণা বাড়ি ফিরিয়া সারাদিন কেমন অন্যমনস্ক রহিল। পটলদার চাকুরী গিয়াছে। তাহার সংসারে বড় কষ্ট। ইচ্ছা হয়—কিন্তু সে ইচ্ছায় কি কাজ হইবে? ইচ্ছা থাকিলেও বীণার এক পয়সা দিয়াও সাহায্য করিবার সামর্থ্য নাই। তাহাকে কি পটলদা কিছু দিয়াছিল?

প্রথমে বীণা লইতে রাজি হয় নাই। বিধবা মানুষে সাবান কি করিবে? একশিশি গন্ধ তেল শেষ পর্য্যন্ত লইয়াছিল, লুকাইয়া লুকাইয়া নারিকেল তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া একশিশি গন্ধতেল দুই তিন মাস চালাইয়া দিল।

এক আধটা সহানুভূতির কথা বলা উচিত ছিল। ভুল হইয়া গিয়াছে, অত তাড়াতাড়ি আমবাগানের মধ্যে কি সব কথা মনে আসে? পটলদার সংসারটি নিতান্ত ছোট নয়, বেচারী চালাইতেছে কি করিয়া? আহা!

সন্ধ্যাবেলার দিকে মনোরমা নদীর ঘাট হইতে আসিল। ছেলেমেয়ে খাই খাই করিয়া জ্বালাতন করিতেছে, মনোরমা

বলিল, ঠাকুরঝি, ওদের জন্যে একখোলা চাল ভেজে দাও না? ভাত হতে এখন অনেক দেরি। খাক, ততক্ষণ গুড় দিয়ে। মরছে খিদে খিদে করে।

বীণা বলিল, কোন চাল ভাজব বউদি? সেদিনকের সেই মোটা নাগরা আছে, দিব্যি ফোটে—তাই ভাজি, হ্যাঁ?

বীণার মা বলিলেন, আগে সন্ধ্যেটা দেখা না তোরা, অন্ধকার তো হয়ে গেল মা—আর কখন—

মনোরমা ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ফর্সা কাপড় পরিয়া উঠানের তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, ও ঠাকুরঝি, আমায় কিসে কামড়াল, শীগগির এস—

বীণা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া গেল, কি হল বউদি?

সে রোয়াক হইতে উঠানে পা দিবার পূর্ব্বেই মনোরমা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, সাপ! সাপ! অজগর গোখরো—গোলার পিঁড়ির মধ্যে, ও মা, ও ঠাকুরঝি—

বীণা ততক্ষণ ছুটিয়া মনোরমার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সে কিছু দেখিতে পাইল না। মনোরমা উঠানে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিটকাইয়া উঠানে পড়িয়া তেল সলিতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মনোরমা বলিল, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে ঠাকুরঝি—আমায় ধর।

বীণার মা বলিলেন, শীগগির কেষ্ট ঠাকুরপোকে ডাক,

জীবনের মাকে ডাক, ওমা, আমার কি হ'ল গো, যা যা শীগগির যা, হে ঠাকুর, হে হরি, রক্ষে কর বাবা—

বীণা বলিল, চেঁচিও না মা, আমি ডেকে আনছি, এখানে তার আগে ছুটো বাঁধন দিই, গামছাখানা দাও—

মিনিট পনরো মধ্যে গাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল বিপিনের বউকে সাপে কামড়াইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এপাড়া ওপাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল বিপিনদের উঠানে। ভীম জেলে ভাল ওঝা, সে আসিয়া গাঁটুলি করিল, মন্ত্র পড়িল, ঝাঁড়ফুক চালাইল, মনোরমা অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার মাথায় ঘড়া করিয়া জল ঢালা হইয়াছে, তাহার মাথার দীর্ঘ কেশরাশি জলে কাদায় লুটাইতেছে, সেদিকে তখন কাহারও লক্ষ্য করিবার অবকাশ ছিল না, রোগিণীর অবস্থা লইয়া সকলে ব্যস্ত।

কৃষ্ণলাল মুখুজ্জে বলিলেন, সতীশ ডাক্তারের কাছে কে গেল? ও হরিপদ, তুমি একবার সাইকেলখানা নিয়ে ছোট।

পটলও আসিয়াছিল, সে ভাল সাইকেল চড়িতে জানে, বলিল, আমি যাচ্ছি কাকা। হরিপদ ভাই, তোমার সাইকেলখানা—

বীণা দেখা গেল খুব শক্ত মেয়ে। সে অমন বিপদে হাত পা হারায় নাই, ছুটাছুটি করিয়া কখনও জল, কখনও নুন, কখনও দড়ি আনিতেছে, সম্প্রতি বউদিদির মাথাটা উঠানে লুটাইতেছে দেখিয়া সে মাথা কোলে লইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল।

বিপিন দুপুরের পূর্ব্বেই সোনাতনপুর হইতে রওনা হইয়া হাঁটিয়া আসিতেছিল, বেলা ছোট, আমতলীর বাঁওড়ের কাছে আসিয়াই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

বিড়ি নাই পকেটে, ফুরাইয়া গিয়াছে, পথের পাশেই শরৎ ঘোষের মুদির দোকান। এখনও প্রায় আধক্রোশ পথ বাকী তাহাদের গ্রামে পৌঁছিতে, বিড়ি কিনিতে সে দোকানে ঢুকিল। শরৎ বলিল, দাদাঠাকুর, এলেন নাকি আজ? তামাক ইচ্ছে করুন—বসুন, বসুন।

—না আর তামাক খাব না সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, এক পয়সার বিড়ি দাও আমায়।

—তা দিচ্ছি, দাদাঠাকুর বসুন না। তামাকটা খেয়ে যান, এতটা হেঁটে এলেন।

বিপিন তামাক খাইতে খাইতে বলিল, আখের গুড়ে এবার কেমন হ'ল শরৎ?

কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দাদাঠাকুর। পুঁজিপাটা সব খেয়ে গেল—স' ন আনা মণ, কিনলাম, বেচলাম সাড়ে সাত, আট। সেদিন আর নেই দাদাঠাকুর, ডাহা লোকসান। তবে কি করি, লেখাপড়া তো শিখি নি আপনাদের মত। খাই কি ক'রে বলুন?

—আইনদ্দি চাচার খবর জান? ভাল আছে?

—বেশ আছে, পরশু বেলতার মাঠে বিচুলি তুলতে গিয়ে দেখি বুড়ো দিব্যি খুঁটির মত ব'সে ধানের শাল পাহারা দিচ্ছে।

—আচ্ছা, আসি শরৎ।

—দাঁড়ান দাদাঠাকুর, পাকাটির মশাল আমার করাই আছে, একটা জ্বেলে নিয়ে যান—ওরে, নিয়ে আয় তো গোলার তলা থেকে একটা মশাল! ক'দিন থাকবেন বাড়ি?

—থাকব আর কই? তিন চার দিনের বেশী—রুগীপত্তর ফেলে—

সদর রাস্তা দিয়া গেলে খুব ঘুর হয় বলিয়া সে গ্রামে ঢুকিয়াই নদীর ধারের রাস্তাটা ধরিল। এ দিকটা জনহীন, শুধু বৈঁচিবন, নিবিড় বাঁশবন ও আমবাগান। সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়ে এ পথে বড় কেহ একটা হাঁটে না, যদিও বাঘ নাই, কিংবা কালেভদ্রে এক আধটা কেঁদো বাঘ বাহির হইবার জনশ্রুতি শোনা যায় মাত্র। সুতরাং বিপিনের সহিত কাহারও দেখা হইল না।

বাড়ির কাছাকাছি তাহাদের নিজেদের জমির সীমানায় ঘাটের পথের চালতা গাছটার তলায় যখন সে পৌঁছিয়াছে, তখন একটা গোলমাল ও কান্নার রব তাহার কানে গেল। কোন্‌দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে ভাল ঠাহর করিতে পারিল না। একটু আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া শুনিল।

এ কি! তাহাদেরই বাড়ির দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে না। তাহার বুকের ভিতরটা একমুহূর্ত্তে যেন ভয়ে অসাড় হইয়া গেল। কি হইয়াছে তাহাদের বাড়িতে? না—তাহাদের বাড়ি নয়, এ যেন কেষ্ট কাকাদের কিংবা পরাণ নাপিতের বাড়ির

দিক হইতে—তাই হইবে, তাহাদের বাড়ি নয়। পরক্ষণেই সে দ্রুতপদে দুরু দুরু বক্ষে বাড়ির দিকে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে চলিল

আর কিছু দূর গিয়া বিপিনের আর কোনো সন্দেহ রহিল না। এ কান্নার রব যে তাহার মায়ের গলার! পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে সে বাড়ীর পিছনের পথে আসিতেই তাহাদের উঠানের ভিড় দেখিতে পাইল। তাহাকেও দুই চারজন দেখিয়াছিল—তাহারা ছুটিয়া আসিল তাহার দিকে। সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন কৃষ্ণলাল মুখুজ্জে।

—এসো এসো বিপিন, বড় বিপদ—এসো—

বিপিনের গলা দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না, ভয়ে ও বিস্ময়ে সে কেমন হইয়া গিয়াছে। বলিল, কি—কি, কেষ্ট কাকা, ব্যাপার কি ?

ভিড়ের ভিতর হইতে বীণা কাঁদিয়া উঠিল, ও দাদা, শীগগির এসো, বৌদিদি যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল গো !

মনোরমা ? মনোরমার কি হইয়াছে ? বিপিন ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর.হইবার চেষ্টা না করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ইহার উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। দুই তিন জন হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

কে একজন বলিয়া উঠিল, আহা, সতীলক্ষ্মী বউ বটে, স্বামীও একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির—এদেরই বলে সতীলক্ষ্মী—

বিপিন গিয়া দেখিল উঠানে তুলসীতলার কাছেই মনোরমা মাটিতে শুইয়া। মাথার চুল মাটিতে লুটাইতেছে। সারাদেহ অসাড়, নিস্পন্দ।

বিপিন আর যেন দাঁড়াইতে পারিল না। বলিল, কি হয়েছে কেষ্ট কাকা?

—সাপে কামড়েছিল। যাচ্ছিলেন বৌমা পিদিম দিতে নাকি তুলসীতলায়—

চার পাঁচজন লোক একসঙ্গে ঘটনাটা বলিতে গিয়া পরস্পরকে বাধা দিতে লাগিল। বিপিনের মা তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীণা কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নাড়ী দেখিয়া বলিল, নাড়ী নেই বটে—কিন্তু কেষ্ট কাকা, এ মরে নি এখনও। বীণা,শীগগির জল গরম করে নিয়ে আয়—সতীশ ডাক্তারের কাছে একজন যা তো কেউ—

বলিতে বলিতে সতীশ ডাক্তারকে লইয়া পটল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সতীশ ডাক্তার ও বিপিন দুইজনে কিছুক্ষণ দেখিল। বিপিন বলিল, আশা আছে বলে মনে হচ্ছে না কি? ইথার ইন্ ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে দেখা যাক্ নাড়ী আসে কিনা—এ রকম রোগী আমি একটা দেখেছিলাম অবিকল এই লক্ষণ। এ মরে নি এখনও।

—ইথার ইন্ ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে কি হবে? দ্যাখো দিয়ে—

এ মরে নি সতীশবাবু। কতকটা ভয়ে, কতকটা বিষের ক্রিয়ায় এমন হয়েছে—আমার মনে হয় গোখরো সাপ নয়—এ ঠিক শেকড়চাঁদা সাপ—এই রকম লক্ষণ সব প্রকাশ পায়। কেউ দেখেছিল সাপটা ?

বীণা বলিল, বউদিদি বলেছিল অজগর গোখরো সাপ—গোলার সিঁড়িতে ছিল—আমি কিছু দেখি নি অন্ধকারে—

সতীশ ডাক্তার বলিলেন, ও কিছু না, ভয়ে অনেক সময় ও রকম হয়। উনি ভয়ে তখন চারিদিকে গোখরো সাপ তো দেখবেনই। অন্ধকারে কি দেখতে কি দেখেছেন—

মনোরমাকে ধরাধরি করিয়া রোয়াকে লইয়া যাওয়া হইল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত সতীশ ডাক্তার রহিল। পটল যথেষ্ট উপকার করিল, ছোটাছুটি করা, ইহাকে উহাকে ডাকাডাকি করা। রাত দুপুর পর্য্যন্ত সে বিপিনদের বাড়ীতেই রহিল। বিপদের সময় অন্য কথা মনে থাকে না—গরম জল আনিতে পটল কতবার রান্নাঘরে গেল—বীণা যেখানে একাই ছিল, ছেলেমেয়েদের ও দাদার জন্য রান্না না করিলে তাহারা খাইবে কি ? বীণার মা বউয়ের শিয়রে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া আছেন আর হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন।

৪

চারদিন পরে বিপিন মনোরমাকে বলিল—কাল যাব গো, এসেছিলাম দুটো দিন থাকবো বলে—তুমি যে ভয় দেখিয়েছিলে তাতে দেরি হয়েই গেল এমনি—

মনোরমা হাসিয়া বলিল, ম'লেই বেশ হোত, না ?

—না না ওসব কথা বলতে নেই। ঘরের লক্ষ্মী মরতে যাবে কেন ? ছিঃ !

মনোরমা একটু অবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিল। এত আদরের কথা সে স্বামীর মুখে কতকাল শোনে নাই। ভাগ্যিস সাপে কামড়াইয়াছিল ! উঃ—

মুখে বলিল, ছেলেমেয়ে দুটো ছোট ছোট—নয়তো আর কি ? তোমায় রেখে যেতে পারা তো ভাগ্যির কথা গো।

বিপিন বলিল, আর আমার জন্যে বুঝি কিছু না ?

মনোরমা হাসিল। সে গুছাইয়া কথা বলিতে পারে না কোনো কালেই, মনের মধ্যে কি আছে বুঝাইতে পারে ন। সে বোঝে কাজকর্ম্ম, খাওয়ানো মাখানো, নিখুঁতভাবে সংসার চালানো। স্বামীকে সে ভালবাসে কি না বাসে, তা কি মুখে বলা যায় ? ছেলেমেয়ের মা, এখন সে গিন্নিবান্নি মানুষ, অমন ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বলা তাহার আসে না।

বলিল, না গো তা নয়। আমি মরে গেলে তুমি আর

একটা বিয়ে করে সুখী হতে পারো—কিন্তু ওরা আর মা পাবে না।

বিপিন দুঃখিত হইল। সত্যই আজ যদি মনোরমা মারা যাইত! কখনো সে মনোরমাকে একটা মিষ্টি কথা কি ভালবাসার কথা বলিয়াছে? না পাইয়া না পাইয়া মনোরমার সহিয়া গিয়াছে। ও সব আর সে প্রত্যাশা করে না, পাইলে অবাক্ হইয়া যায়। মনে ভাবিল—আমার হাতে পড়ে ওর দুর্দ্দশার একশেষ হয়েছে। ভাল খাওয়া কি ভাল কাপড় একখানা কোনোদিন—বা কখনও কিছু দেখলেও না। সংসারের হাঁড়ি ঠেলে আর বাসন মেজে জীবনটা কাটলো ওর।

সে বলিল, হ্যাঁ, ভাল কথা। কাল দুটো ভাত সকালে সকালে যেন হয়। পিপলিপাড়া যাব কাল।

মনোরমা বলিল, তা কেন? কাল যেও না। বিদেশে থাকো, একদিন একটু পিটে-নাটা করি, সেখানে কে করে দিচ্ছে, খেয়ে যেও।

বিপিন জানে মনোরমা মিষ্টি কথা কহিতে জানে না বটে, কিন্তু এ সব দিকে তাহার খুব লক্ষ্য। কিন্তু তাহার থাকিবার উপায় নাই। মনোরমাকে বুঝাইয়া বলিল, হাতে রোগী আছে পিঠে খাইবার জন্য বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

হাসিয়া বলিল, যাবে আমার সঙ্গে সেখানে? চল পিঠে খাওয়ানোর লোক নিয়ে যাই—

মনোরমা বলিল, ওমা, আমি আবার বুড়োমাগী সংসার

ফেলে গরুবাছুর ফেলে মা বীণা এদের রেখে তোমার সঙ্গে বাসায় যাবো কি করে ?

যেন প্রস্তাবটা নিতান্তই আজগুবি।

মনোরমা বলিতে পারিত, চল তোমার সঙ্গেই যাই, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। তোমার কাছে আমার কেউ নয়।

বিপিনের খুব ভাল লাগিত তাহা হইলে।

বিপিন ভাবিল—মনোরমার শুধু সংসার, সংসার আর সংসার! ওই এক ধরণের মেয়েমানুষ—

৫

পিপলিপাড়ায় পৌঁছিল প্রায় সন্ধ্যাবেলা। দত্ত মশায় বাড়ী নাই, আজ দিন দুই হইল বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ী কুমারপুরে গিয়াছেন কি কাজে। দত্ত মশায়ের ছেলে অবনী তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে ডাক্তারবাবু! দুটো রুগী এসে ফিরে গিয়েছে কাল। এত দেরী হোল যে? হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করুন।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শান্তি এক হাতে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ও অন্য হাতে একটা বাটিতে মুড়ি ও নারিকেল-কোরা লইয়া আসিল। বাটিটা বিপিনের হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল, এত দেরি করলেন যে?

—উঃ সে আর বোলো না শান্তি। কি বিপদেই পড়ে গিয়েছিলাম!

শান্তি উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, কি? কি?

—আমার স্ত্রীকে সাপে কামড়েছিল।

—সাপে! কি সাপ?

—রক্ষে যে জাত সাপ নয়, শেকড়চাঁদা বলেই আমার ধারণা। সে কি ঘটনা হোল শোনো—সেদিন তো এখান থেকে গেলাম সেই—

বলিয়া বিপিন সেদিনকার তাহার বাড়ী যাওয়ার পথে কান্নাকাটির রব শোনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া গেল, শান্তি অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।

বর্ণনা শেষ হইয়া গেলে শান্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, ভগবান রক্ষে করেছেন। নইলে কি হোত আজ বলুন দিকি? মুড়ি খান, আমি চা নিয়ে আসি—কি বিপদেই পড়ে গিয়েছিলেন!

শান্তি চা আনিয়া দিল। বলিল, আজ আর রাঁধতে হবে না আপনাকে—আমাদের তা রান্না হবেই—ওই সঙ্গে আপনাকে দুখানা পরোটা ভেজে দিতে এমন কিছু ঝঞ্ঝাট হবে না।

—রোজ রোজ তোমাদের ওপর—

—ওসব কথা বলবেন না ডাক্তারবাবু। আপনি পর ভাবেন, কিন্তু আমি—

—না না, সে কথা না—পর ভাববো কেন শান্তি? তা হবে এখন—দিও এখন—

শান্তি খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিল। কথা বলিয়া আনন্দ পাওয়া যায় ইহার সঙ্গে। বেশীর ভাগ কথা হইল মনোরমাকে লইয়াই। মনোরমার কথা আজ আসিবার সময় বিপিন সারাপথ ভাবিয়াছে। তাহার আকস্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনাটা যতই মনে হইতেছে, বিপিনের মন ততই মনোরমার প্রতি স্নেহে ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে।

শান্তি বলিল, দেখাবেন একদিন বউদিদিকে?

—কি করে দেখাবো শান্তি! সে তো এখানে আসছে না।

—আমায় একদিন নিয়ে চলুন সেখানে।

—তুমি যাবে কি করে?

—আপনার সঙ্গে যাবো। গরুর গাড়ী একখানা না হয় দুটাকা ভাড়া নেবে।

—আমার সঙ্গে একা যাবে?

—কেন যাবো না?

বিপিন আশ্চর্য্য হইল শান্তির নিঃসঙ্কোচ ভাব দেখিয়া। মেয়েটি শুধু সরলা নয়, ইহার মনে সাহস আছে। অবশ্য সে শান্তিকে সত্যই লইয়া যাইতেছে না, বহু বাধা তাহাতে, সে জানে। তবুও শান্তি যে নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত যাইতে চাহিল—ইহাতেই উহার মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

হঠাৎ শান্তি একটি ভারি ছেলেমানুষি প্রশ্ন করিল।

—আচ্ছা, পটলের ক্ষেতে মেয়েমানুষ যাওয়া বারণ কেন জানেন ?

—তা তো জানি না শান্তি। তবে শুনেছি বটে—

বিপিন কারণটা খুব ভাল রকমই জানে, সে পাড়াগাঁয়েরই ছেলে। কিন্তু শান্তির সামনে সে কথা বলিতে তাহার বাধিল।

শান্তি দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, আমি জানি। বলবো ? মেয়েমানুষ অযাত্রা, পটলের ক্ষেতে ঢুকলে পটল ফলবে না— তাই নয় ? আচ্ছা, মেয়েমানুষ কি সত্যই অযাত্রা ?

বিপিন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, কে বলেছে ওসব কথা ? এ কথা তোমার মাথায় উঠলো কেন হঠাৎ ?

—না, কিছু না, এমনি মনে পড়ে গেল। আপনাদের গাঁয়ের দিকে এ নিয়ম আছে, না ?

—শুনেছি বটে, বললাম তো। বলে বটে। তবে মেয়েরা অযাত্রা এ কথা যে কেউ বলুক, আমি বিশ্বাস করি না। মেয়েরা অনেক উপকার করেছে আমার জীবনে। এই ধরো আমি তোমায় দিয়েই বলি—কেমন চিঁড়ের ফলার খাওয়ালে সেদিন —খেয়েদেয়ে নিন্দে করবো এমন মহাপাতকী আমি নই।

বলিয়া বিপিন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শান্তি সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, আপনার ওই এক কথা। যান।

—না, যাবো কেন, আমি অনেয্য কথা কি বলেছি বলো।

তোমার যত্নের কথা যখন ভাবি শান্তি, তখন—সত্যিই বলচি—অমন খাওয়ানো অন্ততঃ—

—আচ্ছা, আচ্ছা থাক। আর আপনার ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি যাই, বউদিদি একা রান্না ঘরে—গিয়ে ময়দা মাখবো—

—একটা পান পাঠিয়ে দিও গিয়ে। পেয়ালাটা নিয়ে যাও।

—না থাকুক। আপনার পান নিয়ে আসি, পেয়ালা নিয়ে যাবো।

বিপিনের মনে একটি অদ্ভুত তৃপ্তি। এ ধরণের সেবা সে চায়—মানীই কেবল সে সাধ মিটাইয়াছিল কিছু দিন—আবার এই শান্তি কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে।

বেচারী মনোরমা এ ধরণটা জানে না। সেও সেবা করে, কিন্তু সে অন্যরকমের। তাহা পাইয়া এমন আনন্দ হয় না কেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

সেদিন সকালে বিপিন রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া ঔষধ বিক্রীর হিসাবের খাতা দেখিতেছে, এমন সময় শান্তি পিছন হইতে এক প্রকার চুপি চুপি আসিল—উদ্দেশ্য বোধ হয় বিপিনকে চমকাইয়া দেওয়া বা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার সাহচর্য্যের

আনন্দ দান করা। উদ্দেশ্য খুব সুস্পষ্ট না হইলেও সে এমনি প্রায়ই করে আজকাল। বিপিনও শান্তির সঙ্গে মিলিতে মিশিতে পূর্ব্বের মত সঙ্কোচ বা জড়তা অনুভব করে না।

সামনে ছায়া পড়িতেই বিপিন পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল শান্তি হাসি মুখে দাঁড়াইয়া। বিপিন কিছু বলিবার পূর্ব্বে শান্তি বলিল—কি করচেন ?

বিপিন বলিল—এসো শান্তি, হিসেব দেখচি—

—একটা কথা বলতে এলাম, কাল চলে যাচ্চি এখান থেকে—

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কোথায় ? কোথায় যাবে !

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—বাঃ, কোথায় কি ! আমার যাবার জায়গা নেই ! এখানে কি চিরকাল থাকবো ? বলেচি তো সেদিন আপনাকে।

—ও ! শ্বশুর বাড়ী যাবে ?

—হুঁ, উনি আসবেন কাল সকালে।

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। দু একটা কথা যাহা সে ঝোঁকের মুখে বলিতে যাইতেছিল চাপিয়া গেল। মেয়েদের ভালবাসা লইয়া সে আর নাড়াচাড়া করিবে না! যাহা হইয়াছে যথেষ্ট। শান্তি বিবাহিতা মেয়ে, তাহাকে সে কিছুই বলিবে না ওসব কথা। শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষই কষ্ট পায়। না, উহার মধ্যে আর নয়।

শান্তি যেন একটু দুঃখিত হইল। সে যাহা বিপিনের মুখে

শুনিবার আশা করিয়াছিল তাহা না শুনিতে পাইয়া যেন নিরাশ হইয়াছে। বলিল—এখন আর অনেক দিন আসবো না—

বিপিন বলিল—কবে আসবে।

—তার কিছু কি ঠিক আছে? তা বেশ, যখনই আসি, আসি আর নাই আসি, আপনার আর কি!

শান্তি এ ধরণের কথা কেন বলিতে আরম্ভ করিল হঠাৎ! কি জবাব দিবে এ কথার সে?

তবুও বিপিন বলিল—না, আমার কিছু নয়, আমার কিছু নয়, তোমায় বলেচে! আমার খাওয়ার মজাটা তো সকলের আগে নষ্ট হোল।

—বৌদিদিদের বলে যাচ্চি, সে সবের জন্য কিছু কষ্ট হবে না আপনার। তা বলে আর কোনো কষ্ট রইল না তো?

বলা চলিত এবং বলিতেও ইচ্ছা হইতেছিল, শান্তি তুমি চলে গেলে আমার এ জায়গা আর ভাল লাগবে না। দিনের মধ্যে সব সময় তোমার কথা মনে হবে। কেন আমায় আবার এ ভাবে জড়ালে শান্তি?

বিপিন সে ধরণের কথার ধার দিয়াও গেল না। . বলিল—তা তোমাদের বাড়ী যত্ন যথেষ্টই পেয়ে আসচি, তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় না পেলে আমার এখানে ডাক্তারী করাই হোত না—

শান্তি মুখ ভার করিয়া বলিল—আপনার কেবল ওই সব কথা। কি করচি আমরা? আপনি ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাকে

আশ্রয় দিইচি—অমন কথা বুঝি লোকে বলে ? সত্যি, বলবেন না আর ও কথা। বলতে নেই।

পরদিন শান্তির স্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিন ডিস্‌পেন্‌শারি হইতে ফিরিয়া দুপুরে নিজের ছোট্ট চালায় রাঁধিতে বসিয়াছে, শান্তি সেখানে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া দুই পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—যাচ্চি।

—যাচ্চি বলতে নেই, বলতে হয় আসচি।

—যদি আর না-ই আসি ?

—বলতে নেই ও কথা। এসো, আসবে বৈ কি—

—বলচেন আসতে তো ! তা হোলে আসবো, ঠিক আসবো। শান্তি কথা শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বিপিনের মনে হঠাৎ বড় করুণা ও সহানুভূতি জাগিল ইহার উপর। যাইবার সময় একটা কথা শুনিয়া যদি সে খুসি হয়, আনন্দ পায় ! মুখের কথা তো, কেন এত কৃপণতা !

সে বলিল—তুমি চলে যাচ্চ, সত্যি, মনটা খারাপ হয়ে গেল বড্ড।

শান্তি বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া এক ধরণের অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলিল—আপনার মন খারাপ হবে ? ছাই !

বিপিন অবাক হইয়া গেল শান্তির চমৎকার ফিরিবার ভঙ্গিটি দেখিয়া।

সে উত্তর দিল—ছাই না, সত্য সত্য বলচি।

শান্তি হাসিমুখে বলিল—আচ্ছা আসি।

কথা শেষ করিয়া সে আর দাঁড়াইল না।

পলকে প্রলয় ঘটাইয়া দিয়া গেল শান্তি। ইহাও ওই শান্ত মেয়েটির মধ্যে ছিল! বিপিন ভাবেও নাই কোন দিন। ওর এ অদ্ভুত নায়িকামূর্ত্তি এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল কেমন করিয়া? মেয়েরা পারে—ওদের ক্ষমতার সীমা নাই। অবস্থাবিশেষে দশমহাবিদ্যার মত এক রূপ হইতে কটাক্ষে অন্য রূপ ধরিতে উহারাই পারে।

শান্তি চলিয়া গেলে গোটা বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। রোজ সন্ধ্যার সময় শান্তি চা করিয়া আনিত সে ডাক্তারখানা হইতে ফিরিলেই। আজ সন্ধ্যায় আর কেহ আসিল না। দত্ত মহাশয়ের পুত্রবধূদের অত দায় পড়ে নাই। বিপিন নিজেই একটু চা করিয়া লইল। সংসারের ব্যাপারই এই, চিরদিন কেহ থাকে না। মানীকে দিয়াই সে জানে। জালে জড়াইব না বলিলেই কি না জড়াইয়া থাকা যায়? কোথা হইতে আসিয়া যে জোটে!

সন্ধ্যায় উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বিপিন রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া খানিক বসিল। বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—তিন চার দিন আগেও শান্তি এ সময়টা তাহাকে চা দিতে আসিয়া গল্প করিয়াছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, রোজই করিত। আজ সত্যই ফাঁকা ঠেকিতেছে, কিছু ভাল লাগিতেছে না। নিজের মনের অবস্থা দেখিয়া সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শান্তি তাহার

কে? কেউ নয়, দুদিনের আলাপ—এই তো কিছুদিন আগেও সে ভাবিত, মানীর মত ভালবাসা জীবনে আর কাহারও সঙ্গে কখনো হইবার নয়—হইবেও না। মানী ছাড়া আর কাহারও জন্য মন খারাপ হইতে পারে—এ কথা কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ বলিলে সে কি বিশ্বাস করিত? এখন সে দেখিয়া বুঝিতেছে মনের ব্যাপার বড়ই বিচিত্র, কেহই বলিতে পারে না কোন পথে কখন তাহার গতি।

বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আজকাল সন্ধ্যার পর বাহিরে আসেন না। আজ কি মনে করিয়া তিনি বিপিনের রান্নাঘরে আসিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খানিক গল্পগুজব করিলেন। শান্তির কথাও একবার তুলিলেন, মেয়েটি আজ চলিয়া গেল। কন্যা-সন্তানের মত সেবা যত্ন কে করে, পুত্রবধূরাও তো আছে, তেমনটি আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, ইত্যাদি।

—বিপিন বলিল শান্তি বড় ভাল মেয়েটি।

—অমন চমৎকার সেবা আর কারো কাছে পাইনে ডাক্তারবাবু। আমার এই বুড়ো বয়সে এক এক সময় সত্যই কষ্ট পাই সেবার অভাবে। কিন্তু ও এখানে থাকলে—আর ব্রাহ্মণের ওপর বড় ভক্তি। আপনার চাটুকু, জল খাবারটুকু ঠিক সময়ে সব দেওয়া, সেদিকে খুব নজর। বাড়িতে যদি কোন দিন ভাল কিছু খাবার তৈরি হয়েছে, তবে আগে আপনার জন্যে তুলে রেখে দিত।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া গেলে বিপিন খাইতে বসিবার উদ্যোগ করিল। এ সময়টা দু একদিন শান্তি দালানের জানালায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিত, ও ডাক্তারবাবু, একটু দুধ আজ বেশী হয়েছে আমাদের, আপনার খাওয়া হয়েছে, না হয় নি? নিয়ে আসবো?

মানী গেল, শান্তি গেল। এই রকমই হয়। কেহই টিকিয়া থাকে না শেষ পর্য্যন্ত।

২

পরদিন সকালে ডাক্তারখানায় আসিল ভাসানপোতা মাইনর স্কুলের সেই বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিপিন তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। শেষবার যখন তাহার সঙ্গে দেখা, তখন মানীদের বাড়ি সে চাকুরী করে, মানীর গল্প করিয়াছিল ইহার কাছে। বিশ্বেশ্বর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত কোনো নারীর প্রেম যোটে নাই। বিশ্বেশ্বর কি করিয়া জানিল সে পিপলিপাড়ার হাটতলায় ডাক্তারখানা খুলিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর বলিল—আপনি খবর রাখেন না বিপিনবাবু, আমি আপনার সব খবর রাখি। আপনাদের গাঁয়ের কৃষ্ণ চক্কত্তির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়—ভাসানপোতায় ওঁর বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েচেন না? তাঁর মুখেই আপনার সব কথা শুনেচি। তা আপনার কাছে এসেচি একটা বড় দরকারী কাজে। আপনাকে একটি রুগী দেখতে এক জায়গায় যেতে হবে।

বিপিন বলিল—কোথায় ?

—এখান থেকে ক্রোশ দুই হবে—জেয়ালা-বল্লভপুর।

—জেয়ালা-বল্লভপুর ? সে তো চাষা-গাঁ। সেখানকার লোককে আপনি জানলেন কি করে ? রুগী আপনার চেনা ?

বিশ্বেশ্বর কেমন যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা জানা বই কি। চলুন একটু শীগগির করে তা হোলে।

দুপুরের কিছু পূর্ব্বে দুজনে হাঁটিয়া উক্ত গ্রামে পৌঁছিল। বিপিন পূর্ব্বে এ গ্রামে কখনো আসে নাই, তবে জানিত জেয়ালার বিল এ অঞ্চলের খুব বড় বিল এবং গ্রামখানি বিলের পূর্ব্ব পাড়ে। বিলের মাছ ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে এরূপ জেলে ও বাগ্দী এবং কয়েক ঘর মুসলমান ছাড়া এ গ্রামে কোনো উচ্চবর্ণের বাস নাই।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু গ্রামের মধ্যে গেল না। বিলের উত্তর পাড়ে গ্রাম হইতে কিছু দূরে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। তাহার তলায় ছোট একটি চালাঘরের সামনে বিশ্বেশ্বর তাহাকে লইয়া গেল।

বিপিন বলিল—রুগী এখানে না কি ?

—হ্যাঁ, আসুন ঘরের মধ্যে। সোজা চলুন, অন্য কেউ নেই।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন দেখিল একটি স্ত্রীলোক, জাতিতে বাগ্দী কিংবা দুলে, ঘরের মেঝেতে পুরু বিচালির উপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুইয়া আছে। স্ত্রীলোকটির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হইবে, রং কালো, চুল রুক্ষ, হাতে কাচের চুড়ি, পরণে ময়লা শাড়ি। জ্বরের ঘোরে রোগিণী বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছে।

বিপিন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—এর নিমোনিয়া হয়েচে—তুদিকই ধরেচে। খুব শক্ত রোগ। খুব সেবা যত্ন দরকার। বড্ড দেরীতে ডেকেচেন আমাকে—তবুও সারাতে পারি হয় তো কিন্তু এর লোক কই? খুব ভাল নার্সিং চাই—নইলে—

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ বিপিনের তুই হাত ধরিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বলিল—বিপিনবাবু, আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে রুগীকে—যে করেই হোক, আপনার হাতেই সব, আপনি দয়া করে—

বিপিন দস্তুরমত বিস্মিত হইল। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর এত মাথাব্যথা কিসের তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। এ বাগ্দী মাগী মরে বাঁচে তা বিশ্বেশ্বরের কি? ইহার আপন আত্মীয়-স্বজন কোথায় গেল?

বিশ্বেশ্বর বলিল—চলুন গাছতলাটার ধারে মাতুরটা পেতে দি, ওখানটাতে বসুন—তামাক সাজবো?

বিপিন গাছতলায় গিয়া বসিল। বিশ্বেশ্বর তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটি বিপিনকে দিবার পূর্ব্বে মলিন জামার পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিতে গেল। বিপিন বলিল—আগে বলুন মেয়েটা কে—আপনি এর টাকা দেবেন কেন, এর লোকজন কোথায়?

বিশ্বেশ্বর বলিল—কেন, আপনি শোনেন নি কোনো কথা?

—না, কি কথা শুনবো?

বিশ্বেশ্বর মাতুরের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল। বলিল—ওর নাম মতি। বাগ্দীদের মেয়ে বটে, কিন্তু অমন মানুষ

আপনি আর দেখবেন না। ভাসানপোতায় ওর বাপের বাড়ী, অল্প বয়সে বিধবা হয়। আপনি তো জানেন, আপনাকে বলেছিলাম মেয়েমানুষের ভালবাসা কি জীবনে কখনো জানিনি। কিন্তু এখন আর সে কথা বলতে পারি নে ডাক্তারবাবু। ও বাগ্‌দী হোক, দুলে হোক, ওই আমায় সে জিনিষ দিয়েছে—যা আমি কারু কাছে পাইনি কোনো দিন। তারপর সে অনেক কথা। ভাসানপোতা ইস্কুলে চাকুরীটি সেই জন্যে গেল। ওকে নিয়ে আমি এই জেয়ালা বল্লভপুরে এলাম। সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলাম ইস্কুলের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের, তাতেই চলছিল। আর ও মাছ বেচে, কাঠ ভেঙে, শাক তুলে আর কিছু রোজগার করতো। তারপর পূজোর আগে আমি পড়লাম অসুখে। টাকাগুলো ব্যয় হয়ে গেল। ও কি করে আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে সে অসুক থেকে! তারপর এই রোজ সকালে ঠাণ্ডা বিলের জলে শাক তুলে তুলে এই অসুখটা বাধিয়েচে। এখন ওকে আপনি বাঁচন—এ সব কথা নিয়ে ভাসানপোতায় তো খুব রটনা—আমায় গালাগাল আর কুচ্ছো না করে তারা জল খায় না। তাই বলচি আপনি শোনেন নি কিছু?

বিপিন অবাক হইয়া বিশ্বেশ্বরের কথা শুনিতেছিল। এমন ঘটনা সে কখনো শোনে নাই। শুনিয়া তাহার সারা মন বিশ্বেশ্বরের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ছি, ছি, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া শেষকালে কি না বাগ্‌দী মাগীর সঙ্গে—নাঃ, আজ কি

পাপই করিয়াছিল সে, কাহার মুখ দেখিয়া না জানি উঠিয়াছিল!

সে বলিল—টাকা রাখুন, টাকা দিতে হবে না। কিন্তু দামী ওষুধ কিছু লাগবে। এন্টিফ্লজিষ্টিন্ একটা কিনে আনুন, আমার কাছে নেই, লিখে দিচ্চি, আনিয়ে নিন। প্রেস্‌ক্রিপশন একটা করে দিই—শক্ত রোগ—

বিশ্বেশ্বর ব্যাকুল ভাবে বলিল—বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?

—নার্সিং চাই ভাল। আর পথ্যি—

বিশ্বেশ্বর বিপিনের হাতে ধরিয়া বলিল—ওষুধগুলো আপনি লিখে দিয়ে গেলে হবে না, আনিয়ে দিন। এ গাঁয়ের কোন লোক আমার কথা শুনবে না। এই ঘটনার জন্যে সবাই—বুঝলেন না? কেউ উঁকি মেরে দেখে যায় না। আপনিই ভরসা, ডাক্তারবাবু।

বিপিন বিরক্ত হইল। ভাল বিপদে পড়িয়াছে সে! সে নিজে এখন সেই রাণাঘাট হইতে এ্যান্টিফ্লজিষ্টিন আনিতে যাইবে? টাকাই বা দিতেছে কে?

সে বলিল—আমার ডাক্তারখানায় যদি থাকতো তবে আলাদা কথা ছিল। আমার কাছে ও সব থাকে না। আপনি এক কাজ করুন, গরম খোলের পুলটিশ দিন। রাই সর্ষের খোল হলে খুব ভাল হয়। তাও যদি না পান, গরম ভাতের পুলটিশ দিন। আর আমার ডাক্তারখানায় আসুন, ওষুধ দিচ্চি।

বিশ্বেশ্বর বিপিনের সঙ্গে আবার ডাক্তারখানায় আসিল। ডাক্তার হিসাবে বিপিন এ কথাও ভাবিল যে, ওই কঠিন রোগীর

মুখে জল দিবার কেহই রহিল না কাছে, বিশ্বেশ্বর যাতায়াতে চার ক্রোশ হাঁটিয়া ঔষধ লইয়া যাইতে দুই ঘণ্টা তো নিশ্চয় লাগাইবে, এ সময়টা একা পড়িয়া থাকিবে ওই মেয়েটা ?

পরক্ষণেই ভাবিল—তুমিও যেমন ! দুলে বাগ্‌দী জাত, ওদের কঠিন জান্—ওদের ওই অভ্যেস।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু সারাপথ মতি বাগ্‌দীনীর নানা গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে চলিল। অমন মেয়ে হয় না, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বিশ্বেশ্বরের গত অসুখের সময় বুক দিয়া সেবা করিয়াছে—প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা খরচ করিতে দেয় না, নিজে শাক পাতা তুলিয়া, ঘুনিতে মাছ ধরিয়া বেচিয়া যাহা আয় করে, তাহাতেই সংসার চালাইতে বলে। অমন ভালবাসা বিশ্বেশ্বর আর কখনো কাহারও কাছে পায় নাই।

হঠাৎ বিপিন বলিল—রাঁধে কে ?

—ওই রাঁধে ! আমি ওর হাতেই খাই—ঢাকবো কেন ? যে আমায় অত ভালবাসে, তার হাতে খেতে আমার আপত্তি কি ? ও আমার জন্যে কম ছেড়েচে ? ওর বাবা ভাসানপোতা বাগদী পাড়ার মধ্যে মাতব্বর লোক, গোলায় ধান আছে, চাষী গেরস্থ। খাওয়া-পরার অভাব ছিল না। সে সব ছেড়ে আমার সঙ্গে এক কাপড়ে চলে এসেচে। আর এই কষ্ট এখানে—হিম জলে নেমে শাক তুলে রোজ চিংড়িঘাটায় বাজারে বিক্রি করে আসে—কাঠ ভাঙে, মাছ ধরে, ধান ভানে। এত কষ্ট ওর বাপের বাড়ী ওকে করতে হোত না—তাও কি পেট পুরে খেতে

পায়? আর ওই তো ঘরের ছিরি দেখলেন—ইস্কুলের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড থেকে পঞ্চান্নটি টাকা পেয়েছিলাম—তা আর আছে মোট বাইশটি টাকা—আর ঘরখানা করেছিলাম দশ টাকা খরচ করে, আমার অসুখের সময় ব্যয় হয়েছে বারো তেরো টাকা—আর বাকী টাকা বসে বসে খাচ্ছি আজ চার মাস—তাহোলে বুঝুন পেট ভরে খাওয়া জুটবে কোথা থেকে!

লোকটার জাত নাই। বাগ্দীনীর হাতের রান্নাও খায়। স্ত্রীলোকের ভালবাসার দায়ে কিনা শেষে জাতিকুল বিসর্জ্জন দিল!

ঔষধ লইয়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেল। যাইবার সময় বার বার বলিয়া গেল, কাল একবার বিপিন যেন অবশ্য করিয়া গিয়া রোগী দেখিয়া আসে।

৩

বিপিন পরদিন একাই রোগী দেখিতে গেল। জেয়ালা পৌঁছিতে প্রায় বৈকাল হইয়া আসিল, সম্মুখে জ্যোৎস্না-রাত—এই ভরসাতেই দুপুরে আহারাদি করিয়া রওনা হইয়াছে। ঘরখানার সামনে গিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়া উত্তর পাইল না। অগত্যা সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে রোগিণী কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি অঘোর অবস্থায় বিচালি ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুইয়া

আছে। বিশ্বেশ্বরের চিহ্ন নাই কোথাও। ব্যাপার কি, মেয়েটিকে এ অবস্থায় ফেলিয়া গেল কোথায় ?

বিপিন বিছানার পাশে বসিয়া রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ ?

মেয়েটি চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। অস্ফুষ্ট স্বরে বলিল, ভাল আছি।

বিপিন থার্মমিটার দিয়া দেখিল জ্বর প্রায় ১০৪°-র কাছাকাছি। সে জানে, রোগীরা প্রায়ই এ অবস্থায় বলে যে সে ভাল আছে। মাথায় জল দেওয়া দরকার, তাই বা কে দেয় ?

সে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বর কোথায় ?

মেয়েটি বিপিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর টানিয়া টানিয়া বলিল—অঁ্যা—অঁ্যা—

বিশ্বেশ্বরবাবু কোথায়—বিশ্বেশ্বর ?

রোগিণী এবার বোধ হয় বুঝিতে পারিল। বলিল—ক'নে গিয়েচেন।

ইহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক বুঝিয়া বিপিন একটা জলপাত্রের সন্ধানে ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এখনি ইহার মাথায় জল দেওয়া দরকার। এককোণে একটা মেটে কলসীতে সম্ভবতঃ খাবার জল আছে, বিপিন সন্ধান করিয়া একখানা মানকচুর পাতা আনিয়া রোগিণীর মাথার কাছে পাতিয়া কলসীর জলটুকু সব উহার মাথায় ঢালিল। পরে বিল হইতে আরও জল আনিয়া আবার ঢালিল। বার কয়েক

এরূপ করিবার পর রোগিণীর আচ্ছন্ন ভাব যেন খানিকটা কাটিল। বিপিন থার্মমিটার দিয়া দেখিল, জ্বর কমিয়াছে। ডাক্তারি করিতে আসিয়া এ কি বিপদ! এমন হাঙ্গামাতে তো সে কখনও পড়ে নাই।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল মানীর মুখখানা। এই সব দুঃখী, অসহায়, রোগার্ত্ত লোকদের ভাল করিবার জন্যই তো মানী তাহাকে ডাক্তারি পড়িতে বলিয়াছিল। মেয়েদের সেবা পাইয়া আসিয়াছে সে চিরকাল। ইহাকে ফেলিয়া গেলে মানীর, শান্তির, মনোরমার অপমান করা হইবে—কে যেন তাহার মনের মধ্যে বলিল। বিশ্বেশ্বর যদি ইহাকে ফেলিয়া পলাইয়া থাকে! তবে এখন উপায়?

সে আবার রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বরবাবু কোথায় গিয়েছে জান? কতক্ষণ গিয়েছে?

মেয়েটি বলিল—জানিনে।

বিপিন আর এক কলসী জল আনিতে গেল। জেয়ালার বিস্তৃত বিলের উপর সূর্য্যাস্তের ঘন ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ পাড়ের তাল গাছের মাথায় এখনও রাঙা রোদ। দূর জলে পদ্মফুলের বনে পদ্মপাতা উলটিয়া আছে, যদিও এখন পদ্মফুল চোখে পড়ে না। বল্লভপুরের দিকে জেলেরা ডিঙি বাহিয়া মাছ ধরিতেছে। একদল জলপিপি ও পানকৌড়ি জলের ধারে শোলাগাছের বনে গুগ্‌লি খুঁজিতেছে। বিপিনের মনে কেমন এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। যদি বিশ্বেশ্বর ইহাকে

ফেলিয়া পলাইয়াই থাকে, তবে তাহাকে থাকিতে হইবে এখানে সারারাত। অর্থ উপার্জ্জন করিলেই কি হয়? তাহার বাবা ৺বিনোদ চাটুয্যে কম পয়সা উপার্জ্জন করেন নাই—অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত পয়সা বলিয়াই টেকে নাই। কাহারও কোন উপকার হয় নাই তাহা দিয়া।

ঘরে রোগীর পথ্য কিছু নাই। ডাব ও ছানার জল খাওয়ানো দরকার এরকম রোগীকে। কিছুই ব্যবস্থা নাই। বিপিন নিকটবর্ত্তী দুলেপাড়া হইতে একটি লোক ডাকিয়া আনিল। বলিল—গোটাকতক ডাব নিয়ে আসতে পারবে? দাম দেবো।

লোকটা বলিল—বাবু, আপনাকে আমি চিনি। আপনি পিপলিপাড়ার ডাক্তারবাবু। দাম আপনাকে দিতি হবে না। তবে বাবু, ডাব রাত্তিরে পাড়া যাবে না তো? তা আপনি কেন —সে বামুন ঠাকুর কোথায় গেল? দেখুন তো বাবু, মেয়েডারে টুইয়ে ঘরের বার করে নিয়ে এসে তিনি এখন পালালেন নাকি? এইডে কি ভদ্দরনোকের কাজ?

একপ্রহর রাত্রে বিশ্বেশ্বর আসিয়া হাজির হইল। সে ফেলিয়া পালায় নাই—চিংড়িঘাটার বাজার হইতে কিছু ফল, খৈল ও সাবু মিছরী কিনিতে গিয়াছিল। বিপিনকে দেখিয়া বলিল—আপনি এসেছেন? বড় কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনি বলে গেলেন খোলের পুলটিস্ দিতে, এখানে পেলাম না—তাই বাজারে গিয়াছিলাম এই সব জিনিষপত্র আনতে। কতক্ষণ এসেছেন?

দুজনে মিলিয়া সারারাত রোগীর সেবা করিল। সকালের দিকে বিপিন বলিল—আমি ডাক্তারখানা খুলবো গিয়ে—বসুন আপনি—একে একা ফেলে কোথাও যাবেন না। আমি ওবেলা আবার আসব।

একটা অদ্ভুত আনন্দ লইয়া সে ফিরিল। এই সব পল্লী-অঞ্চলের যত অসহায়, দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করিবার জন্যই যেন সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—এই রকমের একটা মনোভাব সারাপথ তাহাকে তাহার নিজের চোখে মহৎ ও উদার করিয়া চিত্রিত করিল।

আবার ওবেলা যাইতে হইবে। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর নীচ-জাতীয়া প্রণয়িনীকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—দুজনেই ওরা নিতান্ত দুঃস্থ, অসহায়। যদি কখনো মানীর সঙ্গে দেখা হয়, তবে সে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতে পারিবে—আমায় মানুষ করে দিয়েচ মানী। সেই গরীব, অসহায় মেয়েটির রোগশয্যার পাশে তুমিই আমার মনের মধ্যে ছিলে।

সেই দিনই রাত্রে বিশ্বেশ্বর চক্কত্তির ক্ষুদ্র খড়ের ঘরে বসিয়া সে বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বিশ্বেশ্বর বাবু, আত্মীয়-স্বজন ছাড়লেন এর জন্যে, চাকরীটা গেল, জেয়ালার বিলের ধারে এইভাবে রয়েছেন, এতে কষ্ট হয় না?

—কি আর কষ্ট! বেশ আছি, এখন যদি ও বেঁচে ওঠে তবে। ও আমায় যা দিয়েছে, আমার নিজের সমাজে বসে আমাকে তা কেউ দিয়েছে?

—দেয়নি মানে কি ? বিয়ে করলেই তো পারতেন।

—আমার সাহস হয়নি ডাক্তারবাবু, সামান্য পণ্ডিতি করি—ভাবতাম সংসার চালাতে পারবো না। এ নিজের দিক মোটেই ভাবেনি বলেই আমার সঙ্গে চলে আসতে পেরেছে।

—শুধু তাই নয়, আপনি ব্রাহ্মণ, ও বাগ্‌দী। আপনাকে অন্য চোখেই দেখত, কারণ আপনি উচ্চবর্ণের। কি করে আপনি আলাপ করলেন এর সঙ্গে ?

—আমাদের ইস্কুলের কাঁটাল গাছ ওর বাবা জমা রেখেছিল। তাই ও আসতো কাঁটাল পাড়তে। এই সূত্রে আলাপ। এখন ওর অসুখ—ওর চেহারা বেশ ভাল দেখতে, যদি বেঁচে ওঠে তবে দেখবেন ওর মুখের এমন একটা শ্রী আছে—

বিপিন অন্য কথা পাড়িল—সে নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানে, প্রণয়ীদের মুখে প্রণয়িনীদের রূপগুণের বর্ণনার আদি-অন্ত নাই। হইলই বা বাগ্‌দী বা ডুলে। প্রেম মানুষকে কি অন্ধই করে !

বিশ্বেশ্বরের উপরে বিপিনের করুণা হইল। তাহার সারাজীবনের তৃষ্ণা—এ অবস্থায় পানাপুকুরের জলও লোকে পান করে তৃষ্ণার ঘোরে।

বিপিন বলিল—এর বাড়ীতে আপনার লোকজনের কাছে খবর পাঠান। যদি ভাল মন্দ কিছু হয়, তারা আপনাকে দোষ দেবে। এরও তো ইচ্ছে হয় আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করতে।

—তারা কেউ আসবে না। ওর বাবা অবস্থাপন্ন চাষী গেরস্থ। তারা বলেচে ওর মুখ দেখবে না আর।

অনেক রাত্রে বিপিন একবার জল তুলিতে গেল বিলে। ধপধপে জ্যোৎস্না চারিদিকে, অদ্ভুত শোভা স্তব্ধ গভীর নিশীথিনীর। পদ্মবনে রাত-জাগা সরাল পাখী ডাকিতেছে। দূরে বিলের ধারে জেলেদের মাছ চৌকি দেওয়ার কুঁড়ের কাছে কাঠকুটো জ্বালিয়া আগুন করিয়াছিল, এখন প্রায় নিভিয়া আসিতেছে। বিশ্বেশ্বরের দুর্ভাগ্য, হয়তো মেয়েটি আজ শেষ-রাত্রে কাবার হইবে। বিশ্বেশ্বরকে বিপিন সে কথা বলে নাই, জ্বর অতি দ্রুত নামিতেছে, ক্রাইসিস্ আসিয়া পড়িল, নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বিপিন যাহা করিবার করিয়াছে, আর করিবার উপযুক্ত তোড়জোড় নাই তাহার। বাঁচান যাইবে না।

এই স্তব্ধ রাত্রির সীমাহীন রহস্য তাহার মনকে অভিভূত করিল। বিপিন কখনো ও সব ভাবে না, তবুও মনে হইল, মেয়েটি আজ কোথায় কতদূরে চলিল, তখনো কি সে জাতে বাগ্‌দীই থাকিয়া যাইবে? উচ্চবর্ণের প্রতি প্রেমের দায়ে তাহার এই যে স্বার্থত্যাগ, ইহা কি সম্পূর্ণ বৃথা যাইবে? কোথাও কোনো পুষ্পমাল্য অপেক্ষা করিয়া নাই কি তাহার সাদর অভিনন্দনের জন্য?

মানী যদি থাকিত, এসব কথা তাহার সঙ্গে বলা চলিত; মানী সব বোঝে, সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। শান্তি সেবাপরায়ণা

বটে, কিন্তু তাহার শিক্ষা নাই, সে খাওয়াইতে জানে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া সে আনন্দ পাওয়া যায় না। মানী আজ কোথায়, কি ভাবে আছে? আর কখনো তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না? যাক্, সে যেখানেই থাক, সে বাঁচিয়া আছে। নিমোনিয়ার ক্রাইসিস্ খড়্গ লইয়া বলি দিতে উদ্যত হয় নাই তাহাকে। সে বাঁচিয়া থাকুক। দেখিবার দরকার নাই। পৃথিবীর মাটি মানীর পায়ের স্পর্শ পায় যেন, মাটিতে মাটিতেও যেন যোগটা বজায় থাকে।

শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারের মধ্যে এক দিকে বিপিন, অন্য দিকে বিশ্বেশ্বর ধরিয়া মৃত দেহকে কুটীরের বাহির করিল। বিলের চারিধারে ঘনীভূত কুয়াসা। শ্মশান বিলের ওপারে, প্রায় এক মাইল ঘুরিয়া যাইতে হয়। বিপিনের খাতিরে বল্লভপুরের বাগ্‌দীপাড়া হইতে দুজন লোক আসিল। বিপিন এবং বিশ্বেশ্বরও ধরিল। সৎকারের কোন ত্রুটি না হয়, প্রেমের মান রাখা চাই, বিপিনের দৃষ্টি সে দিকে।

৪

স্নান করিয়া যখন বিপিন ফিরিল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, ও ডাক্তারবাবু, কোথায় ছিলেন কাল রাত্রে? রুগী ছিল? শান্তি যে আপনার জন্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে ক'রকমের আচার পাঠিয়ে দিয়েচে। যে গাড়োয়ান গাড়ী নিয়ে

গিয়েছিল, সে কাল রাত্রে ফিরে এসেচে কিনা—সেই গাড়ীতেই আপনার জন্যে এক হাঁড়ি আচার আলাদা করে—ব্রাহ্মণের ওপর বড্ড ভক্তি আমার মেয়ের—

বিপিন যেন শক্ত মাটি পাইল অনেকক্ষণ পরে। শান্তি আছে, সে স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সে দেহমুক্ত জীবাত্মা নয়—শান্তি তাহাকে আচার পাঠাইয়াছে। আবার হয়তো একদিন আসিয়া হাজির হইবে, আবার চা করিয়া আনিয়া দিবে তাহার হাতে।

হতভাগ্য বিশ্বেশ্বর!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে আবার বল্লভপুর গেল। বিশ্বেশ্বর কি অবস্থায় আছে একবার দেখা দরকার। গিয়া দেখিল, ঘরের দোর খোলা; বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে বিশ্বেশ্বর ভাত চড়াইয়াছে।

বিশ্বেশ্বর বলিল, কে?

বিপিন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি। এখন অবেলায় রাঁধচেন যে?

বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া মনে হয় না, সে কোনো শোক পাইয়াছে। বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু। সারাদিন খাওয়া হয় নি। ঘরদোর গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিলাম—রুগীর ঘর, বুঝলেন না? আবার নেয়ে এলাম এই সব করে, তখন বেলা তিনটে। তারপর এই ভাত চড়িয়েচি—এইবার দুটো খাবো, বড় খিদে পেয়েচে।

বিপিন চাহিয়া দেখিল ঘরের কোথাও কোনো বিছানা

নাই। যে ছেঁড়া কাঁথা ও বিচালির শয্যায় রোগিণী শুইয়া থাকিত, তাহা শবের সঙ্গে গিয়াছে, এখন এই ঠাণ্ডা রাত্রে বিশ্বেশ্বর শুইবে কিসে ? ওই একটি মাত্র বিছানাই সম্বল ছিল নাকি ?

বিশ্বেশ্বর ভাত নামাইয়া বড় একখানা কলার পাতায় ঢালিল। শুধু দুটি বড় বড় করলা সিদ্ধ ছাড়া খাইবার অন্য কোনো উপকরণ নাই। তাহা দিয়াই সে যেমন গোগ্রাসে ভাত গিলিতে লাগিল, বিপিন বুঝিল, লোকটার সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল বটে। বেচারী চাকুরীটা হারাইয়া বসিল প্রেমের দায়ে পড়িয়া. এখন খাইবেই বা কি, আর করিবেই বা কি। তাও এমন অদৃষ্ট, একুল ওকুল দুকুলই গেল।

প্রথম যখন খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিশ্বেশ্বর তত কথা বলে নাই, দুটি করলা সিদ্ধের মধ্যে একটা করলা সিদ্ধ দিয়া আন্দাজ অর্দ্ধেক পরিমাণ ভাত খাওয়ার পরে বোধ হয় তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। বিপিনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, আজ দিনটা কি বিপদের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল! এক একদিন অমন হয়। বড্ড খিদে পেয়েছিল, কিছু মনে করবেন না।

বিপিন বলিল, তা তো হোল, কিন্তু আপনি এখন শোবেন কিসে ? বিছানা তো নেই দেখচি।

—ও কিছু না, গায়ের কাপড়খানা আছে, বেশ মোটা, শীত ভাঙে খুব। আর দু আঁটি বিচিলি চেয়ে আনবো এখন পাড়া থেকে।

—না চলুন, আমার ওখানে রাত্রে শুয়ে থাকবেন। এমন কষ্টে কি কেউ শুতে পারে?

—না, না, কোনো দরকার নেই ডাক্তারবাবু। ও আবার কষ্ট কিসের? ও সব কষ্টকে কষ্ট বলে ভাবিনে। দিব্যি শোবো এখন, একটু আগুন করবো ঘরে। তবে প্রথম দিনটা, হয়তো একটু ভয় ভয় করবে।

—আমি আপনার ঘরে থাকবো আজ আপনার সঙ্গে?

—কোনো দরকার নেই। আপনি না হয় একদিন শুয়ে রইলেন, কিন্তু আমাকে সইয়ে নিতে হবে তো? সে তো এত ভালবাসতো আমায়, তার ভূত এসে আর আমার গলা টিপবে না। আচ্ছা, সত্যি ডাক্তারবাবু, কোথায় সে গেল, বলুন তো?

—নিন, আপনি খেয়ে নিন। ওসব কথা পরে হবে এখন।

বিশ্বেশ্বর খাওয়া শেষ করিয়া তামাক সাজিল। নিজে দু চার বার টানিয়া বিপিনের হাতে হুঁকাটি দিল। বিপিন প্রথম দিন ইতস্ততঃ করিয়াছিল, লোকটা বাগ্দীনীর হাতের রান্না খায়, ইহার জাত নাই, এ হুঁকায় তামাক খাইবে কি না। কিন্তু কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতি তাহার মনে আশ্রয় লইয়াছে, সে যেমন ইহার প্রতি, তেমনি ছিল ইহার মৃতা প্রণয়িনীর প্রতি। সুতরাং এখন ওকথা তাহার আর মনেই ওঠে না।

বিপিন বলিল, এখন কি করবেন ভেবেচেন?

—একটা পাঠশালা করবো ভাবচি, এই জেয়ালা বল্লভপুরে অনেক নিকিরি আর জেলে-মালোর বাস। ওদের ছেলেপিলে নিয়ে একটা পাঠশালা খুললে চলবে না ?

—ওদের সঙ্গে কথা হয়েচে কিছু ?

—কথা এখনো তুলিনি কিছু। কাল একবার পাড়ার মধ্যে গিয়ে দু-এক জনের কাছে পাড়ি কথাটা।

বিপিন বুঝিল, ইহা নিতান্তই অস্থিত-পঙ্কের ব্যাপার। কিছুই ঠিক নাই। কোথায় বা পাঠশালা, কোথায় বা ছাত্রদল ! ইহার মস্তিষ্কে ছাড়া তাহাদের অস্তিত্ব নাই কোথাও।

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি ভূত মানেন ?

—না, যা কখনো দেখিনি, তা কি করে মানবো ? ওসব আর ভেবে কি করবেন বলুন ?

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন অবাক হইয়া গেল, পুরুষমানুষ এভাবে কাঁদিতে পারে, তাহা সে নিজেকে দিয়া অন্ততঃ ধারণাই করিতে পারিল না। ভাল বিপদে ফেলিয়াছে তাহাকে বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত !

দুঃখও হইল। লোকটার লাগিয়াছে খুব! লাগিবারই কথা বটে। কে জানে, হয়তো মনের দিক দিয়া মানীর সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ, মৃতার সহিত ইহারও সেই সম্বন্ধ ছিল ! হতভাগ্য বিশ্বেশ্বরের প্রতি সে অবিচার করিতে চায় না।

ইহাকে একা এই শোকের মধ্যে ফেলিয়া যাইতে তাহার মন সরিল না। রাত্রিটা বিপিন রহিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

বিপিনের ডাক্তারখানায় সম্প্রতি মাস খানেক একটিও রোগী আসে নাই।

রোজই সকালে বিকালে নিয়মিত ডাক্তারখানায় গিয়া তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকে। হাতের পয়সা কড়ি ফুরাইয়া গেল। কোনো দিকে রোগ বালাই নাই, দেশটা হঠাৎ যেন মধুপুর কি শিমুলতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জীবনটাও যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা। সকাল সন্ধ্যা একেবারে কাটে না। দত্ত মশায় অবশ্য আছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিয়া শুনিয়া একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে, আর ভাল লাগে না।

মনোরমার জন্য মন কেমন করে আজকাল। মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর পর হইতে বিপিন লক্ষ্য করিতেছে স্ত্রীর উপর তাহার মনোভাব অদ্ভুত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মনে হয় মনোরমা তো চলিয়া যাইতেছিল, একদিনও সে মনোরমাকে মুখের একটি মিষ্ট কথাও বলে নাই, এ অবস্থায় যদি সেদিন সে সত্যই মারা পড়িত বিপিনকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইত সে সব ভাবিয়া।

সুখের মুখ কখনো সে দেখে নাই, বিপিন তাহাকে এবার সুখী করিবে। মানুষের মনের এই বোধ হয় গতি, বড় বড়

অবলম্বন যখন চলিয়া যায়, তখন যে আশ্রয়কে অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইত, তাহাই তখন হইয়া দাঁড়ায় অতি প্রিয়, অতি প্রয়োজনীয়। মনোরমার চিন্তা কখনো আনন্দ দেয় নাই, আজকাল দেয়। তাহার প্রতি একটা অনুকম্পা জাগে, স্নেহ হয়, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার এ সব!

বিপিন মাস দুই বাড়ী যায় নাই, কিছু টাকা হাতে আসিলে একবার বাড়ী যাইত। কিন্তু এই সময়ই হাত একেবারে খালি।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, ডাক্তারবাবু, শান্তি কাল পত্র লিখেচে, আপনার কথা জিগ্যেস করেচে, আপনি কেমন আছেন, ডাক্তারি কেমন চলচে। আর একটা কথা লিখেচে, ওর শ্বশুরের চোখ অস্ত্র হবে কলকাতা বা রাণাঘাটের হাঁসপাতালে। আপনি সে সময়ে সময় করে দুদিনের জন্যে ওদের ওখানে থেকে শ্বশুরের সঙ্গে রাণাঘাট বা কলকাতা যেতে পারবেন কিনা লিখেচে। শান্তি থাকবে, আমার জামাই থাকবে। অবিশ্যি আপনার ফি এবং যাতায়াতের খরচা ওরা দেবে। একটা দিন কিংবা দুটো দিন লাগবে। আপনি থাকলে ওদের একটা বলভরসা। ওরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, হাঁসপাতালের মুলুক সন্ধান কিছুই জানে না। আপনার কত বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ, আপনি পড়েচেন সেখানে। তাই আপনাকে নিয়ে যেতে চায়।

বিপিন বলিল, বেশ লিখে দেবেন আমি যাবো, তবে ফি দিতে চাইলে যাবো না। যাতায়াতের খরচ দিতে চান, দেবেন তাঁরা, কিন্তু ফির কথা যেন না ওঠান।

দত্ত মশায় আর কিছু বলিলেন না।

দিন পাঁচ ছয় পরে দত্ত মশায় একদিন সকালে বিপিনকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন। পূর্ব্ব রাত্রে শান্তির শ্বশুর বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে, রাণাঘাট হাঁসপাতালে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যাওয়া হইবে, বিপিনকে আজ এখনি রওনা হইতে হইবে, বেশী রাত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া দত্ত মশায় বিপিনকে গত রাত্রে কিছু বলেন নাই।

সাত ক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে অতিক্রম করিয়া প্রায় বেলা তুইটার সময় বিপিন শান্তির শ্বশুর বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। শান্তির স্বামী গোপাল প্রথমেই ছুটিয়া আসিল। বলিল, ওঃ এত বেলা হয়ে গেল ডাক্তারবাবু! বড্ড কষ্ট হয়েচে, এই রোদ্দুর! ও কতক্ষণ থেকে আপনার জন্যে নাইবার জল, চায়ের যোগাড় করে নিয়ে বসে আছে। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।

বিপিন গিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, এখনি আজ শান্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা হইবে। বিপিন ভাবিয়া অবাক হইল, শান্তির সঙ্গে দেখা হইবার আগ্রহে মনের এই রকম অবস্থা—এ কি কল্পনা করা সম্ভব ছিল এক বছর পূর্ব্বেও? মানী নয়, শান্তি। কে শান্তি?

ক'দিন তাহার সহিত পরিচয়? উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যেও কেমন এক প্রকার অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

শান্তি একটু পরেই আধ ঘোমটা দিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। হাসিমুখে বলিল—আমি বেলা দশটা থেকে কেবল ঘর বার করচি—এত বেলা হবে তা ভাবিনি! একটু জিরিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে ডাব খান।

—তোমার শশুর মহাশয়কে একবার দেখবো।

—এখন না। বাবা খেয়ে ঘুমুচ্চনে একটু, বুড়োমানুষ। আপনি নেয়ে নিয়ে রান্না চড়িয়ে দিন, তার পর—

বিপিন বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি শান্তি! রান্না চড়িয়ে নেবো কি? এত বেলায়—

শান্তি হাসিয়া বলিল—ও সব চলবে না এখানে। ব্রাহ্মণ মানুষকে আমরা কিছু রেঁধে দিতে পারিনে। আমি সব যোগাড় করে দেবো, আপনি শুধু নামিয়ে নেবেন। আকাশ পাতাল ভাবতে হবে না আপনার সেজন্যে।

শান্তির আশ্বাস দেওয়ার মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যাহাতে বিপিনের মন একেবারে লঘু ও নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিল। শান্তি সেবাপরায়ণা মেয়ে বটে, কাজের মেয়েও বটে, তাহার উপর নির্ভরশীলতা কেমন যেন আপনিই আসে।

গোপাল আসিয়া বলিল—চলুন, নদীতে নাইয়ে নিয়ে আসি।

বিপিন বলিল—নদী পর্য্যন্ত আপনার কষ্ট করে যাওয়ার

কি দরকার। আমায় দেখিয়ে দিলেই তো! গোপাল তাহাতে রাজি নয়, বিপিন বুঝিল শান্তিই বলিয়া দিয়াছে তাহাকে নদীর ঘাটে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া আনিতে। শান্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখানে খুব বেশী, এমন কি মনে হইল বাপের বাড়ী অপেক্ষা বেশী।

স্নানাহারের পর শান্তি বাহিরের ঘরে নিজে বিপিনের বিছানা করিয়া দিল। বিপিন বলিল—শান্তি, আমি দুপুরে ঘুমুই নে তুমি জানো, বিছানা কিসের—তার চেয়ে বোসো এখানে দুটো কথাবার্ত্তা বলি।

শান্তি হাসিয়া বলিল—না তা হবে না, একটু বিশ্রাম করে নিতেই হবে। কাল আবার এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা গরুর গাড়ীতে গিয়ে ট্রেণ ধরতে হবে।

—ও কষ্ট কিছু না, তোমার শ্বশুর উঠেচেন কি না দেখ। একবার তাঁর চোখটা দেখি। বিপিন চোখের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তবুও তাহাকে ভান করিতে হইল যে সে অনেক কিছু বুঝিতেছে। শান্তির শ্বশুরের দুই চারিটি চক্ষুপীড়া সংক্রান্ত অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তরও তাহাকে দিতে হইল।

গ্রামখানি বিকালে ঘুরিয়া দেখিল, পিপলিপাড়া বা সোনাতনপুরের মতই জঙ্গলে ভরা, এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামই তাই। শান্তিদের বাড়ীর পিছনেই তো প্রকাণ্ড বাগান, চারি ধার বাঁশবনে ঘেরা, দিনমানেও রোদ ওঠে না সেদিকটাতে বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া ফিরিল। বাড়ীর পিছনে ঘন বন-বাগানের ধারে একটি বাতাবী লেবুতলায় ঢেঁকি পাতা। সেখানে শান্তি ও আর একটি প্রৌঢ়া বিধবা মেয়েমানুষ চিড়ে কুটিতেছে—শান্তি তাহাকে সেখানে ডাকিল। বিপিন সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়া বিধবা মেয়েমানুষটি ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল, শান্তি ঢেঁকির গড়ে ধান দিয়া যাইতেছে। তাহাকে বসিতে একখানা পিঁড়ি দিয়া হাসিয়া বলিল—বসুন। এখানে বসে গল্প করুন আমি সরু ধান দুটো ভেনে চাল করে নিচ্চি, কাল সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বাবা অন্য চাল খেতে পারেন না।

বিপিন চাহিয়া দেখিল বনবাগানের আড়াল হইতে চাঁদ উঠিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, প্রায় পূর্ণচন্দ্রের মতই বড় চাঁদখানা। বাঁশবন নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে সন্ধ্যায়, খুব নির্জ্জন গ্রামখানা, লোকজন বেশী নাই, পিপলিপাড়ায় হাটতলার চেয়েও নির্জ্জন।

কিন্তু বেশ লাগিল এই বনবাগানের মধ্যে ঢেঁকিশালের জায়গাটা, চাঁদ-ওঠা এই সুন্দর সন্ধ্যা, শান্তির সুমিষ্ট অভ্যর্থনাটি, বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধ।

সে বলিল, তুমি ভারি কাজের মেয়ে কিন্তু শান্তি। আবার দিব্যি ধান ভানতেও পারো দেখচি।

শান্তি হাসিয়া ফেলিল। বিধবা মেয়েমানুষটিও মুখে কাপড় দিয়া হাসিল। শান্তি বলিল, এ না করলে গেরস্ত ঘরে চলে

কি, বলুন আপনি? এখন ধরুন আমার শ্বশুরের তিন গোলা ধান হয় বছরে, রোজ ধান ভানা, চিঁড়ে কোটার জন্যে কাকে আবার খোসামোদ করে বেড়াবো? ওই মতির মা আছে আর আমি আছি—

—বেশ গাঁখানা তোমাদের, বেড়িয়ে এলাম—

—চড়কতলার দিকে গিয়েছিলেন?

—চিনি তো নে, কোন তলা। এমনি খানিকটা ঘুরলাম—

শান্তি উঠিয়া বলিল, দাঁড়ান, আপনার চা করে আনি, এখানে বসে খাবেন আর গল্প করবেন, মতির মা, রাখো। আমি আসি আগে, যাবো আর আসবো—

চা ও খাবার লইয়া সে খুব শীঘ্রই ফিরিল বটে।

বিপিন বলিল, হালুয়া গরম রয়েচে, এখন করে আনলে নাকি?

—আমি না, মা করেচেন। আমি শুধু চা করে আনলাম, সেকেলে বুড়ী, চা করতে জানেন না। ভারি আমোদ হচ্চে আমার, আপনি এসেচেন বলে।

—সত্যি?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে? রাত্রে আপনাকে আর রাঁধতে হবে না, আমি লুচি ভেজে দেবো।

—কেন, আমি ভাত রেঁধেই নিতাম, আবার লুচির হাঙ্গামা—

—হাঙ্গামা কিছু না। আমার শ্বশুর বাড়ীরা বড় লোক,

এদের এক কাঁড়ি টাকা আছে, খাইয়ে দিলাম বা কিছু টাকা বাপের বাড়ীর লোককে ?

শান্তির কথার ভঙ্গি শুনিয়া বিপিন হাসিয়া উঠিল, প্রৌঢ়া মতির মাও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া (কারণ বিপিনের সামনে হাসা তাহার পক্ষে অশোভন) হাসিয়া বলিল—কি যে বলেন বড় খুড়ীমা আমাদের ! শুনতেই এক মজা।

শান্তি যে এমন হাসাইতে পারে, বিপিন তাহা জানিত না, রসিকা মেয়ে সে খুব পছন্দ করে ; পছন্দ করে বলিয়াই এটুকু জানে, ভাল হাসাইতে পারে এমন মেয়ের সংখ্যা বেশী নয়। শান্তির একটা নূতন দিক যেন সে দেখিল।

শান্তি ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলিল, একটা ভূতের গল্প বলুন না ?

—ভূতের গল্প ! নাও ধান ভেনে, আর এখন রাত্তির দুপুরে ভূতের গল্প করে না।

—না বলুন।

বিপিন একটা গল্প বানাইয়া বলিল। অনেক দিন আগে কাহার মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিল, সেটিও বলিল। চাঁদ এবার অনেকদূর উঠিয়াছে, বিপিন শান্তির সহিত গল্পের ফাঁকেফাঁকে ভাবিতেছিল মানীর কথা, মৃতা বাগ্‌দী মেয়েটির কথা, মনোরমার কথা, কামিনী মাসীর কথা।

মানীর সঙ্গে এই রকম ভাবে গল্প করিতে পারিত এই রকম সন্ধ্যায় ! না, তাহা হইবার নয়। মানীর শ্বশুর বাড়ী এরকম

পাড়াগাঁয়েও নয়, মানী এ রকম বসিয়া বসিয়া ধানও ভানিবে না।

ইতিমধ্যে মতির মা কি কাজে একটু বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, শান্তি—মতির মা বলে ডাকচো, ওর মতি বলে মেয়ে ছিল ?

শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল—আপনি ওকে চেনেন ?

—ও কি জাত ?

—বাগ্‌দী কিংবা দুলে। আপনি ওর কথা জানলেন কি করে ?

—বলচি। ওর বাড়ী কি ভাসানপোতা ছিল ?

শান্তি আরও অবাক হইয়া বলিল—ভাসানপোতা ওর শ্বশুর বাড়ী। এগাঁয়ে ওর বাপের বাড়ী। ওর স্বামী ওকে নেয় না অনেকদিন থেকে। ওর মেয়ে মতি ওর বাপের কাছেই ছিল, তার বিয়ে হয়েছে এই দিকে যেন কোথায়। আমি তাকে কখনো দেখিনি, সে এখানে আসে না।

—আচ্ছা, তুমি জানো মতির সঙ্গে ওর মার দেখা হয়েছিল কতদিন আগে ?

—না। কেন বলুন তো—এত কথা জিগ্যেস্ করচেন কেন ?

—ওকে কথাটা জিগ্যেস্ করবে ? নয়তো থাক্। আজ জিগ্যেস্ কোরো না—পরে বলবো এখন। ইতিমধ্যে মতির মা আসিয়া পড়াতে বিপিন কথা বন্ধ করিল। প্রৌঢ়া আবার

ঢেঁকিতে পাড় দিতে আরম্ভ করিল। বিপিন ভাবিল, হয়তো এ জানে না তাহার মেয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ঠিক এই পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমার রাত্রে। বল্লভপুরের বিলের ধারের সে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত বিপিন ভুলে নাই। সে রাতটিতে বাগ্‌দীর মেয়ে মতি তাহার মনে একটা খুব বড় দাগ রাখিয়া গিয়াছে। অন্য এক জগতের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া গিয়াছে।

অভাগিনী বৃদ্ধা, জানেও না তাহার মেয়ের কি ঘটিয়াছে।

পরদিন শান্তি যখন চা দিতে আসিল, তখন নির্জ্জনে পাইয়া বিপিন মতির কাহিনী শান্তিকে শুনাইয়া দিল। শান্তি যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি দুঃখিত হইল। বলিল—আমার মনে হয় মেয়ে যে ঘর থেকে চলে গিয়েছে একথা ও জানে, কারো কাছে প্রকাশ করে না সেকথা—তবে সে যে মরে গিয়েচে একথা জানে না। জানবার কথাও নয়, বল্লভপুরে ওরা লুকিয়ে এসে ঘর বেঁধে থাকতো, কাউকে পরিচয় তো দেয়নি—কি করে জানবে কোথাকার কার মেয়ে? ভাসানপোতা থেকে জেয়ালা বল্লভপুর কতদূর?

—তা আট ন' ক্রোশ খুব হবে।

—তা হোলে ও কিছুই জানে না, মেয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়েচে, একথাও শোনে নি। এতদূর থেকে কে খবর দেবে। ওকে আর কোনো কথা জিগ্যেস করার দরকার নেই।

পরদিন বিকালে দুইখানি গরুর গাড়িতে শান্তি, শান্তির স্বামী গোপাল, বিপিন ও শান্তির শ্বশুর ষ্টেশনে আসিল এবং সন্ধ্যার পরে রাণাঘাটে পৌঁছিয়া সিদ্ধান্তপাড়ার বাসায় গিয়া উঠিল। শান্তির এক মামাশ্বশুর বাসা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুখানি মাত্র ঘর, একখানা ছোট রান্নাঘর, ছোট একটু উঠান। ভাড়া পাঁচ টাকা।

শান্তি অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দরাজ জায়গায় হাত পা ছড়াইয়া খেলাইয়া বাস করা অভ্যাস, সে তো বাসা দেখিয়া স্বামীকে বলিল—এখানে কেমন করে থাকবো হ্যাঁ গা—ওমা, একি উঠোন—আর ওইটুকু রান্নাঘরে কি রাঁধা যায়? আর ওই পাতকুয়োর জলে নাইবো?

রাণাঘাটে বিপিন আসিল অনেকদিন পরে। মানীদের বাড়ীতে কাজ করিবার সময় কোর্টে তখন আসিতেই হইত। এইজন্যই রাণাঘাটের অনেক জিনিষের সঙ্গে মানীর কথা যেন জড়ানো। গোপালের সহিত বাজার করিতে বাহির হইয়া বিপিন দেখিল পূর্ব্বপরিচিত কত দৃশ্য তাহার মনে কষ্ট দিতেছে—মানীর কথা অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, আবার অত্যন্ত নূতন রূপে সে সব দিনের স্মৃতি মনের দ্বারে ভিড় করিতে লাগিল। কষ্ট হয়, সত্যই কষ্ট হয়।

সকালে গোপাল এবং শান্তির শ্বশুরকে লইয়া বিপিন

রাণাঘাট হাঁসপাতালে ডাক্তার আর্চ্চারের কাছে গেল। বলাই যখন হাঁসপাতালে ছিল, তখন আর্চ্চার সাহেবের সঙ্গে বিপিনের আলাপ হয়। আর্চ্চার সাহেব বিপিনকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। বলিলেন—আপনার ভাই কোথা? মারা গিয়েচে? তা যাবে, বাঁচবার কোনো আশা ছিল না।

শান্তির শ্বশুরের চোখ দেখিয়া বলিলেন—এখন এঁকে দশ বারোদিন এখানে থাকতে হবে। চোখে একটা ওষুধ দিচ্চি—চোখ কেমন থাকে, কাল আমায় এসে জানাবেন। কাটাবার এখন দরকার নেই। বলাই যে জায়গাটাতে শুইয়া থাকিত খাটে—বিপিন সেখানটা গিয়া দেখিয়া আসিল। এখন অন্য রোগী রহিয়াছে!

বলাই···মানী···কামিনী মাসী···স্বপ্ন······

হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিপিন দেখিল শান্তি বাসা বেশ চমৎকার গুছাইয়া লইয়াছে। দুটি ঘরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে বিপিনের একা থাকিবার এবং বড় ঘরটিতে উহারা তিনজনের একত্র থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। দুটি ঘরই ইতিমধ্যে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়াছে, মেঝে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া শুকনো নেক্ড়া দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। বিছানাপত্র পাতিয়াছে দুটি ঘরেই, বাহিরে বসিবার জন্য একটি সতরঞ্চি পাতিয়া রাখিয়াছে। উহাদের দেখিয়া বলিল—কি হোল বাবার চোখের?

বিপিন বলিল—চোখ কাটতে হবে না—তবে এখানে দশ

বারোদিন এখন থাকতে হবে। ওষুধ দিয়ে ছানি নষ্ট করে দেবে বল্লে। ওঃ তুমি যে শান্তি, বেশ গুছিয়ে ফেলেছ ঘরদোর ?

শান্তি হাসিয়া বলিল—এখন নেয়ে ধুয়ে নিন্ সব। আমি বাবাকে নাইয়ে নি।

শান্তির শ্বশুর চোখে ভাল দেখিতে পান না, শান্তি তাঁহাকে কি করিয়াই সেবা করিতেছে, দেখিয়া বিপিন মুগ্ধ হইল। মা যেমন অসহায় ছোট ছেলের সব কাজ নিজে করিয়া দেয়, সকল অভাব অভিযোগের সমাধান নিজে করে, তেমনি করিয়া শান্তি অসহায় বৃদ্ধকে সকল দিক হইতে আগুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

অথচ সে বালিকার মত খুসি সহরে আসিয়াছে বলিয়া। সোনাতনপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়ে বাপের বাড়ী, শ্বশুর বাড়ীও ততোধিক অজ পাড়াগাঁয়ে—রাণাঘাট তাহার কাছে বিরাট সহর। এখানকার প্রত্যেক জিনিষটি তাহার কাছে অভিনব ঠেকিতেছে। সে চিরকাল সংসারে খাটিতেই জানে, কিন্তু বাহিরের আনন্দ কখনও পায় নাই—জীবনে বিশেষ কিছু দেখেও নাই, তাহার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে মনসাপূজার সময় মনসার ভাসান হয় প্রতি শ্রাবণ মাসে, বৎসরের মধ্যে এই দিনটিই তাহার কাছে পরম উৎসবের দিন। সাজিয়া গুজিয়া মনসাতলায় পাড়ার অন্যান্য বৌঝিয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ভাসান শুনিতে যাইবে, এই আনন্দে শ্রাবণ মাসের পয়লা হইতে দিন গুনিত। তাহার মত মেয়েরা রাণাঘাট সহরে আসিয়া অত্যন্ত খুসি হইবারই কথা।

শান্তির শ্বশুর বিপিনকে বলিলেন—ডাক্তার বাবু, এখানে টকি বায়োস্কোপ হয় তো ?

বিপিনও পাড়াগাঁয়ের লোক, সেও কখনো ওসব দেখে নাই—কিন্তু ইহাদের কাছে সে কলিকাতার পাশ-করা ডাক্তার-বাবু, তাহাকে পাড়াগাঁয়ের ভূত সাজিয়া থাকিলে চলিবে না। সে তখনি জবাব দিল—ও টকি ? হয় বৈকি, খুব হয়।

—আপনি বৌমাকে নিয়ে গিয়ে একদিন দেখিয়ে আনুন। আমার কখন কি দরকার হয়, গোপাল থাকুক। বৌমা কখনো জীবনে ওসব দেখে নি—বেচারী দেখুক একটু—

—কেন গোপালও তো দেখেনি—সে-ই যাক শান্তিকে নিয়ে ?

—গোপাল না থাকলে আমার কাজকর্ম্ম—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে দিয়ে তো হবে না ডাক্তারবাবু, তারপর বৌমা আমার কাছে থাকলে—গোপাল একদিন যাবে এখন।

শান্তি রান্না ঘরে রান্না করিতেছে—গোপাল বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, বিপিন গিয়া বলিল—শান্তি, টকি বায়োস্কোপ দেখতে যাবে ? মিত্তির মশায় বললেন তোমাকে নিয়ে দেখিয়ে আসতে।

শান্তি বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—কোথায়, কোথায়, কখন হবে ? চলুন না, আজই চলুন—কখন হয় সে ? আমি কখনো দেখিনি। আমার মেজ ননদের মুখে টকির গল্প শুনেছি, সেই থেকে ভারি ইচ্ছে আছে দেখবার।

বিপিনও টকির খোঁজ বিশেষ কিছু জানেনা—দুপুরের পর বাহির হইয়া সন্ধান করিয়া জানিল বড়বাজারে ফেরিফ্যান রোডের ধারে এক কোম্পানী কলিকাতা হইতে আসিয়া মাস দুই টকি দেখাইতেছে—অদ্যকার পালা 'নরমেধ যজ্ঞ,' ছটার সময় আরম্ভ।

বেলা চারিটার সময় সে শান্তির শ্বশুরের ঔষধ কিনিতে ডাক্তারখানায় গেল—যাইবার সময় শান্তিকে তৈরী থাকিতে বলিয়া গেল। সাড়ে পাঁচটার সময় ফিরিয়া দেখিল শান্তি সাজিয়া গুজিয়া অধার আগ্রহে ঘর-বাহির করিতেছে। বলিল—উঃ, বাপরে, বেলা কি আর আছে। টকি শেষ হয়ে গেল এতক্ষণ। চলুন, শীগগির।

বিপিন বলিল—গাড়ী আনবো, না হেঁটে যেতে পারবে? মিত্তির মশাই কি বলেন?

শান্তির শ্বশুর বলিলেন—আপনিও যেমন, কে-ই বা ওকে চিনচে এখানে, হেঁটেই যাক না।

পথে বাহির হইয়াই শান্তি বলিল—উঃ, পায়ে বড্ড কাঁকর ফুটচে, খালি পায়ে এপথে হাঁটা যায় না।

অগত্যা বিপিন একখানা গাড়ী করিল। শান্তি বলিল—বাবাকে বলবেন না গাড়ীর কথা, আমি পয়সা দিচ্চি, আমার কাছে আলাদা পয়সা আছে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তোমার সব দুষ্টুমি শান্তি, আমি সব বুঝি। তোমার ঘোড়ার গাড়ী চড়বার সাধ হয়েছিল কিনা

বল সত্যি ক'রে। কাঁকর ফোটা কিছু না, বাজে ছল। ধরে ফেলেচি না?

শান্তি হাসিয়া ফেলিল।

—পয়সা তোমায় দিতে হবে—একথা ভাবলে কেন?

—আপনি দিতে যাবেন কেন? আমার সাধ হয়েছিল, আপনার তো হয় নি?

—যদি বলি আমারও হয়েছিল?

—বেশ তবে দিন আপনি।

টকি দেখিতে বসিয়া শান্তি বলিল—আচ্ছা, বলুন তো আপনার সঙ্গে বসে এমনভাবে টকি দেখবো একথা কখনো ভেবেছিলেন?

—কি করে ভাববো বলো?

—আপনি খুসি হয়েচেন বলুন।

বিপিন প্রথম হইতেই নিজেকে অত্যন্ত সতর্ক করিয়া দিয়াছিল মনে মনে। শান্তিকে একা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছে—তাহার সঙ্গে কোনোপ্রকার ভালবাসার কথা বলা হইবে না। ও পথে আর নয়। বিশেষতঃ তাহার স্বামী ও শ্বশুর বিশ্বাস করিয়া তাহার সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়াছে যখন, তখন শান্তিকে একটিও অন্য ধরণের কথা সে বলিবে না।

বিপিন জবাব দিতে পারিত—কেন আমি খুসি হই না হই তোমার তাতে আসে যায় কিছু নাকি?

কিন্তু সে বলিল—খুসি না হবার কারণ কি? আমিও যে

ঘন ঘন টকি দেখি তা তো নয়, থাকি তো সোনাতনপুরে। খুসি হবার কথাই তো। আর এই যে পালাটা হচ্চে নতুন পালা একেবারে।

কথাটা অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া গেল।

বিপিন দেখিল শান্তি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। টকি কখনও না দেখিলেও সে গল্পের গতি এবং ঘটনা তাহার অপেক্ষা ভাল বুঝিতেছে। অনেক জায়গায় শান্তি এমন আবিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে যে বিপিন কথা বলিলে সে শুনিতে পায় না। একবার দেখিল শান্তি আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া কাঁদিতেছে।

বিপিন হাসিয়া বলিল,—ও কি শান্তি? কান্না কিসের?

শান্তি হাসি কান্না মিশাইয়া বলিল, আপনার যেমন কঠিন মন, আমার তো অমন নয়, ছেলেটার দুঃখ দেখলে কান্না পায় না?

—তা হবে। আমার চোখের জল অত সস্তা নয়।

—তা জানি। আচ্ছা, আমি মরে গেলে আপনি কাঁদবেন?

—ও কথা কেন? ও সব কথা থাক।

শান্তি খপ্ করিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া অনেকটা আব্দার এবং খানিকটা আদরের সুরে বলিল,—না, বলুন। বলতেই হবে।

বিপিন হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়ই কাঁদবো।

—সত্যি?

—মিথ্যে বলচি ?

পরক্ষণেই সে শান্তির সঙ্গে কোনো ভালবাসার কথা না বলিবার সঙ্কল্প ভুলিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিল,—আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে ?

শান্তি গম্ভীর মুখে বলিল,—অমন কথা বলতে নেই।

—না, কেন আমার বেলায় বুঝি বলতে নেই। তা শুনবো না, বলতেই হবে।

—না, ও কথার উত্তর নেই। অন্য কথা বলুন।

—এর উত্তর যদি না দাও, তোমার সঙ্গে আর কথা বলবো না।

—না বলবেন, না বলবেন।

—বলবে না ?

—না, আমি তো বলে দিয়েচি।

অগত্যা বিপিন হাল ছাড়িয়া দিল। মনে মনে ভাবিল—শান্তি বেশ একটু একগুঁয়েও আছে, যা ধরিবে, তাই করিবে।

ইণ্টারভ্যালের সময় শান্তি বাহিরে আসিয়া বলিল—সবাই চা খাচ্ছে, আপনি চা খাননি তো বিকেলে, খান না চা, আমি পয়সা দিচ্চি—

—তুমি কেন দেবে ! আমার কাছে নেই নাকি—চল দুজনে খাবো।

শান্তির একগুঁয়েমি আরও ভাল করিয়া প্রকাশ পাইল।

সে বলিল,—সে হবে না, আপনার চা খাওয়ার পয়সা আমি দেবো, নয়তো আমি চা খাবো না।

বিপিন দেখিল ইহার সহিত তর্ক করা বৃথা, অগত্যা তাহাতেই রাজি হইয়া তুজনে চায়ের ষ্টলে একখানা বেঞ্চের উপর বসিল। শান্তি বলিল, আপনি ওই যে বোতলের মধ্যে কি রয়েচে, ওই তুখানা নিন্—শুধু চা আপনাকে খেতে দেবো না।

—তুমিও নাও, আমি একা খাবো বুঝি?

বিপিনের এই সময়ে মনে হইল মনোরমার কথা। বেচারী কখনো টকি বায়োস্কোপ দেখে নাই—সংসারে শুধু খাটিয়াই মরে। একদিন তাহাকে রাণাঘাটে আনিয়া টকি দেখাইতে হইবে—বীণাকেও। সে বেচারীই বা সংসারের কি দেখিল! মা বুড়ো মানুষ, তিনি এসব পছন্দ করিবেন না, বুঝিবেনও না, তিনি চান ঠাকুর দেবতা, তীর্থ ধর্ম্ম।

৩

পুনরায় ছবি আরম্ভ হইবার ঘণ্টা পড়িল। তুজনে আবার গিয়া ভিতরে বসিল। শেষের দিকে ছবি আরও করুণ হইয়া আসিল। এক জায়গায় শান্তি ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া বিপিন বলিল,—ও কি শান্তি? তুমি এমন ছেলে মানুষ! কাঁদে না অমন করে—ছিঃ—চল বাইরে যাবে?

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

—উঁহু তো কেঁদো না। লোকে কি ভাববে ?

ছবি শেষ হইতে বাহিরে আসিয়া শান্তি চুপ চাপ থাকিয়া পথ চলিতে লাগিল। ষ্টেশনের কাছে আসিয়া বিপিন বলিল, — চলো ইষ্টিশান দেখবে ?

—চলুন।

আলোকোজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম্ম দেখিয়া শান্তি ছেলেমানুষের মত খুসি। শান্তিকে সুন্দরী মেয়ে বলা যায় না, কিন্তু তাহার নিজস্ব এমন কতকগুলি চোখের ভঙ্গি, হাসির ধরণ প্রভৃতি আছে যাহা তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বাহির হইতে প্রথমটা তত চোখে পড়ে না এসব—বিপিন এতদিন শান্তিকে দেখিয়া আসিতেছে বটে কিন্তু আজ প্রথম তাহার মনে হইল— শান্তি যে এমন সুন্দর দেখতে, এমন চোখের ভঙ্গি ওর—এ এতদিন তো ভাবিনি ?

আসল কথা, কোথা হইতে বিপিন এতদিন শান্তির রূপ দেখিবে ? আজ ছাড়া পাইয়া মুক্ত, স্বাধীন অবস্থায় শান্তির নারীত্বের যে দিক ফুটিয়াছে তাহাই তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। এ শান্তি এতদিন ছিল না। কাল হইতে আবার হয়তো থাকিবেও না। শান্তির মধ্যে যে নায়িকা এত কাল ছিল ঘন ঘুমে অচেতন, আজ সে জাগিয়াছে। অপরূপ তার রূপ, অদ্ভুত তার ঐশ্বর্য্য। বিপিন ইহা ঠিক বুঝিল না।

সে ভাবিল, আজ তাহার সহিত একা বাহির হইয়া শান্তি নিজের যে রূপ দেখাইতেছে—তাহা এতদিন ইচ্ছা করিয়াই

ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এটুকু অভিজ্ঞতা বিপিনের বহুদিন হইয়াছে যে, মেয়েরা সকলকে নিজের রূপ দেখায় না—যখন যাহার কাছে ইচ্ছা করিয়া ধরা দেয়—সেই কেবল দেখিতে পায়।

বিপিন কিছু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

শান্তিকে একা লইয়া আর কোনোদিন সে বাহির হইবে না। শান্তি তাহাকে জালে জড়াইতে চায়।

কিন্তু বিপিন আর নিজেকে কোন বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে চায় না। মনের দিক হইতে স্বাধীন না থাকিলে সে নিজের কাজে উন্নতি করিতে পারিবে না। এই তো, কাল আর্চ্চার সাহেবকে বলিয়া আসিয়াছে, হাঁসপাতালে একটি শক্ত অস্ত্রোপচার করা হইবে একটি রোগীর, বিপিন কাল দেখিতে যাইবে। তবুও যতটুকু শেখা যায়।

শান্তিকে লইয়া খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া বলিল,—চল এবার বাসায় যাই—

—আর একটুখানি থাকুন না? বেশ লাগচে।

একখানা ট্রেণ কলিকাতার দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বহু যাত্রী উঠিল, বহু যাত্রী নামিল।

শান্তি এসব অবাক চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে এসব ভাল করিয়া কখনো দেখে নাই, দু তিন বার সে রেলে চড়িয়া এখান ওখান গিয়াছে—একবার গিয়াছিল শিমুরালি গঙ্গা-

স্নানের যোগে মা-বাবার সঙ্গে, তখন তাহার বয়স মোটে এগারো বছর, আর একবার স্বামীর সঙ্গে পিস্‌তুতো ননদের ছেলের বিবাহে এই লাইনে গিয়াছিল শ্যামনগর মূলাজোড়। সেও আজ দু তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইয়া কখনও সে এত বড় একটা ইষ্টিশানের কাণ্ডকারখানা দেখে নাই।

বিপিনের নিজেরও বেশ লাগিতেছিল। কোথায় পড়িয়া থাকে বারো মাস, কোথা হইতে এ সব দেখিবে? রাণাঘাটের মত সহর বাজার জায়গায় থাকিতে পাইলে সামান্য টাকা রোজগার হইলেও সুখ। পাঁচ জনের সহিত মিশিয়া, পাঁচটা জিনিষ দেখিয়া সুখ।

সে কথা শান্তিকে সে বলিল।

শান্তি বলিল,—সত্যি। আচ্ছা, আমরা কোথায় পড়ে থাকি ডাক্তারবাবু, গরুর মত কিংবা মোষের মত দিন কাটাই। কি বা দেখলাম জীবনে, আর কি বা—

—সত্যি, কি দেখতে পাই?

—শুনতেই বা পাই কি? এই যে ধরুন আজ টকি দেখলাম, এ কেউ দেখেছে আমাদের গাঁয়ে কি আমাদের শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ে? আহা, ও বোধ হয় দেখেনি, ও কাল দেখুক এসে।

—কে, গোপাল? গোপাল কখনো টকি দেখেনি?

—কোত্থেকে দেখবে! আপনিও যেমন! ওরা কেউ দেখেনি। কাল পাঠিয়ে দেবো বিকেলে।

—আমিও সত্যি বলচি শান্তি—এই প্রথম দেখলাম টকি বায়োস্কোপ। দেখেছি অনেক দিন আগে—সে তখনকার আমলে। বাবার পয়সা তখনও হাতে ছিল, একবার কলকাতায় গিয়ে বায়োস্কোপ দেখি। তখন টকি হয় নি। তারপর বহুকাল হাতে পয়সা ছিল না, নানা গোলমাল গেল—

বিপিন নিজের জীবনের কথা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে কখনও শান্তির কাছে বলে নাই। শান্তির বোধ হয় খুব ভাল লাগিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল এ সব কথা।

খানিক ক্ষণ দুজনে চুপচাপ। মিনিট পাঁচ ছয় কাটিয়া গেল।

বিপিন হঠাৎ বলিল,—কি কথা মনে হচ্ছে জানো শান্তি ?

শান্তি যেন সলজ্জ আগ্রহের সহিত বলিল,—কি ?

—সেই মতি বাগ্‌দীনীর কথা।

শান্তির মুখে নিরাশা ও বিস্ময় একই সঙ্গে ফুটিল। অবাক হইয়া বলিল,—কেন, তার কথা কেন ?

বিপিন ভাবিল, যদি মানী আজ থাকিত, এ প্রশ্ন করিত না। মনের খেলা বুঝিতে তার মত মেয়ে বিপিন আজও কোথায় দেখে নাই।

তবুও বলিল,—তুমি দেখনি শান্তি, কি করে সে মরেচে, সেই শীতের রাত, গায়ে লেপ কাঁথা নেই, খড় বিচুলি আর ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। অথচ কত অল্প বয়েস···আমি এখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজলে সেই জেয়ালা-বল্লভপুরের বিল, সেই

চাঁদের আলো, বিলের ধারে চিতা, চিতার এদিকে আমি, ওদিকে বিশ্বেশ্বর, এসব চোখের সামনে দেখতে পাই—

কিন্তু শান্তি বুঝিল। শান্তি যে উত্তর দিল, বিপিন তাহা আশা করে নাই। বলিল,—ডাক্তারবাবু, সে জায়গাটা আমায় একবার দেখিয়ে আনবেন তো? সেদিন আপনার মুখে ওর কথা শুনে পর্য্যন্ত আমিও ভুলতে পারিনি। হোক নীচু জাত, ওই একটা জিনিষে বড্ড উঁচু হয়ে গেছে। চলুন ওই বেঞ্চি-খানায় বসি একটু।

—আবার বসবে কেন? রাত হোল, বাসায় ফিরি।

—আমার পা ধরে গিয়েচে। ওখানে কি বিক্রী হচ্চে? চা? আর একটু চা খান—

—আমি আর নয়। তোমার জন্যে আনবো?

—তবে পান কিনে আনুন, আমার জন্যে আমি বলিনি। আপনি চা ভাল বাসেন, তাই বলছিলাম।

পানের দোকান নিকটে নাই, কিছু দূরে প্ল্যাটফর্ম্মের ওদিকে। শান্তিকে বেঞ্চে বসাইয়া বিপিন পান আনিতে গিয়া হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গেল। আপ্ প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে কিছু সরিয়া ওভারব্রিজের কাছে একটি মেয়ে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া আছে—তাহার আসে পাশে আরও দু একটা ছোট খাট সুটকেস্, বিছানা, আরও কি কি। এই মাত্র যে ট্রেণখানা গেল, সেই ট্রেণ হইতেই নামিয়া থাকিবে, বোধ হয় সঙ্গের লোক

বাহিরে গাড়ী ঠিক করিতে গিয়াছে, মেয়েটি জিনিষ আগুলিয়া বসিয়া আছে। মেয়েটি অবিকল মানীর মত দেখিতে পিছন হইতে। সেই ভঙ্গি, সেই সব।...কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, এখনও তাহার মত অন্য মেয়ে দেখিলেও তাহারই কথা মনে পড়ে।...

এই সময় মেয়েটি একবার পিছনের দিকে চাহিল।

বিপিন চমকিয়া উঠিল।

পরম বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সে স্থান কাল পাত্র সব কিছু ভুলিয়া গেল ওভারব্রিজের তলায়। তাহার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে।

৪

বিপিন নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ যে মেয়েটি পিছন ফিরিয়া চাহিয়াছিল, সে—মানী!

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিপিনের চলিবার শক্তি যেন রহিত হইল। মানী এদিকে চাহিয়া আছে বটে কিন্তু তাহার দিকে নয়—তাহাকে সে দেখিতে পায় নাই। বিপিন অগ্রসর হইয়া মানীর সামনে গিয়া বলিল—এই যে মানী! তুমি এখানে?

মানী চমকিয়া উঠিয়া অন্য দিক হইতে মুহূর্ত্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার মুখে বিস্ময়—গভীর, অবিমিশ্র বিস্ময়।

বিপিন হাসিয়া বলিল—চিনতে পারচ না? আমি—

মানীর মুখ হইতে বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটে নাই। পরক্ষণেই সে ট্রাঙ্কের উপর হইতে উঠিয়া হাসিমুখে বিপিনের দিকে আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—বিপিন দা! তুমি কোথা থেকে?

বিপিন মানীকে 'তুই' বলিতে পারিল না, অনেক দিন পরে দেখা, কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল। বলিল—আমি? আমি রাণাঘাটে এসেচি কাজে। বলচি। কিন্তু তুমি এমন সময় এখানে?

মানী চোখ নামাইয়া নীচু দিক চাহিয়া ধরা গলায় বলিল—তুমি কি করেই বা জানবে। বাবা মারা গিয়েচেন—কাল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ। তাই পলাশপুর যাচ্চি আজ। এই ট্রেণে নামলাম।

বিপিন বিস্ময়ের স্বরে বলিল—অনাদি বাবু মারা গিয়েচেন? কবে? কি হয়েছিল?

—কি হয়েছিল জানিনে। পরশু টেলিগ্রাম করেচে এখানকার নায়েব হরিবাবু। তাই আজ আমার দেওরকে সঙ্গে নিয়ে আসচি, উনি আসতে পারলেন না—কেস আছে হাতে। বোধ হয় কাজের দিন আসবেন। দেওর গাড়ী ডাকতে গিয়েচে—তাই বসে আছি।

বিপিন দুই চক্ষু ভরিয়া যেন মানীকে দেখিতেছিল। এখনও যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এই সেই মানী। সেই রকমই দেখিতে এখনও। এতটুকু বদলায় নাই।

—বিপিন দা, ভাল আছ? কোথায় আছ, কি করচ এখন?

—এখন যে আমি ডাক্তার, নাম-করা পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার। রুগী নিয়ে রাণাঘাটের হাঁসপাতালে এসেচি, রুগীর বাসাতেই আছি। আমাদের দেশের ওই দিকে সোনাতনপুর বলে একটা গাঁ, সেখানেই থাকি। মনে আছে মানী; ডাক্তারি করার পরামর্শ তুমিই দিয়েছিলে প্রথম। তাই আজ দুটো ভাত করে খাচ্চি।

—সত্যি, বিপিন দা! সত্যি বলচো এসব কথা?

—সাক্ষী হাজির করতে রাজি আছি, মানী। বিশ্বাস করো আমার কথা।

—ভারি আনন্দ হোল শুনে। কিন্তু বিপিন দা, তোমার সঙ্গে যে এক রাশ কথা রয়েচে আমার। একটি রাশ কথা।

বিপিন ঠিকমত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেছিল না। আজ কি সুন্দর দিনটা, কার মুখ দেখিয়া যে উঠিয়াছিল আজ! এই রাণাঘাট ষ্টেশনে জীবনের এমন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—মানীর সঙ্গে দেখা—

সে শুধু বলিল—আমারও এক রাশ কথা আছে, মানী।

মানী বলিল—আমার একটি কথা রাখবে বিপিন দা, পলাশপুরে এসো। বাবার কাজের দিন পড়েচে সামনের বুধবার, তুমি আর দু দিন আগে এসো। তোমার আসা তো উচিতও, এসময় তোমায় দেখলে মাও যথেষ্ট ভরসা পাবেন।

—যাওয়া আমার খুব উচিত। বাবার আমলের মনিব, আমার একটা কর্ত্তব্য তো আছে; কিন্তু একটা কথা হচ্চে—

মানী ছেলেমানুষের মত মিনতি ও আবদারের সুরে বলিল—ও সব কিন্তু টিন্তু শুনবো না···আসতেই হবে, তোমার পায়ে পড়ি এসো বিপিন দা—আসবে না ?

এই সময় শান্তি আসিয়া সলজ্জ ভাবে অদূরে দাঁড়াইল।

মানী বলিল—ও কে বিপিন দা ?

বিপিন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মানী জানে সে কি রকম চরিত্রের লোক ছিল পূর্ব্বে, হয়তো ভাবিতে পারে পয়সা হাতে পাইয়া বিপিন দা আবার আগের মত—যাহাই হোক, শান্তি কেন এ সময় এখানে আসিল ? আর কিছুক্ষণ বেঞ্চিতে বসিলে কি হইত তাহার !

বলিল—ও গিয়ে আমাদের গাঁয়েরই—মানে ঠিক আমাদের গাঁয়ের নয়, আমি যেখানে ডাক্তারি করি সে গাঁয়েরই—ওর বাবা আমার রুগী।

মানী বলিল—ডাকো না এখানে ! বেশ মেয়েটি।

বিপিন শান্তিকে ডাকিয়া মানীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। মানী তাহার হাত ধরিয়া ট্রাঙ্কের উপর বসাইয়া বলিল—বসো না ভাই এখানে, তোমার বাবার কি অসুখ ?

—চোখের অসুখ, তাই ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে করে আমরা রাণাঘাটের সায়েব ডাক্তারের কাছে দেখাতে এসেচি পরশু। আপনি বুঝি ডাক্তার বাবুর গাঁয়ের লোক ?

—না ভাই, আমার বাপের বাড়ী পলাশপুর, এখান থেকে চার ক্রোশ—

এই সময় মানীর দেওর আসিয়া বলিল—বৌদি, গাড়ী এই রাত্তির বেলা যেতে চায় না—অনেক কষ্টে একখানা ঠিক করেচি। চলুন উঠুন।

মানী দেওরের সহিত বিপিনের পরিচয় করাইয়া দিল। মানীর দেওর বেশ ছেলেটি, কোন্ কলেজে বি, এ পড়ে—এইটুকুই মাত্র বিপিন শুনিল, তাহার মন তখন সে দিকে ছিল না।

মানী গাড়ীতে উঠিবার সময় বার বার বলিল—কবে আসচো পলাশপুরে বিপিন দা ? কালই এসো।

—এঁরা এখানে তুদিন থাকবেন তো ? তুমি সেই ফাঁকে ঘুরে এসো আমাদের ওখান। আসাই চাই ; মনে থাকে যেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে শান্তি যেন কেমন একটু বিমনা। সে জিজ্ঞাসা করিল—উনি কে ডাক্তারবাবু ? আপনার সঙ্গে কি করে আলাপ ?

বিপিন বলিল—আমি আগে যে জমিদার বাড়ী কাজ করতাম, সেই জমিদার বাবুর মেয়ে। আমার বাবাও ওখানে কাজ করতেন কিনা, ছেলেবেলায় ওদের বাড়ী যেতাম—ওর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করেছি—অনেক দিনের জানাশুনো।

শান্তি বলিল—বেশ লোক কিন্তু। অত বড় মানুষের মেয়ে, মনে কোনো ঠ্যাকার নেই। দেখতেও ভারি চমৎকার।

রাত্রে সেদিন বিপিনের ঘুম হইল না। মনের মধ্যে কি এক প্রকারের উত্তেজনা, কি যে আনন্দ, তাহা প্রকাশ করিয়া

বলা যায় না—যত ঘুমাইবার চেষ্টা করে—বিছানা যেন গরম আগুন, মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—আজ মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—মানী তাহাকে পলাশপুর যাইতে বার বার অনুরোধ করিয়াছে—অনেকবার করিয়া বলিয়াছে—সেই মানী। এসব জিনিষও জীবনে সম্ভব হয়?

শুধু মানীর অনুরোধই বা কেন—অনাদিবাবু তাহার বাবার আমলের মনিব। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার সেখানে একবার যাওয়াটা লৌকিক এবং সামাজিক উভয় দিক দিয়াই একটা কর্ত্তব্য বই কি।

৫

সকালে উঠিয়া সে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যথারীতি হাঁসপাতালে গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া শান্তিকে বলিল—শান্তি, ভাত চড়িয়ে দাও তাড়াতাড়ি, আমি আজই পলাশপুর যাবো। শান্তি নিজে ভাত রাঁধিয়া বিপিনকে দিত না, তবে হাঁড়ি চড়াইয়া দিত, বিপিন নামাইয়া লইত মাত্র। তরকারী রাঁধিবার সময়ে নিজে রান্না করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখাইয়া দিত কি ভাবে কি রাঁধিতে হইবে।

শান্তি মন-মরাভাবে বলিল—আজই?

—হ্যাঁ, আজই যাই। বলে গেল কি না কাল—যাওয়া উচিত আজ। বাবার অন্নদাতা মনিব, বুঝলে না?

—আমাকে নিয়ে চলুন না সেখানে?

বিপিন অবাক হইয়া গেল। শান্তি বলে কি! সে কোথায় যাইবে?

শান্তি অবার বলিল—যাবেন নিয়ে? চলুন না ওঁদের বাড়ীঘর দেখে আসি—কখনো তো কিছু দেখিনি—থাকি পাড়াগাঁয়ে পড়ে।

—তা হয় না শান্তি, কে কি মনে করবে, বুঝলে না? আর তুমি চলে গেলে তোমার শ্বশুর কি করবেন?

—একদিনের জন্যে ও চালিয়ে নিতে পারবে এখন। ও সব কাজে মজবুত, আপনার মত অকেজো নয় তো কেউ!

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কে কি ভাবতে পারে—গেলে গোপালকেও নিয়ে যেতে হয়। তা তো সম্ভব হচ্চে না, বুঝলে না?

শান্তি নিরুত্তর রহিল—কিন্তু বোঝা গেল সে মনঃক্ষুন্ন হইয়াছে।

বেলা তিনটার সময় শান্তির স্বামী ও শ্বশুরকে বলিয়া কহিয়া দুদিনের ছুটি লইয়া সে পলাশপুর রওনা হইল। যাইবার সময় শান্তি পান সাজিয়া একখানা ভিজা নেকড়ায় জড়াইয়া হাতে দিয়া বলিল—বড্ড রোদ্দুর, জলতেষ্টা পেলে মাঠের মধ্যে পান খাবেন। পরশু ঠিক চলে আসবেন কিন্তু। বাবা কখন কেমন থাকেন, আপনি না এলে মহা ভাবনায় পড়ে যাবো আমরা।

ষ্টেশনের পাশের সেগুন বাগান ছাড়াইয়া সোজা মেটে

রাস্তা উত্তরমুখে মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এখনও রৌদ্রের খুব তেজ, যদিও বেলা চারটা বাজিতে চলিল। এই পথ বাহিয়া আজ পাঁচ বছর পূর্ব্বে বিপিন ধোপাখালির কাছারী বা মানীদের বাড়ী হইতে কতবার কাগজপত্র লইয়া রাণাঘাটে উকীলের বাড়ী মোকর্দ্দমা করিতে আসিয়াছে, এই পথের প্রতিটি বৃক্ষলতা তাহার সুপরিচিত—শুধু সুপরিচিত নয়, সেই সময়কার কত স্মৃতি, মানীর কত হাসির ভঙ্গি, কত আদরের কথা ইহাদের সঙ্গে জড়ানো। কত কত! সে সব কথা আজ ভাবিয়া লাভ কি?

বেলা পাঁচটার সময় কলাধরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর সামনে আসিতেই পথে হঠাৎ বিশ্বাসের বড় ছেলে মোহিতের সঙ্গে দেখা। মোহিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—একি, নায়েব মশায় যে! এতদিন কোথায় ছিলেন? চলেচেন কোথায়? পলাশপুরেই? ও, তা আবার কি ওদের ষ্টেটে—অনাদিবাবু তো মারা গিয়েচেন—

বিপিন সংক্ষেপে বলিল, ষ্টেটে চাকুরী করিবার জন্য নয়, অনাদিবাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়াই সে পলাশপুর যাইতেছে—বর্ত্তমানে সে ডাক্তারী করে। মোহিত ছাড়ে না, বেলা পড়িয়াছে, একটু কিছু খাইয়া তবে যাইতে হইবে, পূর্ব্বে রাণাঘাট হইতে যাতায়াতের পথে তাহাদের বাড়ীতে বিপিনের কত পায়ের ধূলা পড়িত—ইত্যাদি।

অগত্যা কিছুক্ষণ বসিতে হইল।

কতকাল পরে আবার পলাশপুরের বাড়ীতে মানীর সঙ্গে

দেখা হইবে! সেই বাহিরের ঘর, সেই দালান, সেই দালানের জানালাটি, যেখানটিতে মানী তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত!

সন্ধ্যার পর সে অনাদিবাবুদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া গেল। প্রথমেই বীরু হাড়ির সঙ্গে দেখা—সেই বীরু হাড়ি পাইক, যে ইহাদের ষ্টেটে এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। তাহাকে দেখিয়া বীরু ছুটিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল—নায়েব বাবু যে! কনে থেকে আলেন এখন?

—ভাল আছিস্ রে বীরু?

—আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে—তা ঝান্, মা ঠাকরোণের সঙ্গে একবার দেখাডা করে আসুন। বিপিন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে অনাদিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিল। তিনি বিপিনকে দেখিয়া চোখের জল ফেলিয়া অনেক পুরানো কথা পাড়িলেন। তাহার বাবা বিনোদবাবুর সময় ষ্টেটের অবস্থা কি ছিল, আর এখন কি দাঁড়াইয়াছে, আয় বড়ই কমিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান নায়েবটিও বিশেষ কাজের লোক নয়, তাহার উপর কর্ত্তা মারা গেলেন। এখন যে জমিদারী কে দেখাশুনা করিবে তাহা ভাবিয়াই তিনি নাকি কাঠ হইয়া যাইতেছেন। পরিশেষে বলিলেন—তা তুমি এখন কি করছ বাবা?

বিপিন এ প্রশ্নের উত্তর দিল। সে চারিদিকে চাহিতেছিল, সেই অতি সুপরিচিত ঘরদোর, আগেকার দিনের কত কথা স্বপ্নের মত মনে হয়—আবার সেই বাড়ীতে আসিয়া সে

দাঁড়াইয়াছে—ওই সে জানালাটি—এসব যেন স্বপ্ন—সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এখনও যেন শক্ত।

অনাদিবাবুর স্ত্রী বলিলেন—তা বাবা, কর্ত্তা নেই, আমি মেয়েমানুষ, আমার হাত পা আসচে না। তুমি বাড়ীর ছেলে, দেখ শোনো, যাতে যা হয় ব্যবস্থা করো। তোমাকে আর কি বলবো?

—মা, ওপরের চাবিটা একবার দাও তো—সিন্দুক খুলে রূপোর বাটিগুলো—

বলিতে বলিতে মানী বারান্দা হইতে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই বিপিনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত মুখে বলিল—ওমা, বিপিনদা, কখন এলে? এখন? কিছু তো জানিনে—তা একবার আমাকে খোঁজ করে খবর পাঠাতে হয়—এসো, এসো, এসে বসো দালানে।

মানীর মা বলিলেন—হ্যাঁ, বসো বাবা। মানী সেদিন বলছিল রাণাঘাট ইষ্টিশানে তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তোমাকে আসতে বলেচে—আমি বল্লুম, তা একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলি নে কেন? কতদিন দেখিনি—

মানী বলিল—বোসো বিপিনদা, আমি একটু চা করে আনি—হেঁটে এলে এতটা পথ। কিছুক্ষণ পরে চা ও খাবার লইয়া মানী ফিরিল। বলিল—বিপিনদা, তোমায় এ বাড়ীতে আবার দেখে মনে হচ্চে, তুমি কোথাও যাওনি, আমাদের এখানেই যেন কাজ কর। পুরোনো দিন যেন ফিরে এসেচে—না?

—সত্যি। বোস্ না এখানে মানী? তোর দেওর কোথায়?

মানী হাসিয়া বলিল—তবুও ভালো, পুরোনো দিনের মত ডাকচো। রাণাঘাট ইষ্টিশানে যে 'আপনি' 'আজ্ঞে' সুরু করেছিলে! আমার দেওরকে কলকাতায় পাঠিয়েচি চতুর্থীর শ্রাদ্ধের জিনিষপত্র কিনতে। এখানে না এসে এষ্টিমেট ঠিক না করে তো আগে থেকে জিনিষপত্র কিনে আনতে পারিনে?

—সে কবে?

—কাল রাত পোয়ালেই। ভালোই হয়েচে তুমি এসেচ। আমার কাজের দিন তোমাকে পেয়ে আমার সাহস হচ্চে। দেখবার কেউ নেই—তুমি দেখে শুনে যাতে ভালভাবে সব মেটে, নিন্দে না হয় তার ব্যবস্থা করো।

—তুই এখানে এসেছিলি আরও আমি চলে গেলে?

—হুঁ—কতবার এসেচি গিয়েচি—

—আমার কথা মনে হোত?

—বাপরে! প্রথম যখন আসি তখন টিঁকতে পারিনে বাড়ীতে। সেই যে আমি রাগ করে ওপরে গেলাম, তার পরেই সকালে উঠে দেখি তুমি রাণাঘাটে চলে গিয়েচ—আর কোনদিন দেখা হয়নি তারপর—সেই কথাই কেবল মনে পড়তো।

—আচ্ছা, কলকাতায় থাকলে আমার কথা মনে পড়ে?

—পড়ে না যে তা নয়। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে

কলকাতায় ভুলে থাকি পাঁচ কাজ নিয়ে। সেখানে তুমি কোনোদিন যাওনি, সেখানকার বাড়ীঘরের সঙ্গে যাদের যোগ বেশী, তাদের কথাই মনে হয়। কিন্তু এখানে এলে—বাপরে! আচ্ছা, চা খেয়ে একটু বাইরে গিয়ে দেখাশুনো কর, আমি এরপর তোমার সঙ্গে কথা বলবো আবার। এখন বড় ব্যস্ত—

রাত্রে বিপিন পুরানো দিনের মত রান্নাঘরে বসিয়া খাইল, পরিবেশন করিল মানী নিজে। আহারান্তে বাহির হইয়া আসিবার সময় বিপিন দেখিল, মানী কখন আসিয়া সেই জানালাটিতে দাঁড়াইয়াছে। হাসিমুখে বলিল—ও বিপিনদা।

সাধে কি বিপিনের মনে হয়, মানীর সঙ্গে তাহার পরিচিতা আর কোনো মেয়ের তুলনা হয় না; আর কোন মেয়ে তাহার মন বুঝিয়া এ রকম করিত? মানীর সঙ্গে ইহা লইয়া কোনো কথাই তো হয় নাই এপর্য্যন্ত। অথচ সে কি করিয়া বুঝিল, বিপিনের মন কি চায়!

বিপিন হাসিয়া জবাব দিল—ও মানী।

—মনে পড়ে?

—সব পড়ে।

—ঠিক?

—নিশ্চয়। নইলে কি করে বুঝলুম। বাবা, তুমি অন্তর্য্যামী মেয়েমানুষ। মানী জিব বাহির করিয়া দুই চোখ বুজিয়া মুখ ভ্যাঁঙ্গাইল।

—সত্যি মানী, তোর তুলনা নেই।

—সত্যি ?

—নির্ভুল সত্যি।

—কখনো ভেবেছিলে বিপিনদা, এমন হবে আবার ?

—স্বপ্নেও না। কিন্তু মানী, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে, কখন হবে ?

—বাইরের ঘরে গিয়ে বোসো। আমি পান নিয়ে যাচ্চি।

একটু পরেই মানী বৈঠকখানায় ঢুকিয়া চৌকির উপর পানের ডিবাটি রাখিয়া কবাট ধরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—তুমি এখন কি করচো, কোথায় আছ ভাল করে বল। সেদিন কিছুই শুনিনি। সেদিন কি আমার ওসব শোনবার মন ছিল বিপিনদা ? কতকাল পরে দেখা বল তো ?

বিপিন তাহার ডাক্তারী জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া গেল। সোনাতনপুরের দত্তবাড়ীর কথা, শান্তির কথা, মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর কথা।

রাত হইয়াছে। ইতি মধ্যে দুবার মানী বাড়ীর মধ্যে গেল মায়ের ডাকে, আবার ফিরিল। সব কথা শুনিয়া বলিল—বিপিনদা, তুমি আমার চিঠি একখানা পেয়েছিলে একবার ?

—নিশ্চয়।

—ওই সময়টা আমার মন বড্ড খারাপ হয়েছিল পুরোনো কথা ভেবে। তাই চিঠিখানা লিখেছিলুম। আমার কথা ভাবতে ? সত্যি বল তো—

—সর্ব্বদাই। বেশী করে একদিন মনে পড়েছিল, সে দিনটির কথা বলি।

তারপর জেয়ালা বল্লভপুরের বিলের ধারের সেই রাত্রির ব্যাপার বিপিন বলিল। মতি বাগ্‌দীনীর সর্ব্বত্যাগী প্রেমের কথা, তাহার অতীব দুঃখজনক মৃত্যুর কথা।

সব শুনিয়া মানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অদ্ভুত!

—তোকে বলবো বলে সেইদিনই ভেবেছি। তোর কথাই মনে হয়েছিল সকলের আগে সেদিন।

—আচ্ছা, কেন এমন হয় বিপিনদা? দুঃখের সময় কেন এমন করে মনে পড়ে? সত্যি বলচি, তবে শোনো। আমার খোকা যখন মারা গেল, এক বছর বয়েস হয়েছিল, আজ বাঁচলে তিন বছরেরটি হোত, রাত তিনটের সময় মারা গেল ভবানীপুরের বাড়ীতে। একশো কান্নাকাটির মধ্যে তোমার কথা মনে পড়লো কেন আমার?

—এ রোগের ওষুধ নেই মানী। কেন, কি বলবো!

—অথচ ভেবে দ্যাখো, সে সময় কি তোমার কথা মনে পড়বার সময়? তবে কেন মনে পড়লো?

তারপর দুজনেই চুপচাপ। নীরবতার ভাষা আরও গভীর হয়, নীরবতার বাণী অনেক কথা বলে। কিছুক্ষণ পরে বিপিন বলিল—কাল সকালে আমি চলে যাবো মানী। ডাক্তার লোক, রুগী ফেলে এসেচি।

—বেশ। আমি বাধা দেবো না।

—তুই আমায় মানুষ করে দিয়েছিস মানী।

—শুনে সুখী হলুম।

—জানিস মানী, ওই যে তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি এখান থেকে চলে যাবার পরে, সেই দুঃখটা মনের মধ্যে বড্ড ছিল। আজ আর তা রইল না। সুতরাং চলে যাই।

—না, যেও না বিপিনদা। বাবার চতুর্থীর শ্রাদ্ধটা আমি করচি, থেকে যাও। একটু দেখাশুনো করতে হবে তোমাকে।

—তবে থাকি। তুই যা বলবি।

—তোমার সঙ্গে সেদিন যে বউটিকে দেখলুম, ও তোমার সঙ্গে বেড়ায় কেন?

—বেড়ায় না মানী। সিনেমা দেখতে এসেছিল সেদিন, শ্বশুর অন্ধ, তার কাছে কে থাকে, তাই ওর স্বামী ছিল।

—মেয়েমানুষের চোখ এড়ানো বড় কঠিন বিপিনদা, ও মেয়েটি তোমায় ভালবাসে।

—কে বললে?

—নইলে কক্ষনো তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে আসতে চাইত না পাড়াগাঁয়ের বউ। তোমার বয়েসও বেশী নয় কিছু। আসতে পারতো না।

—ও!

—আমার কথা শোনো। তোমার স্বভাবচরিত্র ভাল না, ওর সঙ্গে আর মিশো না বেশী।

বিপিন হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—বেহ্মধম্মের লেকচার দিচ্চিস যে! পাদ্রি সাহেব!

মানীও হাসিয়া ফেলিল। পুনরায় গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—না, সত্যি বলচি, শোনো। ওকে কষ্ট দেবে কেন মিছিমিছি? ওর সঙ্গে মেলামেশা কোরো না। মেয়েমানুষ বড্ড কষ্ট পায়। মতি বাগ্‌দীনীর কথা ভাবো।

বিপিন বলিল—ধোপাখালিতে এক বুড়ী ছিল, সেও তোর সম্বন্ধে আমায় একথা বলেছিল।

—আমার সম্বন্ধে? কে বুড়ী? ওমা, সে কি! শুনিনি তো কক্ষনো?

বিপিন সংক্ষেপে কামিনীর কাহিনী বলিয়া গেল।

মানী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ঠিক বলেছিল বিপিনদা। এ কষ্ট সাধ করে কেউ যেন বরণ করে না! তবে কামিনী বুড়ী যখন বলেছিল, তখন আর উপায় ছিল কি?

—নাঃ।

—শান্তির সঙ্গে দেখাশুনো করবে না। সোনাতনপুর ওদের বাড়ী যদি ছাড়তে হয়, তাও করবে এজন্যে। বউদিদিকে নিয়ে যাও না? যেখানে থাকো সেখানে?

—বেশ। তুমি শান্তির বরের একটা চাকরী করে দাও না কলকাতায়? বড় ভাল ছেলেটি। শান্তির একটা উপায় করো অন্তত।

—চেষ্টা করবো। ওঁকে বলে দেখি—হয়ে যেতে পারে।

—জানিস মানী, শান্তির তোকে বড্ড ভাল লেগেছে। ও এখানে আসতে চাচ্ছিল।

—সে আমার জন্যে নয় বিপিনদা। সে তোমার জন্যে— তোমার সঙ্গ পাবে এই জন্যে। ওসব আর আমায় শেখাতে হবে না। আমি মনকে বোঝাচ্চি, তোমার সঙ্গে কাল শ্রাদ্ধের কথাবার্ত্তা বলতে এসেছি। কিন্তু তাই কি এসেচি? এতক্ষণ বসে তোমার সঙ্গে বক্ বক্ করচি কি সেইজন্যে?

পরদিন সকাল হইতে কাজকর্ম্মের খুব ভিড়। জমিদারের বড় মেয়ে বড়মানুষের বউ, খুব জাঁক করিয়াই চতুর্থীর শ্রাদ্ধ হইবে। বিপিন খাটিতে লাগিয়া গেল সকাল হইতেই। আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত। লোক-জনের কোলাহলে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।

মানী একবার বলিল—আহা, শান্তিকে আনলে হোত বিপিনদা! নিজে মুখ ফুটে বলেছিলো, আনলে না কেন? সব তোমার দোষ।

—না এনেই অত মুখনাড়া শুনলাম, আনলে কি আর রক্ষে ছিল?

—কীর্ত্তনের দল আনতে রাণাঘাটে গাড়ী যাচ্চে, তুমি গিয়ে ওই গাড়ীতে তাকে নিয়ে আসবে?

—সে উচিত হয় না, মানী। অন্ধ শ্বশুর দু দিন পড়ে থাকবে কার কাছে? থাক গে ওসব।

ধোপাখালির অনেক প্রজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল।

তাহাকে দেখিয়া সকলেই খুব খুসি। নরহরি দাসও আসিয়াছিল। সে বিপিনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—লায়েববাবু যে! অনেক দিনের পর আপনার সঙ্গে দ্যাখা। ভাল আছেন? আপনি চলে যাবার পর ধোপাখালি অনুপায় হয়ে গিয়েচে বাবু! সবাই আপনার কথা বলে।

বিপিন তাহার কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিল। বলিল—হ্যাঁরে, তোদের গাঁয়ে ডাক্তারি চলে? আমি আজকাল ডাক্তারি করি কিনা?

নরহরি দাস বলিল—আসুন, এখ্‌খুনি আসুন বাবু। ডাক্তারের যে কি কষ্ট, তা তো নিজের চোখে তুমি দেখেই এসেচ। আপনারে পেলি লোকে আর কোথাও যাবে না। ওষুধ খেয়েই মরবে।

সারাদিন বিপিন বাহিরের কাজকর্ম্মের ভিড়ে ব্যস্ত রহিল। মানীর সঙ্গে দেখাশুনা হইল না। অনেক রাত্রে যখন কীর্ত্তন বসিয়াছে, তখন মানী আসিয়া বলিল—বিপিনদা, খাবে এসো, রান্নাঘরে জায়গা করেচি।

রান্নাঘরের দাওদায় মানী নিজের হাতে তাহার পাতে লুচি তরকারি পরিবেশন করিতে করিতে বলিল—আমি জানি তুমি সারাদিন খাওনি, পেট ভরে খাও এখন।

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল—তুই কি করে জানলি?

—আমি সব জানি।

—সাধে কি বলি, অন্তর্য্যামী মেয়ে?

—নাও, এখন ভাল করে খাও দিকি। বাজে কথা রাখো। দই আর ক্ষীর নিয়ে আসি—তুমি ক্ষীর ভালবাসতে খুব।

আরও ঘণ্টা দুই পরে নিমন্ত্রিতাদের আহারের পর্ব্ব মিটিল। বাড়ী অনেক নিস্তব্ধ হইল। বাহিরের উঠানে কীর্ত্তনসভা ভঙ্গ হইল।

বিপিন মানীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল—মানী, কীর্ত্তনের দল গাড়ী করে রাণাঘাট যাচ্ছে, আমি ওই সঙ্গে চলে যাই।

—তাই যাবে! বেশ যাও। যা কিন্তু বলে দিয়েচি, মনে থাকবে?

—নিশ্চয়। তুই যা বলবি, তাই করবো।

—শান্তির সঙ্গে আর মিশবে না, ও ছেলেমানুষ—তার ওপর অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে।

—মানী, সে কথা আমিও ভেবেছিলুম বহুদিন আগেই। তবে চালাবার লোক না পাওয়া গেলে আমাদের মত লোকে সব সময় ঠিক পথে চলে না। এবার থেকে সে ভুল আর হবে না। আমি ভাবছি, ধোপাখালিতে যদি ডাক্তারী করি তবে কেমন হয়?

—সত্যি ভেবেছ বিপিনদা? খুব ভাল হয়। তুমি ওখানে নায়েব ছিলে, সবাই চেনে বেশ চলবে। ওদিকে ছেড়ে দিয়ে এদিকে এসো।

—তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে মানী?

মানী হাসিয়া বলিল—আর জন্মে। এ জন্মে যাদের ওপর যা কর্ত্তব্য আছে, করে যাই—বিপিনদা।

বিপিন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বেশ, ভুল হবে না ?

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল, আবার ভুল ? আমি নির্ব্বোধ, এ অপবাদ অন্তত তুমি আমায় দিওনা বিপিন দা। দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

তারপর মানী গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল—আমার আর একটা কথা রেখো। যেখানেই থাকো, বৌদিদিকে নিয়ে এসো সেখানে। অমন করে কষ্ট দিও না সতীলক্ষ্মী মেয়েকে। যদি সাপের কামড়ে মারাই যেতেন, সে কষ্ট জীবনে কখনো দূর হোত ভেবেছ ?

বিপিন বিদায় লইয়া গরুর গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, মানী পিছন হইতে ডাকিল—শোনো বিপিনদা ?

—কি রে ?

—মানী কথা বলে না। বিপিন দেখিল, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

—মানী ! ছিঃ, লক্ষ্মীটি—আসি।

মানী তখনও কথা বলিল না। বিপিনও আধ-মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল মানীর সামনে। তারপরে মানী চোখ মুছিয়া বলিল—আচ্ছা, এসো বিপিনদা।

গরুর গাড়ী ছাড়িল। অনেকখানি রাস্তা—মেঠো নির্জ্জন পথ,

কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদের মেটে জ্যোৎস্নায় পথের ধারের গ্রাম্য বাঁশবন, ক্বচিৎ কোনো আমবাগান কিংবা বেগুন-পটলের ক্ষেত, আখের ক্ষেত, অস্পষ্ট ও অদ্ভুত দেখাইতেছে। বিপিনের মনে অন্য কোনো জগতের অস্তিত্ব নাই—কোথায় সে চলিয়াছে—এই আনন্দ ও বিষাদের আলোছায়া-ঘেরা পথে কত দূর দূরান্তরের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা যেন সীমাহীন লক্ষ্যহীন—সে চলার বিজন পথে না আছে শান্তি, না আছে মনোরমা। কেহ নাই, সেখানে সে একেবারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ একা। কিংবা যদি কেহ থাকে, মনের গহন গভীর গোপন তলায় যদি কেহ থাকে, ঘুমাইয়া থাকুক সে, গভীর সুষুপ্তির মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখুক সে।

৬

রাণাঘাটে যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন বেশ রোদ উঠিয়াছে।

শান্তি তাহাকে দেখিয়া বলিল—একি চেহারা হয়েচে আপনার ডাক্তারবাবু? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি? আর হবেই বা কি করে গরুর গাড়ীতে। নেয়ে ফেলুন, আমি ঠাণ্ডা জল তুলে দিই।

দুপুরবেলা বিপিন চুপ করিয়া শুইয়া আছে, শান্তি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ওবেলা চলুন আর একবার টকি ছবি দেখে আসি—আর তো চলে যাচ্ছি দু তিন দিনের মধ্যে। হয়তো আর দেখা হবে না।

—গোপাল ছবি দেখেছিল ?

—উঃ তুদিন ! আপনি যেদিন যান, আর যেদিন আসেন।

—চল যাই।

শান্তি খুসি হইয়া সকালে সকালে সাজিয়া-গুজিয়া তৈয়ারী হইল। বিপিন বেলা তিনটার সময় তাহাকে লইয়া বাহির হইল, কারণ বিপিনের ইচ্ছা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে শান্তিকে বাসায় ফিরাইয়া আনিবে, নতুবা শান্তির শ্বশুরের খাওয়া-দাওয়ার বড় অসুবিধা হয়।

ছবি দেখিতে বসিয়া শান্তি অত্যন্ত খুসি। আজকার ছবিতে ভাল গান ছিল, সে ওধরণের গান কখনো শোনে নাই—মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

ইণ্টারভ্যালের সময়ে বলিল—চলুন বাইরে, চা খাবেন না ?

তাহার ধারণা ছবিতে যাহারা আসে, তাহাদের চা খাইতেই হয় এবং চা খাওয়ার জন্য ছুটি দেওয়া হইয়াছে। শান্তি আবদারের সুরে বলিল—আমি কিন্তু পয়সা দেবো আজও।

বিপিন হাসিয়া বলিল—পয়সা ছড়াবার ইচ্ছে হয়েচে ? বেশ, ছড়াও—

শান্তি লজ্জিত হইল দেখিয়া বিপিন বলিল—না না, কিছু মনে কোরো না শান্তি। এমনি বল্লুম। আমি তোমাকে কিন্তু কোন একটা জিনিষ খাওয়াবো—কি খাবে বল ?

শান্তি বালিকার মত আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই

যে কাঁচের বোয়েমে রয়েচে—ওকে কি বলে—কেক্? · · শ
ওই কেক্ নিন তবে—আপনার জন্যেও নিন্—

সিনেমার পরে শান্তি বলিল—চলুন, একটু ইষ্টিশানে
যাই—আর তো দেখতে পাবো না ওসব—চলে যাচ্ছি প

ডাউন প্ল্যাটফর্মে একখানা বেঞ্চির উপরে নিজে
বলিল—বসুন এখানে।

বিপিন বসিল।

—একটা সিগারেটের বাক্স কিনে আনুন, আমি
দিচ্চি।

—না, তুমি কেন দেবে?

—আপনার পায়ে পড়ি—কটা আর পয়সা, দিই না।

সে এমন মিনতির সুরে বলিল যে, বিপিন তাহার অ
ঠেলিতে পারিল না। সিগারেট টানিতে টানিতে বিপিন শা
নানা প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিল—এ লাইন কোথায় গি
ও লাইন কোথায় গিয়াছে, সিগ্ন্যালে লাল আলো সবুজ আ
কেন, কি করিয়া আলো বদলায় ইত্যাদি। আধঘণ্টা বসি
পরে বিপিন বলিল—চল আমরা যাই—দেরি হয়ে গেল।

—বসুন না আর একটু—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথ
জিগ্যেস্ করি—

—কি?

—আমার জন্যে আপনার মন কেমন করে একটুও?

বিপিন বড় মুস্কিলে পড়িল। এ কথার জবাব কি

দওয়া যায়! শান্তি আরও কয়েকবার এভাবের প্রশ্ন করিয়াছে তিপূর্ব্বে।

সে ইতস্তত করিয়া বলিল—তা করে বই কি—বিদেশে থাকি, তোমার মত যত্ন—

—ওসব বাজে কথা। ঠিক কথার জবাব দিন তো দিন—নইলে থাক্।

—এ কথা কেন শান্তি?

—আছে দরকার।

—করে বই কি।

—ঠিক বলছেন?

—ঠিক।

শান্তি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—চলুন, যাই। রাত হয়ে যাচ্ছে।

বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পরে অনেক রাত্রে বিপিন শুইল।

মাঝরাতে একবার কিসের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিল—বাহিরের রোয়াকে কিসের শব্দ হইতেছে। বিপিন জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, শান্তি রোয়াকের পৈঠায় বাঁশের আলনার খুঁটি হেলান দিয়া একা বসিয়া আছে; এবং শুধু বসিয়া আছে নয়, বিপিনের মনে হইল, সে হাপুস্নয়নে কাঁদিতেছে—কারণ রোয়াকের পৈঠা বিপিনের ঘরের জানালার ঠিক কোণাকুণি।

বিপিন নিঃশব্দে জানালা হইতে সরিয়া গেল। শান্তি

কেন কাঁদে এত রাত্রে? তাহাকে কি দোর খু...
শান্ত করিবে? তাহাতে শান্তি লজ্জা পাইবে ...
লুকাইয়া কাঁদিতে চায়, তাহাকে প্রকাশের লজ্জা দে...

বিপিনের আর ঘুম হইল না।

হয়তো ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসি...
গোপালের ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিল। শান্তি
আসিল, সে সদ্য স্নান করিয়াছে, পিঠের উপর ...
এলানো, মুখে চোখে রাত্রিজাগরণের কোনো
হাসিমুখে বলিল—উঃ, এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম? ক...
থেকে শেষে ওকে বললুম ডেকে দিতে।

অদ্ভুত মেয়ে বটে শান্তি। বিপিনের মন দুঃখ, ...
ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে অ...
শান্তিকে আর সে দেখা দিবে না। এইবারই শে...
মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে ঠিকই বলিয়াছিল।

ডাক্তারী চলুক না চলুক, সোনাতনপুরের নি...
তাহাকে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। হয় ...
নয় যে কোন স্থানে—কিন্তু সোনাতনপুরে বা পি...লপা...
আর নয়। মানীর কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক...বে।

পরদিন দুপুরের পর সকলে দুইখানি গরুর গাড়ি...তে ...
রাণাঘাট হইতে রওনা হইয়া গ্রামের দিকে ফিরিল। ...স-
পুকুরের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে তাহাদের নিজেদের ...মের পথ
বাহির হইয়া গিয়াছে—রাণাঘাট হইতে ক্রোশ ... পাঁচ

দূরে। এই পর্য্যন্ত আসিয়া বিপিন বলিল—আপনারা যান তবে, আমি অনেকদিন বাড়ী যাই নি, একবার বাড়ী হয়ে যাবো। সামান্য পথ, হেঁটে যাবো।

শান্তি বলিল—কেন ডাক্তারবাবু? আমাদের ওখানে আসুন আজ। তারপর না হয় কাল বাড়ী আসবেন?

বিপিন রাজি হইল না। বাড়ীর সংবাদ না পাইয়া মন খারাপ আছে, বাড়ী যাইতে হইবেই। বিপিন বুঝিল, শান্তি দুঃখিত হইল।

কিন্তু উপায় নাই, শান্তিকে বড় দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য এ দুঃখ তাহাকে দিতে হইবেই যে!

শান্তি গাড়ী হইতে নামিয়া বিপিনকে প্রণাম করিল, গোপালও করিল—উহাদের বংশের নিয়ম, ব্রাহ্মণের উপর যথেষ্ট ভক্তি চিরদিন।

একটা বড় পুষ্পিত শিমুলগাছতলায় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, শান্তি গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, গোপাল বৃদ্ধ বাপের হাত ধরিয়া নামাইয়া বিপিনের পরিত্যক্ত গাড়ীখানায় উঠাইতেছে—ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষত শান্তির সম্বন্ধে এই ছবিই বিপিনের স্মৃতিপটের বড় উজ্জ্বল, বড় স্পষ্ট, বড় করুণ ছবি। সেইজন্য ছবিটা অনেকদিন তাহার মনে ছিল।

সমাপ্ত